# স্মৃতি

## সত্যব্রত-র নানা লেখা

না না মু খ
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০

সংগ্রহ ও সম্পাদনা : বন্ধুরা

প্রচ্ছদ : অসীম দত্ত ও অন্যরা

কৃতজ্ঞতা : বিপ্লব, অসীম ও গোকুল

প্রকাশক : নানামুখ, ১/১ কেদারনাথ ভট্টাচার্য লেন, কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রণ : ইউরেকা, ৯১/এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

কার্টুন : সরিৎ গুপ্ত

# সূচিপত্র

# ছয়

# মন-অবদমন-দাসত্ব

১৯৮৩ সালে সত্য প্রথম আসে বি ও বি অফিসে। ও এসেছিল যাদবপুরের পিপলস্ সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। সে সময় এখানে খুব বিতর্ক চলছিল—পরমাণু বোমা, পরমাণু প্রযুক্তি নিয়ে। প্রচলিত ধারণা ছিল পরমাণু প্রযুক্তি স্বকীয়ভাবে খারাপ নয় বরং বিজ্ঞানের অবদান। এর ব্যবহার কে করছে তার ওপর নির্ভর করছে ভালো বা মন্দ।

সত্য-র মতো কয়েকজনের মনে হচ্ছিল নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি মূলগতভাবেই অমানবিক ও ধ্বংসকামী—যার হাতেই থাকুক না কেন।

এ সময়ে আর একটা ব্যাপারেও সত্য ভাবনাচিন্তা করছিল—মনস্তত্ত্ব নিয়ে। 'সমীকরণ আপনিই হবে'—এ তত্ত্বে ও বিশ্বাসী ছিল না। মানুষের জটিল মনোজগতের সব ব্যথা বেদনার প্যানাশিয়া আছে কোনও এক ধরণের সমাজে উত্তরণে—এ কথায় ওর মন ভরেনি। তাই এই সব চিন্তা বিতর্কের পটভূমিতে সত্য লিখল 'মন-অবদমন-দাসত্ব'। এইটিই বি ও বি -তে প্রকাশিত তার প্রথম রচনা।

আমরা যারা নিজেদের সভ্য মানুষ বলি, তারা জানি যে গত পঞ্চাশ বছরে কয়েক কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এর জন্য কি শুধু যুদ্ধবাজ, প্রভুত্বকামী শক্তিরাই দায়ী? নাকি সরাসরি না হলেও এর নৈতিক দায়িত্ব আমাদের ওপরেও পরে?

"আমরা"—অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, যারাই নাকি এই বিশ্ব সভ্যতার স্রষ্টা, ধারক ও বাহক। অবশ্যই আজকের বিশ্বে মানুষের প্রাথমিক সমস্যার অধিকাংশই সমাধান করা যায়নি। তার উপর নিউক্লিয়ার সমস্যা, শক্তি সমস্যা, পরিবেশ সমস্যা, এমন বহু আধুনিক সমস্যা প্রশ্ন তুলেছে মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে। রোগমুক্তির চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-আন্দোলনের পথ বেয়ে মানুষ এগিয়েছে বহুদূর। আর তার পরিণতিতে একাধিক দেশে কায়েম হয়েছে সামজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা। আশা করা গিয়েছিল এবার মানবজাতি সামনের দিকে এক বিরাট লাফ দেবে। কিন্তু ছকে রাখা সেই স্বর্গরাজ্য নিয়েও সন্দেহ জাগছে।

নানান পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব, প্রয়োগ ও তার ফলাফলের গোলকধাঁধায় প্রশ্ন উঠছে অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল মানুষের মুক্তি সংক্রান্ত—তার চিন্তার, কর্মের ভাবপ্রকাশের মুক্তির প্রশ্ন। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তত্ত্ব সেই মুক্তিকে দেখায় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্রান্তির নিশ্চিত ফল হিসাবে। স্বপ্ন দেখানো হয় সেই সুদূরের, যেখানে ভাবীকালের মানুষ তার স্বমহিমায় ভাস্বর, সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনায় তার কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি আজকের

মাপকাঠিতে বিশাল, অতুলনীয়। বলা হয়, যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে সামাজিক কর্মকাণ্ডকে এবং ব্যক্তিমানসকে নিয়ন্ত্রিত তথা নিপীড়িত করার জন্য, তার প্রয়োজনও আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাবে। প্রশ্ন হল, এই যে সর্বাত্মক মুক্তি, তার দিকে মানুষ এগিয়েছে কতটুকু? কেনই বা দেশে দেশে নারী-নিপীড়ন, বর্ণ বা জাতিভিত্তিক নিপীড়ন, রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিব নিপীড়ন মানুষ সহ্য করছে? কেনই বা যুদ্ধ আর ধ্বংসের ছায়া পড়ছে গোটা দুনিয়ার ওপর। ১৯৬৮-এর মে মাসে ফরাসি দেশের ছাত্র-যুব-শ্রমিক বিদ্রোহে বলা হয়েছিল "বিশ্বের সকল নিপীড়িতরা যদি মুক্তি চায়, তাহলে মুক্ত হতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র লাগবে"। কিন্তু বাস্তবত মানুষ মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেয় আবার সরেও থাকে, দুটোই সত্য। মুক্তির সংগ্রামে যোগদানের ক্ষেত্রে মানুষের নিস্পৃহতা তথা বিরুদ্ধতাকে যদি তার অসুস্থতা বলা যায় তবে, প্রশ্ন হল যে এ অসুস্থতার উৎস কোথায়?

*অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেয় আমাদের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু তা নয়, বরং আমরা একটি অন্য কাঠামোয় "মুক্তি" সম্পর্কিত প্রশ্নটি আলোচনা করে দেখতে পারি।*

মুক্তির বিপরীত হল দাসত্ব। সুতরাং মুক্তি অর্জন করতে গেলে দাসত্বের রূপগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন আছে। মার্কস অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই কাজটিই করেছিলেন এবং এর একটি প্রধান দিক উন্মোচন করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে অর্থনৈতিক অবদমনের দ্বারা মানুষ দাসত্বের শিকার হয়, আমরা এক্ষেত্রে একটি অন্য মাত্রায় আলোচনাটি শুরু করতে পারি।

মানুষের যে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়ার অনীহা বা বিরুদ্ধতা করার প্রবণতা, এটা কি সে জন্মসূত্রে পেয়েছে?

বস্তুবাদ দেখিয়েছে ঘটনা তা নয়। আমরা বলতে পারি যে, যখন একটি শিশু জন্ম নেয়, তার থাকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপরিসীম ক্ষমতা, ভালোবাসার ক্ষমতা, প্রশ্ন করা ও বিজ্ঞানী হবার ক্ষমতা। এক্ষেত্রে মনের গুরুত্ব অপরিসীম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাদাম মন্তেসরী লন্ডনে ফুটপাথের শিশুদের নিয়ে সারাজীবন কিছু যুগান্তকারী পরীক্ষা চালান। তিনি পরিষ্কার দেখান যে শিশুদের চেতনা বিকাশের জন্য তার মা বাবার যে অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনের কথা সমস্ত ধর্মে বলে, সত্য ঠিক তা নয়। শিশুদের সব থেকে প্রিয়, মা-বাবারা বা শিক্ষকরা নয়, অন্য শিশুরা। তাদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে শিশুরা অবিশ্বাস্য গতিতে চেতনা বিকশিত করতে পারে। মন্তেসরীর এই মূল আবিষ্কারটি কিন্তু কখনোই গুরুত্ব পায়নি। কারণ তাহলে পরিবারের ভিত্তিতে টান পড়ে। কারণ তাহলে প্রশ্ন ওঠে মা-বাবার সাথে এক খাঁচার মধ্যে শিশুকে আটকে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনের মতামত প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, দুনিয়ার সব থেকে বেশিসংখ্যক ঠিকামজুর কারা? যাদের কর্মের কোন সম্মান বা স্বীকৃতি নেই, কোনো ছুটি বা অধিকার নেই—যাদের সবথেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তারা হল নারী-গৃহিণী। তাদের ছোটবেলা থেকে এমন মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যে তারা মুক্তি চায় না। তারা দাসত্বেই খুশি। তাদের বোঝানো হয়েছে যে সমাজে সৃষ্টি করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নিপীড়ন করা অথবা বিপ্লব করা—এসব পুরুষদের কাজ। নারীর কাজ

পুরুষরা যাই করুক — তাদের সেবা করা এবং আরো কিছু দাসী ও পুরুষ তৈরি করা। নারীমুক্তি আন্দোলনের এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি জিনিস লক্ষণীয়। যথা শৈশব-কৈশোরের গুরুত্ব ও মনের ভূমিকা।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, হিন্দু নারী, যাকে শৈশব-কৈশোরেই গভীরভাবে আত্মসম্মানহীন ও পঙ্গু করে দেওয়া হয়, সে তার দাসত্বকে সঠিক বলে মেনে নেয় কিন্তু একজন যুক্তিবাদী নারী কি করে? তার ক্ষেত্রেও নির্ভরশীলতা মনের সেই জায়গায় চলে যায় যেটা যুক্তি দিয়ে দেখা যায় না, বরং দাসত্ব নিজেকে যুক্তি বা অগ্রগামী চিন্তার কাপড়ে ঢেকে প্রকাশ করে। যেমন সে ভাবে "আমার স্বামী অনেক বেশি বোঝে। ও অনেক দক্ষ, তাই আমি ওর সেক্রেটারি ও চাকরের কাজ করলে ও মানবমুক্তির জন্য আরও বেশি কাজ করতে পারবে।"

পুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটনাটি কি একেবারেই পৃথক? আমরা আমাদের চারপাশে কি এটাই দেখতে পাই না যে কেউ কেউ দক্ষ ও ক্ষমতাশালী ও অধিকাংশই দুর্বল ও নির্ভরশীল? যারা দক্ষ ও ক্ষমতাশালী তারা অধিকাংশ মানুষকেই তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা দমিয়ে রাখে। সামাজিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়, তার ভিত্তিভূমিও হয় এই প্রক্রিয়াটিই। ফলে যেমন পরিবারের স্ত্রীরা, তেমনি সমাজে অধিকাংশ দুর্বলমনা সাধারণ মানুষ ভাবে স্বামী বা নেতার মর্যাদাই আমার মর্যাদা—যদিও তারা হীন ও পরনির্ভর থেকেই যাচ্ছে।

নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই মনের এই শর্তাধীন অবস্থা কেন তৈরি হয়? এককথায় কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, শৈশব-কৈশোর-যৌবনে ব্যক্তিকে পরিবারে, শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও কর্মস্থলে নানান প্রক্রিয়ায় অবদমিত করা হয় যাতে সে নিজ স্বাধীনতা খোয়াতে, উঁচু অবস্থায় যারা আছে তাদের কথা মানতে, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভয় করতে শর্তাধীন ('কন্‌ডিশন্‌ড') হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরনির্ভরশীলতার অভ্যন্তরীভবন (internalisation)। পৃথিবীর যে সমাজগুলিতে এটি ঘটেছে, যার ফলে নির্ভরশীলেরা তাদের মর্যাদাহীন অবস্থান খুশি মনে মেনে নেয়, তার একটি উদাহরণ আমাদের হিন্দু সমাজ। এই সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীদের অবস্থান এই উদাহরণটিকে স্পষ্ট করে। বহু জায়গাতেই উঁচুজাতের নারীদের এমন কি স্বামীর সঙ্গেও চোখ তুলে কথা বলা বারণ। স্বামী অত্যাচারী হলেও তাকে খুশি মনে সেবা করাই ধর্ম। আর নিচুজাতের নারী? এখনও তাকে ধর্ষণ করার অধিকার অনেক জায়গাতেই উঁচুজাতের পুরুষের আছে। কিন্তু নারীরা কতটুকু বিদ্রোহ করে; প্রায় করে না বললেই চলে। বরং এত গভীরভাবে তাদের মনকে দমন করা হয়েছে যে নারীরা তাদের বাচ্চা মেয়েদের হুবহু একই রকম দাসত্বকে মেনে নেবার ট্রেনিং দেয়, বাচ্চা ছেলেদের শেখায় প্রভুত্ব আর যথেচ্ছাচার করার। এইভাবে নারী শুধু মানুষ পুনরুৎপাদনই করে না—তার দাসত্ব ও কর্তৃত্ব এই মনের অসুখটিকে কয়েক হাজার বছর ধরে পুনরুৎপাদনের কাজে প্রাথমিক ভূমিকা নেয়। এই একই ধরণের দাসত্ব স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হরিজনদের মধ্যেও বর্তমান। ইউরোপীয় দাসেদের সাথে তুলনীয় এদের অবস্থা। অথচ দাসেরা প্রায়ই বিদ্রোহ করত ও পালিয়ে যেত, এবং দাসব্যবস্থার স্থায়িত্বও দীর্ঘায়ত হয়নি। কিন্তু আমাদের বর্ণভিত্তিক সমাজ কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এর কারণ

ব্রাহ্মণ্যবাদের অভ্যান্তরীভবন এদেশের মানুষের মনে অনেক গভীর। ব্রাহ্মণ্যবাদে মন্দির, গণ-ক্রিয়া (পূজা), পুরোহিত, আইন, আতঙ্ক, অন্ধতা সবই এত গভীরভাবে মনের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে বাইরের শক্তি খুব কমই লাগে এই অবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। একজন হিন্দু, তার উপর সমাজের চাপ খুব কম থাকলেও সে হিন্দুই থেকে যায়। এর প্রমাণ হিন্দু নারী থেকে হিন্দু বিজ্ঞানী।

এখানে আর একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধির ক্ষেত্রেও এই নজির টানতে পারি। যেমন সাম্প্রদায়িক মানুষের মনের বিকৃতির কথা ধরা যেতে পারে। যার ফলে মানুষ নিজ হাতে অন্য সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে ধর্মীয় আনন্দ (ecstacy) পায় বা অন্যরা, যারা নিজেরা হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করেও অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হত্যায় উল্লাস প্রকাশ করে (হালে জামশেদপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী মন্তব্য করেছিলেন 'এখানে এখন কেউ শ্রমিক নেই—প্রত্যেকেই হিন্দু বা মুসলমান'।)।

এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ের রূপটি কি শুধু আমাদের দেশেই দেখি? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে উপরিউক্ত বিষয়টি দেশ-কাল-ভেদে সর্বজনীন। এবং এটি যে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সময়ের মুক্তি সন্ধানী মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তাও নয়। বস্তুত মন-অবদমন-দাসত্বর প্রক্রিয়াগুলিকে ভাঙার জন্য, এই মানসিক অসুস্থতার দাওয়াই খোঁজার জন্য মানুষ অবিরাম চেষ্ট চালিয়েছে তার অন্যবিধ সংগ্রামের পাশাপাশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সমাজে, সামাজিক অবক্ষয় ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে অনেকেই অনুভব করেন এই মানসিক রোগমুক্তি তথা সংগ্রামের কথা, তাঁদের মধ্যে অনেকে এ-ব্যাপারে গভীর অনুসন্ধানও চালিয়েছিলেন। যেমন ভিলহেলম রাইশ ও আন্তনিও গ্রামশ্চি।

রাইশ ছিলেন একজন মনস্তত্ত্ববিদ। তিনি ফ্রয়েডের ছাত্র ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি মার্কসবাদ ও জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে যান। তিনি দেখান যে, পুঁজিবাদ শুধু উৎপাদনের উপকরণ দখল করে শ্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এটা করবার জন্য সে মানুষের মনকেও দমন করে ও মানুষের মনের মধ্যে গভীরভাবে দাসত্বের বীজ ঢোকায়। এবং পুঁজিবাদের একটা 'আবিষ্কার' নয় বহু হাজার বছর ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মানসিক পঙ্গু করানোর এই প্রক্রিয়া চলে আসছে। রাইশ দেখান যে, এই নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় শিশুর জন্মের পর থেকেই। মানবশিশুর ভালবাসার ও সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও গণমানস থেঁতলে, পঙ্গু করে তাকে নিয়ম ও কর্তৃত্বের ছাঁচে ফেলে বড় করে। শৈশবে মানুষের মন থাকে নরম মাটির মতন। তখন তাকে ছাঁচে ফেলা সহজ হয়, তাই একবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চললে, বয়স্ক হবার পর মানুষের গভীর বোধগুলি সামান্যই পরিবর্তন করা যায়।

নিপীড়নের অভ্যান্তরীকরণের বিষয়টিও তুলে ধরেন রাইশ। তিনি দেখান কিভাবে ক্রিশ্চিয়ান চার্চ পাপবোধ নামক পুলিশ মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। স্ত্রী-পুরুষের মানবিক যৌন সম্পর্ক মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। চার্চের মানুষ-দমনের প্রধান কৌশলই হল এই সব সুস্থ প্রবণতাগুলিকে পঙ্গু ও বিকৃত করে তাদেরকে অসুস্থ, আইনতান্ত্রিক অমানবিক খাতে চলতে বাধ্য করা। এই প্রক্রিয়া নারীকে গৃহিণী-স্ত্রী-দাসী বানায়, পুরুষকে কর্তা-স্বামী-পিতা

বানায় এবং নারী-পুরুষের মানবিক বন্ধুত্বকে স্বামী-পিতা ও গৃহিণী-দাসী সম্পর্কে পর্যবসিত করে। এ-সবের ফলে মানুষের সামগ্রিক মানসিকতার উপর কি প্রভাব পড়ে? জার্মানির মতন সমাজে ছোটবেলা থেকে মানুষ যখনই তার মানবিক চাহিদা অনুযায়ী চলতে চাইত তার পিতা, পুরোহিত ও সামাজিক রীতি তাকে অবদমিত করত, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অবদমন তাকে দুর্বল ও কতৃত্বনির্ভর করে তুলত। মানুষের অন্যদের সঙ্গে মর্যাদা, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্কই হল তার সবথেকে বড় সম্পদ। এবং এটা মানুষকে শক্তি দেয়, মানবিক করে, তার সৃষ্টি ও জ্ঞানের চাহিদাকে প্রসারিত ও প্রাণবন্ত করে। মানুষকে এই সম্পদ তথা চাহিদা থেকে যত বঞ্চিত করা যাবে তত সে দুর্বল-যান্ত্রিক-নিষ্ঠুর-অমানবিক-কর্তৃত্ববাদী ও কর্তৃত্বনির্ভর হয়ে উঠবে। এই উপলব্ধি থেকে চার্চ তার পুরোহিতদের যৌন সম্পর্ক আটকে দেয় এবং মানুষের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ককে চূর্ণ করে পরিবর্তিত করে যিশুর প্রতি ভক্তিতে। শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যে এই পঙ্গুকরণের প্রক্রিয়া যদি পুরোদমে কাজ করে তবে যে মানুষ এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে তার মনের গ্রহণ করার ক্ষমতা খুব অল্পই অবশিষ্ট থাকে, এবং সে সাম্যবাদী মুক্তি ও ধারণার কথা খুবই অল্পই অনুধাবন করতে পারে। তাই তার সংগ্রামের ভিতটাও দুর্বল হয়ে যায়। তাই রাইশ বলেছিলেন, বয়স্ক জার্মান শ্রমজীবীরা সমাজবাদ মানলেও খুব দুর্বলভাবে লড়তে পারবে।

রাইশ ১৯২৩ সালে জার্মান শ্রমিক অঞ্চলে একটি মানসিক রোগের জন্য সাহায্য কেন্দ্র খোলেন। সেখানকার অভিজ্ঞতায় তাঁর ধারণাগুলি গভীর হয়। তিনি দেখেন যে, শ্রমিক দম্পতি, তরুণদের বহু মানসিক অশান্তির কারণ তাদের সহজাত মানবিক চাহিদাগুলির সঙ্গে চার্চ ও নিপীড়নকারী সমাজব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া অনুশাসনগুলির বিরোধ। তিনি বলেন যে সমাজবাদী আন্দোলনকে গভীর করতে গেলে দরকার শিশু-তরুণ ও বড়দের মধ্যে মানসিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। যে আন্দোলন ওই জার্মান খ্রিস্টীয় পঙ্গুকরণের বিরুদ্ধে লড়বে। বহু মানুষ রাইশের প্রোগ্রামে সাড়া দেন। রাইশ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখান যে, জার্মান গণ মানসিকতায় এই পঙ্গুকরণ ও কর্তৃত্ববাদ কি গভীরভাবে ঢুকেছে। এটা অনেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। যেমন জার্মানরা ঠাট্টা করে বলতেন জার্মানিতে মানুষ কর্তৃত্বকে এত মানে যে, কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে সেটাকে পুলিশ থেকে কার্যকর করতে হয় না। যে দণ্ড পেয়েছে তাকে 'কিভাবে ফাঁসি দিতে হয়' এরকম একটা সরকারি বই দিলেই যথেষ্ট। সে নিজেই প্রয়োজনীয় দড়িদড়া যোগাড় করে নিজেকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু এরকম কেন হয় তার বিশ্লেষণ কেউ করেন নি। রাইশ তাঁর মাস *সাইকোলজি অফ ফ্যাসিজম*-এ জার্মান গণমানসিকতায় কর্তৃত্ববাদ ও ফ্যাসিবাদের সম্পর্ক দেখান এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এরপর রাইশকে জার্মান রাষ্ট্রের কোপে পড়তে হয়। রাইশের লেখা গেস্টাপোরা নিষিদ্ধ করে, এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়াতেও অপাংক্তেয় হয়ে যান। এই অবস্থায় এক তীব্র মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে তিনি ভেঙে পড়েন এবং ১৯৩০ সালের পর তিনি আর কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেন নি।

রাইশের প্রায় সমসাময়িক আন্তনিও গ্রামশ্চি ছিলেন ইতালীয় সাম্যবাদী দলের সেক্রেটারি। তখন ইতালিতে ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ফ্যাসিস্টরা গ্রামশ্চিকে বন্দী

করে এবং তার উপর নির্মম দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালায়। দীর্ঘ নয় বছরের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পর গ্রামশ্চি মারা যান।

কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন শ্রমিক বিদ্রোহের পরাজয়ের কারণ তথা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিকৃতি ও দুর্বলতা নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন এবং তাঁর চিন্তার ফসল লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বইগুলি বিদ্রোহ ও মানবমুক্তির এক উজ্জ্বল দলিল। গ্রামশ্চির উল্লেখযোগ্য অবদান হল যে, তিনি লেনিনের রাষ্ট্রের তত্ত্বের একটি পরিপূরক মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রামশ্চি বলেন যে রাষ্ট্রের দুটি দিক আছে। একটি দিক—যেটা লেনিন বলেছেন শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে, বলপ্রয়োগ ও আতঙ্ক সৃষ্টির যন্ত্র। আরেকটি দিক হল শ্রমজীবীদের উপর আদর্শগত সাংস্কৃতিক মানসিক আক্রমণের যন্ত্র। একে তিনি নাম দেন "সিভিল সোসাইটি"। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি জাল বিছানো প্রতিষ্ঠানগুলি এর অঙ্গ। এই "সিভিল সোসাইটি" শ্রমিকরা বিপ্লব বা বিদ্রোহ করার আগেই তাদের দমিয়ে রাখার হাতিয়ার। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা গভীরভাবে মর্যাদাহীন, পরনির্ভর, সরকার ও ধর্মনির্ভর ইত্যাদি হয়ে যায়, বিদ্রোহ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। তাই গ্রামশ্চি বলেন যে শ্রমিক শ্রেণীর ভিতরে, তাদের মানসিকতার ভিতর দাসত্বের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক, মানসিক সংগ্রামটিও বিপ্লবের একটি প্রধান দিক। অর্থাৎ জীবন-শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ বিকাশের সকল ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্বকে ভাঙতে হবে।

উপরের আলোচনাকে কেন্দ্র করে আমরা বলতে পারি, ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে মানবমুক্তির অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ধারার পাশাপাশি রয়েছে তার মানসিক-রাজনৈতিক ধারা।

প্রশ্ন হল ঐতিহাসিকভাবে মানবজীবন-প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনার ক্ষেত্রে এই ধারা কি ব্যাখ্যা রাখে? আমরা যদি রাইশের সমসাময়িক জার্মানির দিকে তাকাই তো দেখতে পাব যে সমাজতান্ত্রিক দলের এত শক্তি এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট জার্মান শ্রমিক আন্দোলনকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারল না। ক্ষুদ্র ফ্যাসিবাদী দল ব্যাপক জনগণের মন জয় করে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মাপকাঠিতে তো অন্য ফল হবার কথা ছিল! কিন্তু কোন অসুস্থতা ফ্যাসিবাদকে ডেকে আনল? ইতালি সম্বন্ধেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। আর তাই আজ প্রশ্ন থেকে যায় কেনই বা প্রথাগত মানবমুক্তির আন্দোলনে রাইশ-গ্রামশ্চি অপাংক্তেয়। আজকে পৃথিবীকে বহু আন্দোলন চলছে যার ব্যাখ্যা প্রথাগত তত্ত্বে দেখান যায় না। যেমন ব্ল্যাক পাওয়ার বিদ্রোহ, যুব বিদ্রোহ, আধুনিক নারী বিদ্রোহ—এবং বলতে গেলে আজকের দিনের ইউরোপ লাতিন আমেরিকার অসংখ্য আন্দোলনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ভাবে সামাজিক অগ্রগতি—এর উত্তরই বা আমরা কোথায় পাই? যেমন ধরুন জাপান বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যাকে 'পিতা-পুত্র' সম্পর্ক মনে করে এবং এটাই আমাদের মনে করিয়ে দেয় সমস্যা, পারিবারিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, প্রভৃতি সমাজকে নাড়া দিচ্ছে গভীরভাবে। এক্ষেত্রে মানসিক, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ধারাটিকে অবহেলাই বা করা হয় কেন? মানবমুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো মানবিক মানুষের কাছেই এ এক বিরাট প্রশ্ন।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, সেপ্টেম্বর ডিসেম্বর ১৯৮৩

# 'লুকাস এয়ারোস্পেস'
# নতুন অভিজ্ঞতা নতুন সম্ভাবনা

জানা গেল লুকাস এয়ারোস্পেস কারখানার কর্মীরা তাঁদের আন্দোলনের জন্য বিকল্প নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। ওই কারখানায় তৈরি হতো মূলত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম। কিন্তু কারখানার সমস্ত ধরণের কর্মীরা বদলে দিলেন উৎপাদনের ধরণ—অস্ত্রের পরিবর্তে তৈরি হতে লাগল মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিস। সত্য এই কারখানার কর্মীদের প্রায় নজীর বিহীন আন্দোলনের পরিচয় জানাল এই লেখাটিতে।

ষাটের দশকের শেষ থেকেই ব্রিটেনে নতুন করে এক শিল্প অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। দুনিয়াজোড়া তেল সংকট, অটোমেশন, এবং কিছু বহুজাতিক সংস্থার ব্রিটেন থেকে ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি এক গভীর সংকটের জন্ম দেয়। উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে দক্ষ শ্রমিকরা হারাচ্ছিল তাদের স্কিল্‌ড স্ট্যাটাস, অদক্ষ শ্রমিকরা হারাচ্ছিল কাজ। শিল্প কাঠামোর চেহারাটাই বদলে যেতে শুরু করে দ্রুত গতিতে। এই পরিস্থিতিতে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন ক্রমাগতই নতুন সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এই রকম সময় প্রথম প্রতিবাদ আসে লুকাস এয়ারোস্পেস শ্রমিকদের কাছ থেকে। লুকাস এয়ারোস্পেস লিমিটেড হল ব্রিটেনে অবস্থিত এক বহুজাতিক সংস্থা লুকাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের এক শাখার নাম। এটি অটোমোবাইল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, বায়ুযান শিল্পের জন্য নানা ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ তৈরি করায় পারদর্শী এক সংস্থা হিসাবে পরিচিত। ঢালাও উৎপাদনের বদলে এঁরা ঝোঁক দেন অল্প কিন্তু নিখুঁত উৎপাদনের দিকে। বিশেষত বায়ুযান শিল্পের ক্ষেত্রে এটা জরুরীও বটে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লুকাস এয়ারোস্পেসের উৎপাদনের প্রায় ৫০ ভাগই হত সামরিক বিভাগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এই পটভূমিকায় লুকাস শ্রমিকরা সামাজিক ভাবে উপযোগী জিনিসপত্র উৎপাদনের জন্য শুরু করেন এক সংগ্রাম। উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েমের লক্ষ্যে চালিত আন্দোলনে সামিল হয়ে তাঁরা ঠিক করেন উৎপাদনের কয়েকটি সামাজিক মাপকাঠি। যেমন—যে কোনো উৎপাদন শুধু কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য নয় বরং কম্যুনিটির সমস্ত মানুষের কাছে উপযোগী ও লভ্য হতে হবে। বর্তমান দক্ষতার সম্পূর্ণ ব্যবহার ও কম্যুনিটির স্বার্থে তাকে আরো অগ্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। উৎপাদনের প্রকৃতি শ্রমিকদের ও কম্যুনিটির স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কোনো ক্ষতি যেন না করে। উৎপাদনের প্রকৃতি এমন হতে হবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাব্য ন্যূনতম ব্যবহার হয় ও পরিবেশের উন্নতি সাধিত হয়।

এই দাবিগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে '৬৮ সালে লুকাস এয়ারোস্পেসের শপ-স্টুয়ার্ডরা তৈরি করেন লুকাস এয়ারোস্পেস কম্বাইন্ড শপ স্টুয়ার্ডস্ কমিটি (এল.এ.এস.এস.সি.) এবং এর মাধ্যমে তাঁরা লুকাসের সতেরোটা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে এটা ছিল এক নতুন পদক্ষেপ। এই প্রথম উচ্চস্তরের প্রযুক্তিবিদ থেকে শপ ফ্লোরের অদক্ষ শ্রমিক পর্যন্ত মজুরি আর পরিবেশকে একই দাবির অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই ঘটনা এটাও প্রমাণ করেছিল যে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ব্যর্থতা সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে "কম্বাইন" নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির মোকাবিলায় একটি "সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাডভাইসারি সার্ভিস" চালু করে এবং দক্ষতার ক্ষতি, কাজের চাপ বৃদ্ধি ও নতুন নতুন বিপদ সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যেতে থাকে। ১৯৭৩-৭৪ সালে তেলের দাম বাড়া এবং একই সাথে লুকাস কর্তৃপক্ষের ৪০০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের নতুন পরিকল্পনা শ্রমিকদেরকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোয় তথা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিশাল পরিবর্তন হচ্ছিল তার অনেকটাই প্রথাসিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের চিন্তা ভাবনার বাইরে ছিল। "কম্বাইন" চেষ্টা শুরু করে এই দিকগুলিতে অনুসন্ধান চালাবার এবং সমাজে প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে চারটি বড় মাপের অসঙ্গতির দিক খুঁজে বের করার। প্রথম অসঙ্গতি, প্রযুক্তি সামাজিক স্বার্থে যা করতে পারে আর বাস্তবে যা করছে তার মধ্যে। যথা 'কনকর্ড' বিমান তৈরির প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়ে গেছে অথচ ডায়ালিসিস মেসিন তৈরির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে, যা নাকি শুধু ব্রিটেনেই প্রত্যেক বছর ৩০০০ রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত। দ্বিতীয়ত এক দিকে বলা হচ্ছে, যথেষ্ট উৎপাদন হচ্ছে না, অত্যাবশ্যকীয় সংস্থায় সেবার মান পড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পনেরো লক্ষ লোককে তাদের দক্ষতা, উৎসাহ ও নিজস্বতার সৃষ্টিশীল প্রকাশ থেকে ব্যাহত করা হচ্ছে। তৃতীয় অসঙ্গতি, যা মাইক কুলীর কথা থেকে বেরিয়ে আসে, তা হল, "কম্পুটারাইজেশন, অটোমেশন এবং রোবটের ব্যবহার মানুষকে আপনা থেকে পিঠ-নুইয়ে-দেওয়া, আত্মা-পঙ্গু-করে-দেওয়া কাজ থেকে রেহাই দেবে এবং তাকে আরো সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত করবে এ এক অতিকথন (myth) ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার সদস্যদের এবং শিল্পায়িত দেশগুলির লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের ধারণা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসলে এর উল্টোটাই ঘটে।" চতুর্থ অসঙ্গতি "কম্বাইন" লক্ষ্য করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিরোধিতার মধ্যে। এক্ষেত্রে দোষ দেওয়া হয় ব্যক্তি হিসেবে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার থেকে শ্রমের অমানবিক ব্যবহার পর্যন্ত যাঁরা আসলে দায়ী অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিয়োগ কর্তা, সেই নীতিনির্ধারণকারীরা পর্দার আড়ালে থেকে যান। দোষ তাঁদের উপর পড়ে না।

এই সমস্ত অসঙ্গতি পর্যালোচনার মাধ্যমে ও আগামী দিনের শ্রমিক বাড়তি হবার সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে "কম্বাইন" বুঝতে পারে যে শিল্পের এই ভয়াবহ সমস্যার সাথে যুঝতে গেলে প্রথাসিদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নের বাঁধা ধরা পথের বাইরে বেরোতে হবে। '৭৪ সালের নভেম্বর মাসে শ্রমিক দলের সরকারের শিল্পমন্ত্রী টনি বেন, কম্বাইন কমিটির সাথে মিলিত হন এবং কারখানা শিল্পের মন্দার ক্ষেত্রে বিকল্প উৎপাদনের কথা ভাবতে রাজি হন। "কম্বাইন"

এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয় যে লুকাস এয়ারোস্পেসের বিকল্প প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য এক যৌথ পরিকল্পনা (Corporate Plan) প্রস্তুত করার। পনেরো মাস ধরে শপ স্টুয়ার্ড, টেকনিশিয়ান, বিজ্ঞানী এবং প্রোডাকশন শ্রমিকরা তাদের গোটা অবসর সময়টাই এই কাজে লাগান। প্রাথমিক ভাবে "কম্বাইন" ১৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনিস্টিটিউট ও অন্যান্য সংস্থার কাছে ধারণার জন্য সাহায্য চায়। কিন্তু এব্যাপারে খুব সামান্যই সাহায্য পাওয়া যায়। যাই হোক, "কম্বাইন" কর্মীরা তাঁদের প্রয়াস নিরলসভাবে চালিয়ে যান। লুকাসের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই এ-ব্যাপারে অদক্ষ শ্রমিক থেকে বিজ্ঞানী সবার মধ্যেই ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই সময়ই তাঁরা নিজেদের পত্রিকা "কম্বাইন নিউজ" বের করা শুরু করেন। '৭৫ সালের শেষ দিক থেকে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি জমা পড়তে থাকে। জানুয়ারি'৭৬এ এগুলি চূড়ান্ত রূপ পায়। ৬টি দলিল, প্রত্যেকটি ২০০ পাতার, মোট ১৫০ ধরণের উৎপাদনের প্রযুক্তিগত তথা অর্থনৈতিক তথ্যগুলি তুলে ধরে। সামাজিক ভাবে উপযোগী উৎপাদনের জন্য "কম্বাইন" প্রচার অভিযানের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা হয়ে ওঠে প্রাধান হাতিয়ার।

উৎপাদনগুলির মধ্যে ছিল হাইড্রোজেন জ্বালানির ব্যাটারি, হীট পাম্প, সৌরশক্তি সংগ্রাহক, এবং ছোটো বায়ু-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যা কম্যুনিটির চাহিদা মেটানোর পক্ষে উপযোগী। লুকাস ইতিমধ্যেই ডায়ালিসিস মেশিন ও পেস্‌মেকার উৎপাদন শুরু করেছিল। প্রস্তাব দেওয়া হয় এই উৎপাদন বাড়ানোর এবং একই সাথে করোনারি রোগীদের জন্য জীবনদায়ী এবং অন্ধদের যান্ত্রিক দৃষ্টিদায়ক ব্যবস্থার উৎপাদন শুরু হয়। মেরুদণ্ডের রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য এক গাড়ির (ববকার্ট) ডিজাইন করে উলভার হ্যাম্পটনের শ্রমিকরা সবার প্রশংসা কুড়োন। এছাড়া আগুন নিরোধক তথা গভীর সমুদ্রের ডুবুরিদের পোষাকের পরিকল্পনাও "কম্বাইন" দেয়। পরিবহন নিয়ে যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা জ্বালানির সাশ্রয় করে, বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গমন কমান এবং শব্দদূষণ রোধ করে এরকম গাড়ির পরিকল্পনা তৈরি করেন। প্রথাগত ট্রেনের পরিবর্তে এমন এক 'রেল-রোড' গাড়ির পরিকল্পনা দেওয়া হয় যার ক্ষেত্রে ব্যাপক খরচার রেল লাইন পাতার দরকার হবে না।

১৯৭৬ সালে যখন পরিকল্পনাগুলি প্রকাশ হয় তখন শুধু ব্রিটেনেই নয় ফ্রান্স, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানিতে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সাড়া পড়ে। গার্ডিয়ান, নিউ *সায়েনটিস্ট*-এর মতো পত্র-পত্রিকায় একে ব্রিটিশ প্রযুক্তির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে দেখানো হয়।

এখানে বলা দরকার যে শ্রমিকরা যৌথভাবে তাঁদের কাজের দায়িত্ব নিতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু কোম্পানিকে নিজেদের হাতে নিয়ে নিতে বা তাকে শ্রমিকদের সমবায়ে পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা দেখাতে চাইছিলেন যে, যা মানবিক সমস্যা দূর করে এমন উৎপাদন করতে তাঁরা তৈরি, যা সমস্যা বাড়ায় তা নয়। "কম্বাইন" জানত যে লুকাস কর্তৃপক্ষ রাতারাতি নিজেদের ক্ষেত্র থেকে সরে এসে বিকল্প উৎপাদনের দিকে ঝুঁকবে না। তাই তাঁরা আস্তে আস্তে উৎপাদনের প্রকৃতি পরিবর্তনের দিকে জোর দেন।

১৯৭৬ সালের এপ্রিলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কোনো সময়েই কর্তৃপক্ষ "কম্বাইন"-কে শ্রমিকদের বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি)। কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাগুলিকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয় এবং "কম্বাইনের" সাথে কথা বলতে

অস্বীকার করে। এটা ছিল "কম্বাইনের" কাছে একটা রূঢ় আঘাত। এমনকি *দ্য ইকোনমিস্ট* বা *নিউ সায়েনটিস্ট-এর* মতো পত্রিকাও তাদের বিস্ময় প্রকাশ করে। তবুও এই পর্যায়ে "কম্বাইন" তাদের পরিকল্পনাগুলিকে গ্রহণ করানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু সরকারি শিল্পদপ্তর এবং ট্রেড ইউনিয়ন উভয়েই এব্যাপারে "কম্বাইন" কে প্রায় কোনো সাহায্যই করে না। এরই মধ্যে '৭৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নর্থ ইস্ট লন্ডন পলিটেকনিকের সাথে যৌথভাবে "কম্বাইন" তৈরি করে একটি প্রতিষ্ঠান—সেন্টার ফর অল্টারনেটিভইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল সিস্টেমস্,' (ক্যাইটস)। এখানে শ্রমিকদের তৈরি যৌথ পরিকল্পনার তত্ত্বগত অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কাজ চালানো হতে থাকে। এবং ক্রমে "ক্যাইটস" স্থায়ী সমবায় তথা শ্রমিকদের তৈরি পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রধান তথ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য অনুরোধ আসতে থাকে অস্ট্রেলিয়া বা চীনের মতো দূর দেশ থেকে। জাতীয় পর্যায়ে "ক্যাইটস" যোগাযোগ রেখে চলছিল শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—সবার সাথে।

১৯৭৮ মার্চ ছিল "কম্বাইন"-এর সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময়। লিভারপুল, ব্র্যাডফোর্ডও কভেন্ট্রির কারখানাগুলিতে লুকাস ক্লোজার ঘোষণা করে। প্রায় ২০০০ শ্রমিকের কাজ যায়। এ-ব্যাপারে "কম্বাইন" কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে আন্দোলন শুরু করে। '৭৯ জানুয়ারিতে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। এতে ব্রিটেন থেকে ইটালি, জার্মানি ও ফ্রান্সে কারখানা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সরকারি শ্রমদপ্তর ও লুকাস কর্তৃপক্ষের অশুভ আঁতাতের কথাও ঘোষিত হয়। দেখানো হয় যে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড লাভ সত্ত্বেও কিভাবে লুকাস কর্তৃপক্ষ কর্মসংস্থান নষ্ট করছে। রিপোর্টের বাকি অংশে ওই ২০০০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হতে পারে বিকল্প উৎপাদনের সাহায্যে কিভাবে তার বিস্তৃত পরিকল্পনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল ডায়ালিসিস মেশিন তৈরি করার তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা এবং ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে গ্যাস টারবাইন, পাম্প ইত্যাদি তৈরির কথা।

তীব্র আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে এই পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় ইউনিয়নের সাথে সমঝোতা করতে। দুবছরের জন্য লিভারপুল ও ব্র্যাডফোর্ডের ছাঁটাই বন্ধ করা সম্ভব হয়, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের "কম্বাইন" বিরোধিতা বন্ধ করেনি। বস্তুত "কম্বাইন"-এর সামনে রয়েছে প্রযুক্তির কাঠামোকে মানবিক করে তোলার কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই অভিনব প্রচেষ্টা জনমানসে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। "কম্বাইন" দেখিয়েছে যে প্রতিভা কিছু বাছাই করা মানুষের একচেটিয়া নয়, এটা আসলে শ্রমজীবী মানুষের যৌথ প্রয়াসের বহিঃ প্রকাশ। এই দৃষ্টান্ত তাই উৎসাহিত করে তুলেছে অন্য শিল্পের শ্রমিকদের। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে '৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে যখন ম্যাঞ্চেস্টারে অবস্থিত স্ক্র্যাগ কোম্পানি দুটি টেক্সটাইল কারখানায় ক্লোজার ঘোষণা করা হয়, তখন সেখানকার শ্রমিকরা লুকাস কম্বাইনের পথ অনুসরণ করে বিকল্প উৎপাদনের জন্য এক যৌথ পরিকল্পনা হাজির করেন। বস্তুত শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয় যেহেতু বহুজাতিক সংস্থার বিচরণ ভূমি গোটা পৃথিবী তাই লুকাস কম্বাইনের এই আন্দোলনের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রতিরোধের ইঙ্গিত রয়েছে। আগামী দিনে তা হয়ত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,* মে-জুন ও জুলাই-আগস্ট ১৯৮৫

# বিজ্ঞানের সীমা

ফ্রান্সিস বেকন থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের সব মতাদর্শগত প্রবক্তাদের চোখে বরাবরই বিজ্ঞান একটি সীমাহীন প্রয়াস - যার উদ্দেশ্য হল যা কিছু সম্ভব সবই ঘটিয়ে ফেলা। মানুষের কৌতুহল তো অনন্ত। প্রকৃতি সম্পর্কে যত প্রশ্ন ভাবা সম্ভব তার সংখ্যাও সীমাহীন। দীর্ঘ বিজ্ঞানী জীবনের শেষে নিউটনের নাকি মনে হয়েছিল যে তিনি শুধুমাত্র এক বিরাট সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে উপলখন্ড নিয়ে খেলা করেছেন। তাছাড়া বিজ্ঞান শুধু প্রকৃতি সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় জ্ঞান আহরনই নয়—এর উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে বদলানোর পন্থা উদ্ভাবন করা, প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজগতকে পরিবর্তিত করা। ফলে এইসব প্রবক্তারা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেন এক রোমাঞ্চকর দুনিয়ার ছবি, যেখানে মানুষের মনের মত করে প্রকৃতি—এমনকি মানবপ্রকৃতিও—ব্যবহৃত হবে, মানুষের প্রয়োজনে।

এই ধরণের ছবিগুলি খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝাই যায় না যে বিজ্ঞান যখন সর্বজনীনতার দাবি করছে, নিঃস্বার্থভাবে প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বদলানোর পথ খুঁজছে, আসলে কিন্তু তখন তা একটা সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হয়েই কথা বলেছে কোনো শ্রেণীহীন, জাতিভেদহীন, স্ত্রী-পুরুষভেদহীন মানবতার কথা নয়, বিজ্ঞান হল নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট জাতি, নির্দিষ্ট অংশের মানুষের কৌতুহল ও বিশ্বজিজ্ঞাসার প্রকাশ। বস্তুত এই মানুষরাই ফ্রান্সিস বেকনের সময় থেকে বিজ্ঞানকে গড়েছে, বিজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নগুলো কি হবে তা নির্ধারণ করেছে।

বিজ্ঞানের এই মতাদর্শ একটা শক্তিশালী হাতিয়ার, এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এটা রাজনীতিবিদদের তো বটেই, এমন কি বিজ্ঞানীদের কাছেও প্রচণ্ড আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভানেভার বুশ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা কিভাবে নিরন্তর বাড়িয়ে যাওয়া যায় তারই একটা ছবি হিসাবে রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান এই দুই প্রেসিডেন্টকে উপহার দিয়েছিলেন *সায়েন্স, দি এন্ডলেস ফ্রন্টিয়ার*। ব্রিটেনের জে. ডি. বার্নালের ভবিষ্যতদর্শী মার্কসীয় ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা পেয়েই ১৯৬৪ সালে হ্যারল্ড উইলসন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রখর উত্তাপে সমাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন, যা কিনা আজ সেভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতি আর শ্রেণী সংগ্রামের পথ হটিয়ে উন্নয়নের চালিকা শক্তি হয়ে বসেছে।

মানব চরিত্রের অনন্ত কৌতুহলের এই মতবাদের তথা রাজনীতিবিদদের প্রযুক্তিমুখী উদ্দীপনার বিরোধিতা করে গত কয়েক দশকের বিজ্ঞান বিরোধী আন্দোলন বার বার চিৎকার করে বলেছে বন্ধ কর-বন্ধ কর প্রকৃতির উপর নিউক্লিয়ার শিল্প ও সমরবাদের অবৈধ হস্তক্ষেপ,বন্ধ কর প্রাণীকে অণুতে, অণুকে মৌল কণায় ব্যবচ্ছেদ করে জ্ঞান সংগ্রহের এই

অন্তহীন প্রক্রিয়া,বন্ধ কর প্রকৃতিকে জানার উপায় হিসাবে এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা পদ্ধতির নির্দেশ অনুযায়ী প্রকৃতির পরীক্ষা নিরীক্ষা, যা কিনা উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনকারী অন্যান্য দর্শনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ।

এই অর্থে, বা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো অর্থেই, আমি কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী নই। তবু আমি বলতে চাই, বিমূর্ত ভাবে বিজ্ঞানকে বোঝা অথবা এর সীমা কিংবা অন্তহীনতা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান একথা বলা আসলে বিজ্ঞান কি, অথবা বিজ্ঞানিরা কি করেন, সেটাকে রহস্যাবৃত করার চেষ্টা—স্যামুয়েল বাটলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেমন বলেছিলেন সেভাবে বলতে গেলে, যেন বিজ্ঞানকে কোন একটা কিছুর জন্য হতেই হবে। এই রহস্যাবৃতকরণ, আজও যা বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের কথায় দেখা যাচ্ছে সেটা শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থ ও সুবিধাভোগিতাকেই মদত দেয় । এর পরিবর্তে আমাদের ভাবতে হবে এই সমাজে এই বিজ্ঞানের কথা। আমি দেখাব যে এই বিজ্ঞান সত্যি সত্যিই সীমাবদ্ধ, এবং এর সীমাবদ্ধতা দুটি প্রধান উপাদানের উপর নির্ভরশীল—একটি বস্তুগত অপরটি মতাদর্শগত। আমি এক এক করে আলোচনা করছি ।

**বস্তুগত সীমাবদ্ধতা**

বস্তুগত উপাদান বলতে অবশ্যই বুঝতে হবে সম্পদ। বিজ্ঞান চর্চায় টাকা পয়সার দরকার। আমেরিকা আর পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর শিল্পনির্ভর দেশগুলিতে জি. এন. পির দুই থেকে তিন শতাংশ বিজ্ঞানচর্চায় খরচ হয়। ১৯৪৫ থেকে ষাটের দশকের শেষ দিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটেছিল প্রচণ্ড হারে—১০-১৫ বছরের ভিতরই পরিমাণে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ডেরেক ডি-সোলা প্রাইস দেখিয়েছেন, দ্বিগুণ হওয়ার এই সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মোটামুটি একই আছে। একবিংশ শতাব্দীতেই পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, নারী, শিশু ও কুকুর পর্যন্ত এক একটি বিজ্ঞানী তৈরি হবে, আর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের ওজন এই পৃথিবীর ওজনের চেয়েও বেশি হয়ে যাবে, এই ধরণের হিসাব কষে দেখানো ষাটের দশকে বেশ চালু ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধিও অবাধ হয়ে উঠতে পারে না। থামতে হবেই, এবং হয়েছেও। ষাটের দশকের শেষদিক থেকে জি. এন. পির অনুপাতে বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ হয় মন্থর হয়েছে, না হয় থেমে গেছে। আর ব্রিটেনে তো জি. এন. পির অনুপাতে বিজ্ঞানের প্রসারের গতি পশ্চাদ্‌মুখি। যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিজ্ঞান গবেষণায় অর্থবিনিয়োগ শুধু যে সীমিত হয়েছে তাই নয়, সে অর্থ কিভাবে খরচা হবে তাও উপর থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । পঞ্চাশের দশক থেকে বৃটেনে প্রত্যেক বছর জি. এন. পির যে দুই তিন শতাংশ বিজ্ঞানের জন্য খরচা করেছে তার প্রায় ৫০ শতাংশই গেছে সামরিক গবেষণার পিছনে, এখন এটা ৫৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

গত বহু বছরের ভিতর এটাই সবচাইতে বেশি, আর প্রসঙ্গত, আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য বহু পশ্চিমী দেশের তুলনায়ও সামরিক গবেষণা খাতে ব্রিটেনের খরচের এই অনুপাতটি অনেক বেশি, তুলনায় ফ্রান্সের ৩৫ শতাংশ, জার্মানির ১২ শতাংশ আর জাপানের ৫ শতাংশেরও

কম। এখন যদি আপনি জানতে চান, সামরিক উদ্দেশ্যে এত বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে কেন, তবে বিভিন্ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত কি প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয় সেই সব রাজনৈতিক প্রশ্নে আপনাকে আসতেই হবে । তবে সামরিক প্রয়োজনে আর শিল্পে উৎপাদন ও মুনাফার অগ্রাধিকারের স্বার্থে গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত করাটা যে, হিলারি রোজ ও আমার বর্ণনা মতো, বিজ্ঞানের গতি ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।

বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতার প্রচারকরা (যদিও অবশ্য হাই এনার্জি ফিজিকস-এর মতো বিশুদ্ধতম বিজ্ঞানই আমাদেরকে বোমা উপহার দিতে পেরেছিল) তর্ক তুলতে পারেন যে এসব হল প্রযুক্তির ব্যাপার—যথার্থ বিজ্ঞান এ ধরণের নিয়ন্ত্রণে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভেতরে এভাবে পার্থক্য টানতে গিয়ে তারা অবশ্য নড়বড়ে জায়গায়ই গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। প্রথাগত অস্ত্রগুলির ভেতরে জঘন্যতম নাপাম বোমা আবিষ্কার করেন আমেরিকার বিশিষ্ট রশায়নবিদ লুই ফিসার। ইনি ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধ চলাকালীন হার্ভার্ডের খেলার মাঠে এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে *দি সায়েন্টেটিফিক* মেথড নামক এক আকর্ষণীয় বইতে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। খাঁটি বিজ্ঞান যে নিয়ন্ত্রণের অধীন নয় এ যুক্তি সত্যিই এক মুহূর্তও টেকানো যায় না।

গত দশকগুলিতে মলিক্যুলার বায়োলজির জয়গর্বিত অগ্রগতির কথাই ধরা যাক। জীববিজ্ঞানের জগতে দুটি পরস্পর-বিরোধী ঐতিহ্য ছিল। একটি হল রিডাক্সনিস্ট অর্থাৎ বিশ্লেষণ সর্বস্ব এবং পরমাণুসন্ধানী, আর অন্যটি হলিস্টিক, অপেক্ষাকৃত বেশি সংশ্লেষণমুখি। তিরিশের দশকে নীডহ্যাম, উজার, ওয়াডিংটন প্রমুখ জীবতত্ত্ববিদরা ছিলেন দ্বিতীয় ধারাটির শক্তিশালী প্রতিনিধি। প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, কেম্ব্রিজে তাত্ত্বিক জীববিদ্যার একটি বড় ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার, যেখানে এই ধারা সমস্ত উপাদানকে এক জায়গায় আনা যাবে। কিন্তু এর টাকা-পয়সা জোগানোর ভার ছিল রক ফেলারের উপরে। আর রক ফেলার, ওয়ারেন ওয়েভারের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ভবিষ্যৎ জমানা রসায়নের। ফলে, জীববিদ্যার বদলে বায়োকেমিস্ট্রিও মলিকুলার বায়োলজির পৃষ্ঠপোষকতা করলেন তাঁরা। ১৯৫৩ সালে (ডি.এন.এ অণুর) যুগ্ম-কুণ্ডলী সনাক্তকরণ আর তার পরবর্তী ফলশ্রুতিগুলি এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তটিরই প্রত্যক্ষ ফল। অনেকেই বলবেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল এবং আমার হয়তো তাদের সঙ্গে একমত হওয়াই উচিত। কিন্তু ঘটনা এই যে, নির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা মাফিক জীববিদ্যার গতিপথ পরিবর্তিত করে দেওয়া হল এই ভাবে। কোন ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত, কোথায় বা সাহায্য দেওয়া উচিত হবে না, এ ব্যাপারে সরকার তথা সেবামূলক সংস্থাগুলির নিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রকফেলারের এই সিদ্ধান্ত তুলনীয়। এই ঘটনা এবং ৭০এর দশকের রিচার্ড নিকসন ও জিম ওয়াটসনের এই দশকের শেষেই ক্যান্সার নিরাময়ের সম্মিলিত প্রয়াস থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে সবচেয়ে উন্নত মলিক্যুলার বায়োলজিও আমাদের ক্যান্সার নিরাময়ের দিকে নিয়ে যায়নি। আসলে এ রোগ বেড়ে ওঠার অনেক কারণই শিল্পভিত্তিক সমাজের রাসায়নিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নিক্সনের দেওয়া বিশাল অংকের টাকা অবশ্য আমাদের দিয়েছে আরও বেশি বেশি মলিক্যুলার বায়োলজি।

**মতাদর্শগত সীমাবদ্ধতা**

এবারে বস্তুগত থেকে মতাদর্শগত সীমায় আসা যাক। আমরা যে বিজ্ঞানের পিছনে টাকা ঢালছি শুধু সেই বিজ্ঞানই পেতে পারি, কেবল এ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আরও গভীরে গিয়ে বলতে চাই, আমরা যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি করে থাকি এবং আমাদের তত্ত্বগত প্রকল্পগুলি গঠন করি, সেটার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা কোন্ কোন্ প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ অথবা অনুসন্ধানের যোগ্য মনে করবেন — এমন কি যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা প্রশ্নগুলি তুলবেন, সেটাও। তিনটি স্তরে আমি এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি।

প্রথমত, আমরা শুধু সেই সব প্রশ্ন ভাবতে পারি যেগুলোকে ব্যক্ত করার মতো প্রাথমিক উপাদান আমাদের হাতে রয়েছে। যাচাই করে দেখার মতো একটি জীন-তত্ত্বের সঙ্গে ক্রোমোজম দেখার উপযোগী শক্তিশালী একটি অণুবীক্ষন যন্ত্রও যদি না থাকত তবে কোষ পুনরুৎপাদনে অথবা জীনের বৈশিষ্ট্য সঞ্চালন ক্রোমোজমের ভূমিকা কি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব হত না।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যই সমান মূল্যমান নয়। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনগুলো প্রাসঙ্গিক তা ইতিহাস নির্ভর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে স্যাঙ্গার ১৯৫৬ সালে প্রথম একটি প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সম্পূর্ণ পর্যায়ক্রম প্রকাশ করেন। এটা করতে তাঁর দশ বছর সময় লেগেছিল। এক লক্ষ মানব প্রোটিন কিংবা লক্ষ লক্ষ প্রাকৃতিক প্রোটিনের মধ্যে ঘটনাচক্রে সেটা ছিল ইনসুলিন। এটা ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট একটি অণু এবং এটিকে অবিমিশ্ররূপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। এর কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য অনেক প্রোটিনের পর্যায়ক্রম প্রকাশিত হতে থাকে - কিন্তু ক্রমশ এ নিয়ে হৈ চৈ কমে আসে। আজকের দিনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যে কেউ এ কাজ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলতে পারে। কিন্তু কেউ কি সমস্ত প্রাকৃতিক প্রোটিনের, না হয় তো শুধু মনুষ্যদেহের সমস্ত প্রোটিনেরই, গঠনপ্রণালী জানতে চাইবে? ডাকটিকিট সংগ্রাহক বা কোনো কোনো পিএইচ ডি ছাত্র ছাড়া অন্য সকলের কাছেই একটা ক্রমহ্রাসমান মূল্যপ্রাপ্তির নীতি কাজ করে। সুতরাং একটি নতুন তথ্য (নতুন আরেকটি প্রোটিনের ক্রম)—প্রথম প্রোটিনের তথ্যের মতো আর কৌতূহলোদ্দীপক থাকছে না। কত তথ্য আমরা জানব সে ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আছে এবং প্রোটিন ক্রমপর্যায় সংক্রান্ত প্রকল্প এখন আর মঞ্জুরীর টাকা পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, এবং আগের দুটির গভীরতর স্তরে রয়েছে রিডাক্‌শনিজম বা বিশ্লেষণযোগ্যতা ও তার বিকল্পের প্রসঙ্গটি। সপ্তদশ শতকের চিন্তাধারা থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভবের পর্যায়টি যে চিন্তাবৃত্তির ছাপ বহন করছে তা এই বিশ্লেষণ যোগ্যতার মতবাদ। রিডাক্‌শনিজম বলে, বিশ্বকে বুঝতে গেলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অধ্যয়ন কর। কোষের জন্য অণু, অণুর জন্য পরমাণু সবচাইতে মৌলিক বস্তুকণাতে পৌঁছে যাও। রিডাক্‌শনিজম এই দাবির প্রতি দায়বদ্ধ যে এটাই হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, শেষ অর্থে বস্তুকণার গতির সূত্রই আমাদের পুঁজিবাদের উদ্ভব কিম্বা ভালবাসার প্রকৃতি, আগামী ডার্বির খেলায় বিজয়ী কে হবে, এইসব বুঝতে সাহায্য করবে।

এই ধরণের রিডাক্‌শনিজমের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হওয়া উচিত। একটা টেপরেকর্ডার থেকে যে সঙ্গীত আমরা পাই শুধুমাত্র টেপের রাসায়নিক ও চৌম্বকীয় ধর্ম অথবা টেপহেডের প্রকৃতি থেকে তাকে আমরা বুঝতে পারি না, যদিও অবশ্য সেগুলিও দরকারী। তবু রিডাক্‌শনিজমের প্রভাব গভীর। যেমন, রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন মানব প্রেরণার উৎসের ব্যাখ্যা মানব ডি.এন.এ-কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব। যেমন, জিম ওয়াটসন বলেন পরমাণু ছাড়া আর আছেটা কি? এর উত্তর, পরমাণু ছাড়া আছে পরমাণুদের মধ্যেকার বন্ধন সংক্রান্ত সম্পর্ক, যা কিনা শুধুমাত্র পরমাণুর ধর্ম থেকেই বের করা সম্ভব নয়। যতই হোক, কোয়ান্টাম ফিজিক্স-এক সঙ্গে দুটির বেশী বস্তুকণার আন্তঃক্রিয়াই সামলে উঠতে পারে না, পারেনা জলের মতো সাধারণ অণুর ধর্মও তার উপাদানগুলির ধর্ম থেকে নির্ণয় করতে। অণুর গঠন থেকে গ্রহসমূহের গতিবিধি পর্যন্ত, গোটা বিশ্ব সম্পর্কে সত্যিকারের এবং নতুন ধরণের জ্ঞান আহরণের উপায় হিসাবে শুরু হয়ে এটা এখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবেশ ব্যবস্থার অন্তর্গত, পরস্পরের সঙ্গে গভীর আন্তঃসম্পর্ক বিশিষ্ট অথচ উন্মুক্ত প্রাকৃতিক তন্ত্রগুলিকে বোঝাই হোক, আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা প্রজাতির ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের পটভূমিতে প্রাপ্ত জ্ঞানের স্থিতিশীল চিত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনের উপলব্ধির গতিময়তাকে সংশ্লেষিত করাই হোক, কোনো ব্যাপারেই বিশ্লেষণযোগ্যতা (রিডাকশনিজম) সফল হতে পারে না।

যতক্ষণ বিজ্ঞান তার সব প্রশ্ন উত্তর বিশ্লেষণযোগ্যতা ও নির্দেশ্যতাবাদের কাঠামোয় প্রকাশ করে ততক্ষণই জটিল ঘটনাবলীর উপলব্ধি ব্যাহত হয়। আমি বিশ্বাস করি, একটা রিডাক্‌শনিস্ট বিজ্ঞান মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। পারে না বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে, যেমন কিনা "মন মস্তিষ্ক সমস্যা"—পশ্চিমী বিজ্ঞান কার্তীয় দ্বৈতবাদ বা যান্ত্রিক বস্তুবাদ ছাড়া যার ধারণাই করতে পারে না। ইকোলজির মত মুক্ত (open) গভীরভাবে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত সিস্টেমের ব্যাখ্যায় এটা অপারগ। ব্যক্তির বিকাশই হোক বা প্রজাতির বিবর্তন—রিডাক্‌শনিজম তার বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি নিয়ে বহমান সময়ের একটি স্থির মুহূর্তের ব্যাখ্যায় এই স্বীকৃত দিতে পারে না যে বর্তমান হল এক ঐতিহাসিক প্রবাহের অংশ।

এই ধরণের সিস্টেমের জটিলতার ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা রিডাক্‌শনিজমকে কমবেশি স্থূল সরলীকরণের দিকে ঠেলে দেয়, যা আবার আজকের সামাজিক পটভূমিকায় 'জৈব নির্দেশ্যতাবাদের' রূপে স্থিতাবস্থার স্বপক্ষে ওকালতি করে এবং এই দাবি করে যে শ্রেণীগুলির মধ্যে, নারী পুরুষের মধ্যে, ও জাতিগুলির মধ্যে, অবস্থান, সম্পদ ও ক্ষমতার যে সামগ্রিক অসাম্য আজকের সামাজিক অবস্থা বর্তমান, তার অমোঘ নির্দেশ রয়েছে আমাদের জীনে।

সব শেষে আমি বিজ্ঞানের সেই সীমারেখাটির উল্লেখ করতে চাই যার কথা এ পর্যন্ত উহ্য রেখেছি, অর্থাৎ কিনা নৈতিকতার প্রশ্নটি। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কীয় প্রশ্নগুলো বারবার আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে এ প্রশ্নগুলো এসে থাকে। এক দিকে এরকম দাবি করা হয়েছে যে কোনো কোনো ধরণের জ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক, তাই কিছু ধরণের গবেষণা চালানো উচিত নয়। যেমন নিউক্লিয়ার

শক্তি ও জীন ক্লোনিং এমন কিছু বিপদের সম্ভাবনা বহন করে যার দরুণ এগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অনুচিত। অথবা ধরা যাক বুদ্ধির জেনেটিক ভিত্তি সংক্রান্ত গবেষণা, যা হয়তো আমাদের পক্ষে অরুচিকর কিছু জীবতাত্ত্বিক 'তথ্য' উদঘাটন করতে পারে।

অন্যদিকে আবার এ বক্তব্যও রাখা হয় যে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নৈতিকতার পরম নীতিসমূহকে লঙ্ঘন করে এবং সেগুলি একদমই চালানো উচিত নয়, যেমন যে সব পরীক্ষা জীবজন্তু তথা মানুষের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। এই সব চিন্তাভাবনাই বিভিন্ন দিক থেকে বিজ্ঞানের সীমা নির্দেশ করছে, এ কথা বলা চলে।

এখনও অবধি আমি যা বলেছি, তা থেকে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে নৈতিকতাকে এরকম বিমূর্তভাবে দেখা সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। আমার কাছে সঙ্গতি ও মতাদর্শগত প্রশ্ন হল প্রধান এবং অধিকাংশ নীতিগত প্রশ্ন শেষ অবধি অগ্রাধিকার ও মতাদর্শগত প্রশ্নে নেমে আসে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কৃত্রিম নিষিক্তকরণ বা ''ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনে''র নৈতিকতার প্রশ্নটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের কি এটা ব্যবহার করা উচিত, না উচিত নয়। আমার মনে হয় প্রশ্নটি ভুল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এর বদলে হয়তো আরো গোড়াকার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, যার উত্তর পাওয়ার জন্যই হয়তো কৃত্রিম নিষিক্তকরণ পরীক্ষাগুলির পরিকল্পনা হয়েছিল। সেটা হল, কিভাবে আমরা বাঞ্ছিত স্বাস্থ্যবান শিশুর সংখ্যা বাড়াতে পারি। এই প্রশ্নের সাথে সাথে এও জিজ্ঞাসা করব—বাঞ্ছিত, স্বাস্থ্যবান শিশুদের বেঁচে থাকার পথে বাধা কি? আমি দেখছি কোনো শিশুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক গুণ বেশি থাকে যদি তার মা সম্পদশালী বা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর না হয়ে দরিদ্র হয়। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত, শিশুদের বাঁচাতে হলে সবচেয়ে ভাল উপায় হল আমাদের পরিচিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে বঞ্চিত অঞ্চল এবং বঞ্চিত শ্রেণীগুলির ভিতর ব্যস্তবায়িত করা। কৃত্রিম নিষিক্তকরণ এমন একটি পদ্ধতি যার তাৎপর্য রয়েছে কেবল অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা স্বল্পসংখ্যক কিছু মায়েদের কাছেই। পরিসংখ্যানগত বিচারে যখন আমরা জানছি যে একেবারে প্রাথমিক প্রতিষেধক এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে শিশুরা মারা যাচ্ছে তখন সেই শিশুদেরকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে প্রশ্ন না তুলে এইসব নতুন প্রযুক্তি নিয়ে হৈ চৈ করাটা সঠিক অগ্রাধিকারের পরিচায়ক নয়।

এটা নৈতিকতার প্রশ্ন, আবার একই সাথে রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রশ্ন। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে, যে গবেষণা সামরিক বিভাগের অনুদানে চলছে অথবা স্পষ্ট কোনো সামরিক উদ্দেশ্য সাধন করছে তেমন কোনো গবেষণা করব না। এবং যথাসাধ্য আমার চারপাশের বৈজ্ঞানিক বন্ধুদেরকে এ ধরণের রাজনৈতিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতেই প্ররোচিত করব। কিন্তু একটি সমরবাদী সমাজে যে যাই করুক না কেন, তাকেই শেষ বিচারে সামরিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। যদি আমরা যুদ্ধকেন্দ্রিক গবেষণা না চাই তবে তার জন্য ব্যক্তিগত নৈতিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়। আমাদের চাই একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত—যুদ্ধ গবেষণার জন্য কোন অর্থ দেওয়া চলবে না।

একইভাবে, আমি প্রাণীমুক্তিবাদীদের এই দাবি মেনে নিচ্ছি যে জন্তুদের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে

এরকম প্রক্রিয়ার চর্চা অবাঞ্ছিত। যদিও শেষ বিচারে আমার প্রথম আনুগত্য আমার নিজের প্রজাতির প্রতিই, এবং অন্য ধরণের যুক্তি প্রয়োগ আমার বিকৃত মনে হয়। আমি তিমি মাছ বাঁচানোর চেয়ে মানুষকে বাঁচানোর ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। তবে ব্রিটেনে প্রাণীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটা বড় অংশই চালানো হয় তুচ্ছ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, যেমন নতুন নতুন ওষুধ তৈরির কাজে। এ প্রসঙ্গে অন্তত এ কথা বলাই যায় যে ইতিমধ্যেই যে ওষুধগুলি আমরা পাচ্ছি সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট তো বটেই এমনকি অতিরিক্ত—আমাদের সত্যিকারের প্রয়োজন যা তা নতুন নতুন ঐন্দ্রজালিক ওষুধ নয়, প্রয়োজন একটি স্বাস্থ্য-উৎপাদনকারী সমাজব্যবস্থা। এ কথাও সত্যি যে 'মৌল' বিজ্ঞানের গবেষণাগারে জীব-জন্তুদের উপর যে সমস্ত গবেষণা চালানো হয় খুঁটিয়ে দেখলে তার অধিকাংশই অর্থহীন কিছু উদ্দেশ্য বা 'আমিও আছি' গোছের মনোভাব থেকে উদ্ভূত। মনে রাখা দরকার যে সাধারণ বৈজ্ঞানিকগবেষণাপত্রগুলি পত্রিকা সম্পাদক ও রেফারিরা ছাড়া আর মাত্র দু-এক জন লোকই পড়ে। সুতরাং জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার উত্তরের একটা অংশ হল প্রশ্নটিকে একটু ঘুরিয়ে করা — যথা এই ধরণের গবেষণা জীবজন্তুর উপরে হোক চাই না হোক, এর কি দাম আছে? "যে সব বিষয় আমাদের জানা উচিত নয়" সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। এমন কোন কোন ব্যাপার আছে যা জানতে চেষ্টা করা অর্থহীন, যেমন আমি আগেই প্রকৃতিতে লভ্য সব ধরণের প্রোটিনের ক্রমপর্যায় সম্বন্ধে বলেছি। কিন্তু কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয় জানাই সম্ভব হয় না কারণ প্রশ্নগুলিই ভুল বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে পেশ করা হয়। 'জাতি ও আই-কিউ' নামে যে বিতর্কটি চলছে তাতে জড়িয়ে পড়েছি বলে আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে আমি 'আই-কিউ'-এর ব্যাপারে জাতিগত গড় পার্থক্যের জীনতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণার বিরোধী কি না। আমার উত্তর, চাঁদের উল্টো পিঠ গর্‌গন্‌জোলা না স্টিলটন, কি দিয়ে তৈরী—সে গবেষণার আমি যে কারণে বিরোধী সেই একই কারণে এই ধরনের গবেষণারও বিরোধী। অর্থাৎ এটা একটা হাস্যকর প্রশ্ন, এর কোনো বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই, বস্তুত প্রশ্নটি অর্থহীন। এ প্রশ্নের ব্যাকরণগত অর্থ রয়েছে, বৈজ্ঞানিক অর্থ নেই; কারণ 'আই-কিউ' এমন কোন ফেনোটাইপ নয় যার জেনেটিক মাপজোক সম্ভব। এবং বিভিন্ন গ্রুপের ভিতরকার ফেনোটাইপের গড় প্রভেদের ক্ষেত্রে বংশগতিভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।

এসব বলার উদ্দেশ্য নৈতিকতার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া নয়। বায়োটেকনোলজির কিছু কিছু ক্ষেত্রে, জীবজন্তুর উপর পরীক্ষার ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সত্যিই এমন কিছু সমস্যাসঙ্কুল বিষয় আছে যে শুধুমাত্র অর্থনীতি বা মতাদর্শের বিচারে সেগুলিকে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। এগুলি সংখ্যায় অল্প কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ—এবং এরা আমাদের বিজ্ঞানের একটা সীমানা বেঁধে দিচ্ছে। কিভাবে এদের মীমাংসা হওয়া উচিত? সাদা আলখাল্লা পরে ভগবানের ভূমিকায় নেমেছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা, বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্যদেরকে যাঁরা কোনোই ভূমিকা দিতে চান না, আমার মনে হয় এসব প্রশ্নের মীমাংসা তাঁদের দ্বারা হতে পারে না, বা পেশাদার নীতিবাদী ও দার্শনিকদের কমিটির দ্বারাও নয়। এ সব বিষয়ের মীমাংসার একমাত্র পথ হল কি কি ধরনের বিজ্ঞানচর্চা করা হবে সে সিদ্ধান্ত গঠনের প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ। আমি বিশ্বাস করি, যদি আমাদের বিজ্ঞানকে আমরা এইভাবে সংগঠিত করতে পারি তবে

নতুন নতুন অগ্রাধিকার শুধু আমাদের কাজের বিভিন্ন নতুন নতুন সীমানাই নির্দিষ্ট করে দেবে না, আমরা হয়তো এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভবও দেখতে পাবো—যা হবে অনেক বেশি সমগ্রতাবাদী ও মানবকেন্দ্রিক।

মূল রচনা : **স্টিভেন রোজ,**

*লিমিট্‌স টু সায়েন্স, সায়েন্স ফর দি পিপ্‌ল,* কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮৪

[ স্টিভেন রোজ পড়ান ইংল্যান্ডের ওপন ইউনির্ভাসিটিতে। সমাজ, বিজ্ঞান ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক তাঁর প্রিয় বিষয়। এ ব্যাপারে *র‍্যাডিকালাইজেশন অফ সায়েন্স* বইটি সম্পাদনা করেছেন তিনি যুগ্মভাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত *নট ইন আওয়ার জিনস* গ্রন্থের যুগ্ম লেখকদের তিনি একজন। বর্তমান রচনাটি ইংল্যান্ডে এক বিতর্ক সভায় তার আলোচনার লিখিত রূপ। ]

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,* নভেম্বর- ডিসেম্বর ১৯৮৫

# খাদ্য ব্যবসায়ীর কোপে : ক্রান্তীয় বনাঞ্চল

ইউরোপ ও আমেরিকায় দ্রুত প্রসারমান মাংসজাত তৈরি খাদ্যের ব্যবসার নাম 'ফাস্ট ফুড চেন'। এর সঙ্গে ক্রান্তীয় বনানী বিনাশের সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে থাকতে পারে না বলেই মনে হয়। মুক্ত বাজারী অর্থনীতি এর চেয়েও বিস্ময়কর ফল দেখালেও তা ফাস্ট ফুড চেনের মতো প্রকৃতির পক্ষে বিপজ্জনক নয়। প্রতিবছর ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই ১৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ক্রান্তীয় বনভূমি কেটে ফেলা হচ্ছে, যা আয়তনে একত্রে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্ এর সমান। এই হারে বন কাটা হতে থাকলে আগামী ৭৩ বছরের মধ্যেই ক্রান্তীয় বনভূমি শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আমাজন অরণ্যের এক পঞ্চমাংশ কেটে ফেলা হয়েছে এবং এই ধ্বংসের হার আরও দ্রুততর হচ্ছে। আমাজন অরণ্যই পৃথিবীর মোট ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্যের এক-তৃতীয়াংশ। শুধু এই নয়—১৯৫০ সালের পর থেকে মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করা হয়েছে।

ক্রান্তীয় বনাঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের ৭% জুড়ে আছে, সেখানে বর্তমানে জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির অর্ধেকটাই বাস করে। সুতরাং ক্রান্তীয় বন ধ্বংসের সাথে সাথে আমরা রোজই এক বা একাধিক প্রজাতি হারাচ্ছি। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড' এর উপদেষ্টা নরম্যাল মেয়ার্স-এর মতে এই হারে প্রজাতি অবলুপ্তি চলতে থাকলে আগামী শতকের মাঝামাঝি সময়ে কুড়ি লক্ষ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মেয়ার্স ক্রান্তীয় বন ধ্বংসকে অন্যতম ব্যাপক জৈব দুর্ঘটনা বলে চিহ্নিত করেন। ক্রান্তীয় বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে পৃথিবীর বিবর্তনের ধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে যা ব্যাপ্তি ও গুরুত্বে সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব, সবাত শ্বাসকার্যের উদ্ভব প্রভৃতি ঘটনাগুলোর মতই তাৎপর্যপূর্ণ। বিবর্তনের ধারায় সমস্ত পরিবর্তনই গঠনমূলক নয় ; ক্রান্তীয় বন ধ্বংসের ফলে পৃথিবীর অনেক জীবসমবায়ের আচমকা বিলুপ্তি হবে এবং এর ফলে বৃহত্তর ইকোসিস্টেমের চেহারাও পাল্টে যাবে। সৃষ্টি হবে রোগ উদ্ভবকারী পতঙ্গ আর আগাছাদের নতুন পরিবেশ। এছাড়াও ভয়াবহ দিক আরো আছে। এই ধ্বংসলীলা পৃথিবীর আবহাওয়ায় এক প্রলয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে, যেমন উত্তর আমেরিকার শস্য উৎপাদক অঞ্চলকে স্থায়ী মরুভূমিতে পরিণত করতে পারে। বিজ্ঞানী মহলে বিতর্ক উঠেছে যে বন পরিষ্কারের সহজতম পন্থা হিসেবে বনে আগুন লাগানোর ফলে যে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশছে তা 'গ্রীনহাউস এফেক্টের' সৃষ্টি করবে—পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে আবহাওয়ার বিপজ্জনক পরিবর্তন.

হবে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের স্তর জমা হলে তা অবলোহিত রশ্মিকে বিকিরিত হতে দেবে না, ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে পড়বে।

**পরিবেশ বিপর্যয়ে ফাস্ট ফুড চেনের ভূমিকা**

ফাস্ট ফুড চেন-এর প্রধান পণ্য হলো গো-মাংস। এই মাংসজাত তৈরি খাদ্যের ব্যবসা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলোতে রমরমা। বিশাল বিশাল কোম্পানি এই ব্যবসায়ে যুক্ত—যেমন 'ম্যাকডোনাল্ড'। মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোতে বড় বড় খামার ও চারণক্ষেত্র বানানো হয়—এবং সেখান থেকে মাংস আমদানি করা হয়। ভালো ভালো চাষযোগ্য জমিগুলোতে চাষবাস বন্ধ করে গোচারণ খামার বানানো হচ্ছে। বনধ্বংস করে বিশাল অঞ্চল ফাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে। গোচারণ খামারগুলো গজিয়ে ওঠার জন্য যে কেবল চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাই নয়, ব্যাপক গোচারণের ফলে সমগ্র অঞ্চল জুড়েই ভূমিক্ষয় হচ্ছে—এবং জমির উর্বরতা কমে আসছে। মেয়ার্স বলেন —"পশুপালন খামারগুলোই ক্রান্তীয় ল্যাটিন আমেরিকায় বনভূমি বিলুপ্তির মূল কারণ।" তাঁর মতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে ফাস্ট ফুডের চাহিদা মেটাতেই বনধ্বংস করে সস্তায় মাংস উৎপাদনের এই তাগিদ। ব্রাজিল সরকারের তথ্য অনুযায়ী সেদেশে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে যে বনধ্বংস হয়েছে তার ৩৮% হয়েছে বৃহৎ গোচারণ খামারগুলোর জন্য।

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

গ্রীন হাউস এফেক্ট

'গ্রীনহাউস' এক ধরণের কাঁচের ঘর। সাধারণত সবুজ ছোট গাছপালা রাখা হয় এই ঘরে। কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যালোক ঢোকে এবং গাছপালা ও বাড়ীর ভেতরের অন্যান্য জিনিসপত্র দ্বারা শোষিত হয়। কিন্তু সেই আলো যখন অবলোহিত আলোর আকারে বিকিরিত হয়ে বাইরে আসতে চায় তখন কাঁচ তাকে আটকে দেয়। আসলে বিকিরিত আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি। কাঁচের বৈশিষ্ট্য হলো দৃশ্যমান আলোর থেকে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকে তার মধ্য দিয়ে যেতে দেয় না। কাঁচের বাড়ি থেকে বিকিরিত আলোকরশ্মি বেরিয়ে যেতে পারে না বলে ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ঠিক এমনই একটা ঘটনা প্রকৃতিতে হতে পারে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে যদি তা একটি স্তর সৃষ্টি করে তবে তা গ্রীনহাউসের 'কাঁচের' ভূমিকা পালন করে। কার্বন ডাই অক্সাইডের আবরণ ভেদ করে সূর্যালোক পৃথিবীতে প্রবেশ করে। কিছুটা শোষিত হয় এবং বাকিটা বিকিরিত হতে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড স্তরে বাধা পায় ও পৃথিবীর আবহমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ায়। একেই 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' বলে।

**ফাস্ট ফুড চেন-এর কাণ্ডকারখানা**

ফাস্ট ফুড চেনের উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। ১৯৬০ সালের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো গোমাংস আমদানি করতো না। তখন উত্তর আমেরিকায় মাথাপিছু বছরে মাত্র ৮৫ পাউণ্ড মাংস ব্যবহৃত হতো। ১৯৮০-তে মাথাপিছু মাংসের প্রয়োজন বেড়ে দাঁড়ালো ১৩৪ পাউণ্ড প্রতি বছরে। চাহিদা বাড়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাংসের আমদানীও শুরু হলো। ১৯৮১ সালে ৮০০,০০০ টন মাংস বিদেশ থেকে আসতে লাগলো; যার শতকরা ১৭ ভাগ আসতো ল্যাটিন আমেরিকা এবং তিন চতুর্থাংশ আসতো মধ্য আমেরিকা থেকে। সেই মাংস জোগানদারী করতেই জড়িয়ে গেলো বড় বড় ব্যবসায়ী—ফাস্ট ফুড চেনের জয়যাত্রা শুরু হলো। যেহেতু ফাস্ট ফুড চেন এখন দ্রুত প্রসার লাভ করে বছরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, স্বভাবতই বর্তমানে আমেরিকার প্রয়োজনীয় মোট মাংসের একটা ব্যাপক যোগান এই ব্যবসার অন্তর্গত।

মাংস ব্যবসার জন্যই 'ফাস্ট ফুড চেন'-এর বিশাল থাবা গিয়ে পড়েছে ল্যাটিন ও মধ্য আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপর। সেখানে কম খরচে পশুপালন ও মাংস উৎপাদন করে চালান করা হয় মার্কিন মুলুকে। মধ্য ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে সস্তায় মাংস কিনে বিক্রি করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৭৮ সালের হিসেবে দেখা যায় মধ্য আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত মাংসের দাম যেখানে প্রতি কেজি ১.৪৭ ডলার, সেখানে উত্তর আমেরিকায় মাংস বিক্রি হয় ৩.৩০ ডলার দরে।

তবে মধ্য আমেরিকার মানুষের কাছে এই মাংস মোটেই সস্তা নয়। তারা নিজ দেশে উৎপাদিত মাংস কিনতে পারে না। কোস্টারিকায় মাংস উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়েছে অথচ মাথা পিছু ব্যবহার প্রতিবছরে ৩০ পাউন্ড থেকে কমে ১৯ পাউন্ড হয়েছে। হন্ডুরাসে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। অথচ মাথাপিছু মাংসের ব্যবহার কমেছে—১২ পাউণ্ড থেকে ১০ পাউন্ডে।

ব্রাজিলের গরুর 'হুফ-এন্ড-মাউথ' রোগের জন্য মার্কিণ আইনজীবীরা ব্রাজিলের থেকে ঠাণ্ডা মাংস আনার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করলেও, প্রতি বছর ৪৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের রান্না মাংস ব্রাজিল থেকে মার্কিন মুলুকে রপ্তানি হতো। ব্রাজিলের ৮০ শতাংশ গোমাংস পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে রপ্তানি হয়, কারণ সেখানে কোনোরকম বিধিনিষেধ নেই।

**ল্যাটিন আমেরিকায় ফাস্ট ফুড চেন : কেন এই উৎসাহ ?**

এই হারে বন ধ্বংস চলতে থাকলে ১৯৯০ সালের মধ্যেই মধ্য আমেরিকার বন সাফ হয়ে যাবে। যে গোচারণ ব্যবসা এই বনহত্যার জন্য মূলত দায়ী তা কিন্তু খুবই অকার্যকর; ভূমিক্ষয় এবং মাটির পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান বিনষ্টির ফলে উৎপাদন ভীষণভাবে কমে গেছে। একটি সাধারণ গো-খামার ২০০০টি পশুর জন্য একজনকে চাকুরি দেয় এবং সেখানে কদাচিৎ মাংস উৎপাদন প্রতি একরে প্রতি বছর ৫০ পাউন্ডের বেশি হয়। অথচ উত্তর ইউরোপের খামারগুলোতে প্রতি বছর প্রতি একরে ৫০০ পাউন্ডেরও বেশি মাংস উৎপন্ন হয়। গো-খামার কৃষিকার্যের চেয়ে অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় জমি মালিকরা

কেন তাতে অংশ নেয় তা ভাবার বিষয়। কিছু ভূস্বামী গো-মাংস ব্যবসায়ে অংশ নেয় কেবল এর তথাকথিত মর্যাদার জন্যই, বড় লাভ করার উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। অন্যেরা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে এই কাজ করে—ব্যাংকগুলো এ ব্যাপারে খুবই উদার, তারা ঢালাও ঋণ দেয় এ ব্যবসায়ে। প্যান আমেরিকান স্টেটস্, দি ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার প্রভৃতি বড় বড় সংস্থাগুলো সাহায্য না করলে ক্রান্তীয় আমেরিকায় গো-মাংস ব্যবস্থা একেবারে অসম্ভব না হলেও লাভজনক অন্তত কিছুতেই হতো না। এই ব্যবসায়ে মূল লাভের কড়ি গোনে মার্কিনী ব্যবসাদাররা, কারণ মধ্য আমেরিকা থেকে পাওয়া সস্তার গো-মাংস সে দেশে ডলারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। ক্রান্তীয় বনভূমি গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডিরেক্টর জেরারডো বুডোস্কি বলেন—সবচেয়ে ভালো জমিগুলো যা বিরাট জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সেগুলোই গো-চারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, আর পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত কম উর্বর জমিতে চাষ আবাদ হয়।

**ফিরে আসবে না আর সে অরণ্য**

ক্রান্তীয় অরণ্যের ইকোসিস্টেম (যা কিনা পৃথিবীর আদিততম) চূড়ান্ত রূপে সূক্ষ্ম ও জটিল। যদিও আপনি সেখানে চারদিক সবুজ দেখবেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রান্তীয় অরণ্যে জমির উর্ব্বরতা একটা গালগপ্পোমাত্র। একেবারেই অদ্রাব্য উপাদান ছাড়া (যেমন আয়রন অক্সাইড) আর সব রকম খাদ্যই এই জমি থেকে চুঁইয়ে যায়, একে করে তোলে উষর। এছাড়াও এই ধরণের বনানীর ইকোসিস্টেম আবদ্ধ ধরণের (closed)। এখানে জমির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পাওয়া যায় বায়োমাসের মধ্যে অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন্ত চাঁদোয়া আর মাটির ওপরে হিউমাসের পাতলা স্তরের মধ্যে (যা তৈরি হয় ঐ চাঁদোয়ার থেকে উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য অংশ ঝরে পড়ার ফলে)। তাই ক্রান্তীয় অরণ্যের উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোর অগভীর শিকড় থাকা খুব স্বাভাবিক। যেহেতু জমি নিজেই খাদ্যের যোগান সুনিশ্চিত করতে পারে না তাই খাদ্যের (জৈব উপাদানগুলোর) রিসাইক্লিং-ই এই সিস্টেমকে চালু রাখে।

এখন কি হয়, যখন সুইফ্‌ট্ আরমর মিট প্যাকেজিং কোম্পানি, ইউনাইটেড ব্রান্ডস অথবা কিং র‍্যাঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতায় বড়বড় পশুচারণকারী সংস্থা দুটো বিশাল ট্রাক্টরের মধ্যে একটা বিরাট শিকল ঝুলিয়ে ক্রান্তীয় অরণ্যের কয়েক লক্ষ একর জমি সমান করে ফেলে, সমস্ত জঞ্জাল পুড়িয়ে দেয়, এবং প্লেনে করে ওপর থেকে ঐ ছাইয়ের ওপর গায়না ঘাসের বীজ ছড়ায়, আর তৈরী ঘাস-জমিতে তাদের গবাদী পশু চড়ায়?

প্রথম তিন চার বছর এই ঘাস পাগলের মতো বাড়তে থাকে, আগের বায়োমাসের যা কিছু অবশিষ্ট, তা শুষে নেয়। বাড়ের মাপ দিনে এক ইঞ্চি অবধি হয়। এরপর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ছাইয়ের স্তর ক্ষয়ে যায় এবং চুঁইয়ে বেড়িয়ে যেতে থাকে। মাটি ক্রমশই অনাবৃত হয় আর ইঁটের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে গোটা এলাকাটাই হয়ে ওঠে কৃষির পক্ষে অনুপযুক্ত। কখনও এটা আর আগের অবস্থার ধারেকাছেও ফিরে আসতে পারে না। জঙ্গল কেটে ফেলার ফলে অনাবৃত জমির থেকে ক্ষয়িত পদার্থ আমাজনে পড়ছে, প্রত্যক্ষভাবেই আমাজন উঠে আসছে।

ট্রাক্টর ও শিকল হলো জমি সাফ করার একটি পদ্ধতি। আর একটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো আগাছানাশক (Herbicide) যেমন টোরডন 2, 4-D, 2, 4, 5-T (এজেন্ট অরেঞ্জ) প্রভৃতির ব্যবহার। এজেন্ট অরেঞ্জে থাকে ডায়োক্সিন যা যে কোন জীবের পক্ষেই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত এবং যা পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে থেকে যায়।

টোরডন জঙ্গল কেটে ফেলা এলাকাকে ঘাস ছাড়া আর সবরকম উদ্ভিদের পক্ষে বিষাক্ত করে তোলে, কারণ এর অবশিষ্ট তলানি (residue) যে কোন বড় পাতাযুক্ত উদ্ভিদের পক্ষে মারাত্মক, সুতরাং পশুপালকরা চাইলেও আর এই পরিষ্কার করা জমিতে উর্ব্বরতা বাড়ানোর জন্য লেগুম লাগাতে পারে না (লেগুম জাতীয় গাছ লাগানো এমন একটা পদ্ধতি যা কৃষিবিজ্ঞানীরা জমিকে একটু বেশী সময়ের জন্য সুফলা করে তোলার পদ্ধতি হিসেব সুপারিশ করেন)। জঙ্গল পরিষ্কার করার এই ধরণের বিরাট কার্যকলাপের সাথে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রথাগত "কাটা ও পোড়ানো" পদ্ধতির কোন তুলনাই সম্ভব নয়। ঐ ব্যাপারটি খুব ছোট মাপে করা হয়। ঘটনাচক্রে ব্রাজিল ও প্যারাগুয়েতে এই ধরণের জঙ্গলভিত্তিক মানবগোষ্ঠীগুলো পশুচারণ সংস্থাগুলোর স্বার্থের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মিশনারীরা, মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো এবং পশুচারক মানুষেরাই এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন।

জঙ্গলের অধিবাসী, পাখি বা গাছের জীবন অথবা অন্য যা কিছুই তার তাৎক্ষণিক লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, পুঁজির সুনির্দিষ্ট নিয়তি তাকে ধ্বংস করতে বিন্দুমাত্র

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## জীন-পুল

কোনো একটি প্রজাতির সবকটি জীবের জীন সমষ্টিকে জীন-পুল বলা হয়। কোনো একটি প্রজাতির জীন, অন্য কোনো প্রজাতির জীনের মত নয়, তার স্বকীয়তা থাকে। সুতরাং একটি প্রজাতির বিলুপ্তির অর্থ হলো একটি 'জীন পুলের' চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। জীন হলো DNA-র কোনো একটি 'বিশেষ গুণবাহী পলিপেপটাইড়' সৃষ্টিকারী অংশ। যা বিশেষ (unique) রাসায়নিক গঠন যুক্ত। জীন-পুল ধ্বংস হওয়ার ফলে ঐ বিশেষ রাসায়নিক গঠন সম্বলিত অণুর অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। তাকে ফিরে পাওয়ার রাস্তা জানা যায়নি। অথচ উন্নত প্রজাতি সৃষ্টি করতে, বিশেষত কৃষিবিজ্ঞান উচ্চফলনশীল, রোগপ্রতিরোধে সক্ষম উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য "ব্রিডিং এবং সিলেক্শান" পদ্ধতিতে এই ধরনের বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জীনের সহাবস্থান ঘটানো হয়। আমাদের অগোচরে ক্রমাগত বহু প্রজাতি এই প্রকৃতি থেকে বিদায় নিচ্ছে, জীন-পুল ধ্বংস হচ্ছে। আজ তাই বহু বিজ্ঞানীকেই 'জীন-সংরক্ষণের' প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শোনা যায়।

দ্বিধা করেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের বড় কৃষি-ব্যবসা যেভাবে জীন-পুল ধ্বংস করতে শুরু করেছে তা চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। যেহেতু ক্রান্তীয় অরণ্য পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ জেনেটিক সম্পদের অধিকারী, তাই এই অরণ্য ধ্বংস নতুন কৃষিজাত হাইব্রিড্ বা সংকর সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জিন-পুলের ক্ষেত্রে এক অপরিসীম শূন্যতার জন্ম দেবে। এক্ষেত্রে আমরা অনাবিষ্কৃত উদ্ভিদাদির কথা ছেড়েই দিচ্ছি; শুধু ল্যাটিন আমেরিকাতেই এরকম অজানা ১৫০০০ প্রজাতি থাকতে পারে, যা চমৎকার সব গুণাবলী বহন করছে।

বিজ্ঞানীমহলের আশংকা কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমাণ বায়ুমন্ডলে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে গ্রীনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি হতে পারে—ফলে গোটা পৃথিবীর আবহাওয়ার বিশাল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

ম্যাডাগাস্কার পেরিউয়িঙ্কিল গাছটি থেকে এমন সব অ্যালকালয়েড পাওয়া গিয়েছে যা লিউকেমিয়া ও হজকিন্স রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে বিপ্লব এনেছে। এ ব্যাপারে বৃটিশ বায়োকেমিস্ট জন হ্যামফ্রিজ বলেন "যদি এই উদ্ভিদকে বিশ্লেষণ না করা হতো, তবে কোন কেমিষ্টের চরমতম কল্পনায়ও আসতো না যে এই ধরণের রাসায়নিক গঠন ঔষধবিদ্যার জগতে এত মূল্যবান হতে পারে।" এবং বাস্তব এই যে ম্যাডাগাস্কারের ৯০ শতাংশ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার 'পরিবেশ ও বিকাশ' দপ্তরের মন্ত্রী এমিল সেলিম অনুযোগ করেছেন যে—"দক্ষিণকে বলা হচ্ছে জীন সংরক্ষণ করতে অথচ অন্যদিকে উত্তরে এমনভাবে সব কিছু খরচা করে ফেলা হচ্ছে যে, তা আমাদের বাধ্য করছে জীন ধ্বংস করতে"। এই অনুযোগ মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

### গো-মাংস কোথায় গেল

যুক্তরাষ্ট্রে আমদানীকৃত গো-মাংস বাজারজাত করবার পদ্ধতি খুবই জটিল। যেহেতু এই মাংসের পরিণতি 'হট ডগ' থেকে 'টিনের স্যুপ' যা খুশী হতে পারে, তাজা মাংসকে ফ্রিজে পুরে জাহাজে করে চালান করা হয় আমেরিকার দরজা অবধি। সেখানে সরকারী কৃষি বিভাগ তা পরীক্ষা করে দেখা। এরপর 'আমদানীকৃত' এই লেবেল লাগানোর আর কোন প্রয়োজন থাকে না, এবং তা সরাসরি চলে যায় দালাল ও মাংস প্যাক করার লোকদের কাছে। প্রায়শই এই হাতবদল অনেকবার হয়। এখান থেকেই মাংস ফাস্ট ফুড চেনে ঢোকে বা খাবার প্রস্তুতকারকদের কাছে যায়। এই সাম্রাজ্যের পেছনের অর্থনৈতিক কাঠামো আরো জটিল, যার মধ্যে থাকে সরকারী বা আধা সরকারী সংস্থা, যেমন এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক এবং ওভারসীজ্ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন—বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইন্টার আমেরিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কও এ ব্যাপারে পেছিয়ে থাকে না। এই সব সংস্থাগুলোই অরণ্য অঞ্চলে পশুচারণে উৎসাহ দেয়।

ব্রাজিল সরকার আমাজন অঞ্চলে পশুচারণে উৎসাহ দেবার জন্য প্রচুর সুবিধা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে ৫০ শতাংশ আয়কর ছাড়, ১০ বছরের জন্য কর মুকুব, সুদ ছাড়া ঋণ, ইত্যাদি (এগুলো পশুচারণ সংস্থাগুলির অন্য অঞ্চলের সম্পদের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য)। যদিও ১৯৭৯ সালের পর সৃষ্টি হওয়া পশুচারণ সংস্থার ক্ষেত্রে এই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু পুরোন সংস্থাগুলো এখনো তা পাচ্ছে। এর ফলে পশুচারণে একটি কর্মসংস্থানের জন্য ব্রাজিল সরকারের খরচা হয় ৬৩,০০০ ডলার।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের গো-মাংস উৎপাদন অল্প কিছু লোকের কাছে লাভজনক হলেও, তার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তথা গোটা প্রকৃতি ও পরিবেশেকেই চড়া দাম দিতে হচ্ছে। পরিবেশ ধ্বংসের কথা ছেড়ে দিলেও এ হলো শক্তিকে প্রোটিনে পরিবর্তিত করার একটি বাজে পদ্ধতি। কর্মসংস্থান আর খাদ্যের মাপকাঠিতে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে এর কোন দাম নেই। তাদের যা প্রয়োজন তা হলো শ্রম-নিবিড় বহুচাষ পদ্ধতি।

আজকের পৃথিবী খুব সঠিক অর্থেই এমন এক নিয়মের নিগড়ে বন্দী যা তাৎক্ষণিক লাভকে অন্য সব কিছুর উপরে স্থান দেয়। এবং যতদিন এই নিয়ম মানুষকে শাসন করবে, ততদিন ক্রান্তীয় অরণ্যের সামগ্রিক ধ্বংস আর তার মানুষের চূড়ান্ত নিঃস্বতা স্বাভাবিক হয়েই থাকবে।

*Monthly Review*. December '85-এ প্রকাশিত Joseph K. Skinner-এর লেখা প্রবন্ধ 'Big Mac and the Tropical Forests' থেকে সংগৃহীত।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, সেপ্টে-অক্টো, ১৯৮৬

# সত্যর লেখা গান

১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র বর্ধমান জেলায় গ্রাম শহরে "বিজ্ঞান যাত্রা"-র আয়োজন করেছিলো। আমাদের বন্ধুরা সেখানে বেশ কিছু দিন একসঙ্গে থাকা, প্রতিদিন বিকেলে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করা আর রাতে গান ও গল্পে মেতে থাকার দারুন সময় পেয়েছিলো। এরকমই একদিন দুপুরে, সম্ভবত কুরমুণে সত্য হঠাৎই এই গানটি লিখে ফেললো। রবীনদাও (মজুমদার) গানটিতে কিছু কথা, শব্দ জুড়ে দিয়েছিলো। তারপর থেকে প্রতিদিনই অনুষ্ঠানে এই গানটিও গাওয়া হচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান চেতনা সমন্বয়, কলকাতা "গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কিছু কথা কিছু গান" নামে যে সংকলনটি প্রকাশ করেছিলো, তাতে এই গানটি সংকলিত হয়েছিল।

ইচ্ছে করলে হাঙরেরও দাঁত দেখতে পাবে
কিন্তু তেজস্ক্রিয়তায় খাবি যখন খাবে
তুমি বুঝতে পাবে না, পাবে না
(ও) তুমি বুঝতে পাবে না, পাবে না।

কীটনাশকে মাঠঘাটটা ছেয়ে যখন যাবে
বিপজ্জনক দারুণ বিষে শরীরটা বিগড়োবে
তুমি বুঝতে পাবে না, পাবে না
(ও) তুমি বুঝতে পাবে না, পাবে না।

বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলে কত শিশুর মায়
বুকের দুধ বন্ধ করে বেবিফুডই চায়
শিশুর কত ক্ষতি হয় জানে না
(ও) শিশুর কত ক্ষতি হয় জানে না।

রঙবেরঙের মোড়ক মোড়া শুধুই ভুষির টনিক
'নিষিদ্ধ ওষুধ'-এ দোকান ছেয়ে রাখে বণিক
তোমার পকেট কাটা যাবে জানো না
(ও) তোমার পকেট কাটা যাবে জানো না।

ধোঁয়াধুলো নিঃশ্বাসকে বন্দী করে রাখে
সবুজ সবুজ গাছপালা বাঁচিয়ে তোমায় রাখে
তুমি বুঝেও বোঝো না, বোঝো না
(ও) তুমি বুঝেও বোঝো না, বোঝো না।

বিজ্ঞানের ভুল প্রয়োগ বিপদ আনে ডেকে
চালবাজ মুনাফাখোর বলে রেখে ঢেকে
ও তুমি দেখেও দেখো না, দেখো না
(ও) তুমি শুনেও শোনা না, শোনো না।

সুর : প্রচলিত

# সোভিয়েত ব্যবস্থায় নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি

চেরনোবিলে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টারের বিস্ফোরণের পর *বি ও বি*-র একটি বিশেষ সংখ্যা বেরল। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির নিরপত্তাহীনতা যে অন্য শিল্পদুর্ঘটনা থেকে অন্যরকম এবং স্বকীয় সীমাবদ্ধতার কারণে সেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে কোনও জায়গায়—এমনকি সমাজতান্ত্রিক কোনও রাষ্ট্রেও—চেরনোবিল ঘটনার পর সত্য সেইসব কথা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরল এই লেখাটিতে।

**এক**

এক বান্ধবী চিঠি লিখেছেন, "রুশরা যদি দাবি করেন যে তাঁদের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলির সতর্কীকরণ ব্যবস্থা নিঁখুত, তা'হলে চেরনোবিল দুর্ঘটনা প্রমাণ করে যে টেকনোলজির সীমাবদ্ধতা আছে।"

চেরনোবিল নিয়ে সোভিয়েত সংবাদ মাধ্যমগুলি খবর প্রচারে তথাকথিত গণতান্ত্রিক পশ্চিমী প্রতিযোগীদের 'আউটউইট্' করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনেক ভেতরের খবরাখবর জানা যাচ্ছে। অবশ্য অনেকগুলিই 'বুর্জোয়া' পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে। আমরা শুধু কয়েকটি ব্যাপার একটু আলোচনা করব।

নিউক্লিয়ার পৃথিবীতে অভিজাত ধরণের দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি তিনটি। দুটি রাশিয়ায়, একটি আমেরিকায়। থ্রী মাইলস্ আইল্যান্ডের প্রলয়ঙ্কর ঘটনার পর আমেরিকান প্রশাসনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তথ্যের ঘাটতি হয়নি এবং নিউক্লিয়ার প্রশাসন ও তাঁদের মুরুব্বীদের লম্বা হাত এমনকি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড (দৃষ্টান্ত, কারেন সিল্কউডের ঘটনা) ঘটাতেও পেছপা হয়নি। তা সত্ত্বেও আমেরিকায় নতুন নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র বসছে না। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও এর বিরুদ্ধে নানান অ-সরকারী নাগরিক উদ্যোগ বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার পঞ্চাশের দশকের প্রথম দুর্ঘটনা, যার ফলে বিশাল সংখ্যার মানুষকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল, বিরাট এক অঞ্চল ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে হয়ে উঠেছিল অব্যবহারযোগ্য, মৃত আহত মানুষের সংখ্যা পার হয়ে গিয়েছিল যে কোন সাধারণ দুর্ঘটনার মাপকে, তার খবর আমরা পাই এই সেদিন। তাও এক তাড়িয়ে দেওয়া বৈজ্ঞানিকের লেখা থেকে। অবশ্য সরকারী বিজ্ঞানী মহল গবেষণার এই চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করেন নি (তাঁরা নানান বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান ওই অঞ্চলে)।

সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে চেরনোবিলের অক্ষতিগ্রস্থ চুল্লীগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁরা ব্যবহার করবেন। এও বলেছেন যে আগামী পাঁচ বছরের যে সব নিউক্লিয়ার

পরিকল্পনা আছে তা থেকে কর্তারা কিছুতেই সরে আসবেন না কিন্তু যে সমাজব্যবস্থায় দাবী করা হয় যে মানুষ আরও পরিপূর্ণ, আরও সুন্দর হয়ে উঠবে, সেখানে কেন একটা বিশেষ টেকনোলজির মারাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে খোলাখুলি তথ্য পরিবেশন করা হয় না? কেনই বা বুদ্ধিমান বিবেকবান নাগরিকরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রশ্ন তোলেন না এর ব্যবহার নিয়ে? বা আর একটু পিছিয়ে গিয়ে মৌলিক প্রশ্ন তোলা যায় যে একটি বিজ্ঞান সম্মত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিউক্লীয়ার টেকনোলজির ব্যাপক প্রয়োগের পরিকল্পনা কেন করা হয়?

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারে। সোভিয়েত রাষ্ট্র তথা সমাজ কিভাবে বিশেষ দিকে এগিয়েছে, কি ভাবে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহারের কাঠামোগুলি, কিভাবে শাসক ও নাগরিকদের মধ্যেকার সম্পর্ক একটি বিশেষ চেহারা নেয়, তার আলোচনা চেরনোবিলের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলির আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের আলোচনায় রাশিয়ার নিউক্লিয়ার ইতিহাস ও তার সঙ্গে সাধারণ রাষ্ট্রীয়-প্রযুক্তিগত সামাজিক আলোচনার সামান্য সূত্রপাত করা সম্ভব মাত্র।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে মার্ক্সবাদী বলশেভিকরা অন্ধকারাচ্ছন্ন জার-শাসিত রাশিয়ার রূপান্তর ঘটানোর জন্য খুব বেশি করে নির্ভর করেছিলেন প্রযুক্তির উপর। মার্ক্সবাদ যে উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনকে মানবমুক্তির এক আবশ্যিক দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, সে ব্যাপারে বলশেভিক তাত্ত্বিক-প্রশাসকরা প্রযুক্তির ব্যবহারকে তত্ত্ব থেকে বাস্তবায়িত করার দিকে এগোন। উন্নত প্রযুক্তির স্তর ছাড়া যে মুক্ত সমাজ বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয় তা কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লবের আগে থেকেই মনে করতো। বস্তুত মার্ক্স-পরবর্তী মার্ক্সবাদী ধ্যানধারণা প্রযুক্তিকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছিল। কিন্তু 'প্রযুক্তি' বলতে কি বোঝা হত, এ প্রশ্নটি বেশ জটিল। আসলে শিল্প-বিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে প্রযুক্তির বিবর্তন একটি নির্দিষ্ট কাঠামো বেয়েই হতে শুরু করেছিল। এবং এ ব্যাপারে বড় রাষ্ট্র, বিশেষ ভাবে আমেরিকান প্রযুক্তিগত সাফল্যই নতুন রাষ্ট্র পরিচালকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রযুক্তিগত সাফল্য মাপার মাপকাঠি আমেরিকান প্রযুক্তির মাপেই রাখা হয়েছিল। (তাই ৩০-এর দশকেও আমরা দেখি যে রাশিয়ায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমেরিকান উৎপাদন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য মতাদর্শগত ও শাস্তিমূলক চেষ্টার অমানবিক কাণ্ড কারখানা)।

তাই এল 'টেলরিজম'। এল আমেরিকান ধাঁচের নানান প্রযুক্তিবিদ। আর তার পাশাপাশি সমাজবাদী রাষ্ট্রনায়করা হয়ে উঠলেন আশ্চর্যরকম সংস্কারমুক্ত। প্রযুক্তির কোন নিজস্ব চেহারা থাকতে পারে না, যে কোন প্রযুক্তিকে লাল রং করে নিলে তা লাল হয়ে উঠবে এই বিশ্বাসই হয়ে উঠল প্রধান। কিন্তু এই 'আধুনিক প্রযুক্তির' নিজস্ব চেহারা কিভাবে গড়ে উঠেছিল, কেনই বা তা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র কাঠামো যুক্ত ব্যবস্থায় ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠেছিল? আমরা এটুকু বলতে পারি যে একটি নির্দিষ্ট সমাজে নির্দিষ্ট রাষ্ট্র কাঠামোয়—ওই রাষ্ট্রকাঠামো ও তার চালক-গুণগ্রাহী গোষ্ঠীগুলিই গড়ে তুলতে চায় প্রযুক্তির নির্দিষ্ট কাঠামো। যুদ্ধ-শিল্প-উৎপাদন আভ্যন্তরীন অস্থিরতা দমন ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সাহায্য বিশেষভাবেই কাম্য। নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ান ইতিহাসের আলোচনা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

**দুই**

"যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ধু ধু মাঠ। মৃত দেশ— না গ্রাম, না শহর শুধু চিমনী আর ভ্রষ্ট ছাঁদ বাড়িঘর, না-চাষ হওয়া মাঠ অথবা চারণভূমি, না পশুর দল, না মানুষ—কিছু না। এ যেন কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার চাঁদের মত।" ('৫৭-'৫৮ -এ উড়াল অঞ্চলের নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার ছ বছর বাদে ঐ এলাকা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানীর মন্তব্য)

"ম্যানহাটন প্রোজেক্ট"—এই নামের আড়ালেই তৈরী হয়েছিল আমেরিকান তথা পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিউক্লিয়ার অস্ত্র। এক রোমাঞ্চকর কাহিনী হিসাবে তার নানান কিস্‌সা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবীময়। আর তার রাশিয়ান সংস্করণ? "পার্জ" এড়িয়ে বেঁচে থাকা বৈজ্ঞানিকরা জীবিত স্তালিনকেই (১৯৪৯) বোমা উপহার দেন (এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের আমেরিকান বন্ধু দের সাথে পাল্লা দিয়েই '৪২ সালের মধ্যেই হোমওয়ার্ক শেষ করেছিলেন)। আমেরিকায় যে রকম মিলিটারী-ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স (জটিলতা!) এই সামরিক দানবকে বেসামরিক পোশাক পরাতে সচেষ্ট হয়েছিল এক দারুণ শ্লোগান দিয়ে, যে, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ এত সস্তা যে মিটার বসানোর দরকার হবে না, ঠিক সেই রকমই রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক-আমলা-পার্টি নেতৃত্ব ঘোষণা করছিল বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। লৌহকঠিন রাশিয়ান রাষ্ট্র তৈরী করছিল এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের। যাঁদের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা এক বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল মতাদর্শগত ট্রেনিংয়ের জন্য। বিরূপ প্রাকৃতিক ও সামাজিক বাতাবরণের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে বিশাল বিশাল শিল্প প্রকল্প বা কৃষি সমবায় গড়ে তোলাটা হয়ে উঠেছিল রোমাঞ্চকর বীরত্বপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার। অ্যাটম বোমাও এঁদের উৎসাহিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন রাশিয়ান নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরী হওয়ার পীঠস্থান গড়ে উঠেছিল একটি সাধারণ নামের গবেষণাগারকে কেন্দ্র করে। "অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স—ইউ-এস-এস-আর, দু নম্বর ল্যাবরেটরি" টি অবস্থিত ছিল মস্কোর ৮০০ কিমি পূর্বে। এই ল্যাবরেটরির দায়িত্বে ছিলেন ইগর কুরচাতভ। পশ্চিমে প্রায় অপরিচিত এই রাশিয়ান বিজ্ঞানীর ছবি তাঁর দেশের নিউক্লিয়ার পুঁথিপত্রে খুবই সহজ লভ্য। ইনিই একমাত্র "অ্যাটম বোমা" প্রকল্পের বিজ্ঞানী যাঁর সরকারী জীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

'৪০ এর দশকের শেষের দিকে ওই গবেষণাগারকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক ছোট্ট শহর এবং এর এক নতুন একইরকম অ-চিত্তাকর্ষক নাম দেওয়া হয় "দি ল্যাবরেটরি ফর মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস"। শেষ অবধি '৫০ এর দশকে পৌঁছে এর নাম বদলে রাখা হয় " দি ইনস্টিটিউট ফর অ্যাটমিক এনার্জি" — গোপনীয়তার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে এই গবেষণাগারের সঠিক চরিত্র।

এই প্রোজেক্টের আইনী কর্তা ছিলেন আর একজন বিশেষজ্ঞ, বরিস্ ভ্যান্নিকভ। কিন্তু কুরচাতভ কাজ করতেন ক্ষমতাশালী অ্যাভরামি জ্যাভেনিয়াগিনের নির্দেশে। জ্যাভেনিয়াগিন ছিলেন মতাদর্শ-প্রযুক্তি উভয় দিকের সমন্বয়সাধক। পদাধিকার বলে উপমন্ত্রী ছিলেন আভ্যন্তরীণ বিষয়ক দপ্তরের, যার সর্বময় কর্তা ছিলেন লেভেন্তলি বেরিয়া।

'৪৬ সালের মধ্যেই কুরচাতভের ল্যাবরেটরিতে প্রথম পরীক্ষামূলক রিঅ্যাক্টর প্রস্তুত হয়ে যায়। অ্যাটম বোমার 'মশলা' প্লুটোনিয়াম উৎপন্নকারী এই রিঅ্যাকটর ছিল আজকের "চেরনোবিল" এর রিঅ্যাক্টরের পূর্বপুরুষ।

মার্চ '৫৩ তে মারা যান স্ট্যালিন, আর তার সাথেই পতন হতে শুরু করে বেরিয়ার। এর সাথে তাল রেখেই উঠে আসেন আর এক রাশিয়ান নিউক্লিয়ার নায়ক — ভিয়াচেস্লাভ আলেকজান্দ্রেভিচ ম্যালিসেভ। নিউক্লিয়ার শক্তি প্রকল্পের দায়িত্ব নেন তিনি। সোভিয়েত রাষ্ট্রযন্ত্রে গোপনীয়তা প্রিয়তার ফলে তাঁর জীবনীতে নিউক্লিয়ার শক্তির সাথে তাঁর সম্পর্কের কথার উল্লেখই নেই। স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন তিনি। ক্ষমতা, মতাদর্শ আর প্রযুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞানের বলে তিনি ১৯৩১ সালেই এক পরিকল্পনা পেশ করেন তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। এতে সাইবেরিয়ায় প্রযুক্তিভিত্তিক শহর গড়ে তোলার আকর্ষণীয় এক রূপরেখা হাজির করেন তিনি। লেনিনীয় মতাদর্শের সাথে নিউক্লিয়ার শক্তি সংক্রান্ত আশাবাদী ধারণার মিলন ঘটেছিল তাঁর চিন্তা-চেতনায়। '৫৪ সালেই এক অদ্ভুত নামের দপ্তরের আড়ালে নিউক্লিয়ার শক্তির এক বড় সড় প্রকল্প শুরু হয়ে যায়। "মিনিস্ট্রি অফ মিডিয়াম মেশিন বিল্ডিং" দপ্তরের দায়িত্ব ম্যালিসেভের উপরই বর্তায়, আর ওই বছরই নিউক্লিয়ার শক্তি যে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব তা প্রমাণ করতে মস্কোর ১০০ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে ওবনিনস্ক শহরে জ্বলে উঠল নিউক্লিয়ার আলো, এই বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় একটি ৫০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র। কিছু দিনের মধ্যেই ম্যালিসেভের দপ্তরে খোলা হল আর একটি বিভাগ "সেন্ট্রাল ডাইরেক্টরেট ফর দি ইউটিলাইজেশন অফ অ্যাটমিক এনার্জি"। নিউক্লিয়ার শক্তির বেসামরিক ব্যবহারের স্বপক্ষে এই সময় প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা গড়ে ওঠে। ৫০ মেগা ওয়াট রিঅ্যাক্টরের কথা বলা শুরু হয়, যদিও বাস্তবে ৫ মেগাওয়াটের চেয়ে বড় রিঅ্যাক্টর তৈরী হচ্ছিল না। এই সময়ই বুলগানিন ও ম্যালেনকভের মুখে ধ্বনিত হয় "নিউক্লিয়ার শক্তির শতাব্দীর" কথা। '৫৬-৬০ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হয় '৬০ সালের মধ্যে ২৫০০ মেগাওয়াট নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা, যদিও বাস্তবে মাত্র ৪০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব হয়ে ওঠে। ঠিক কোন সময় থেকে এই নিউক্লিয়ার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে শুরু করে তা বলা সম্ভব নয়। তবে '৫৯ সালে শক্তি কেন্দ্রগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বক্তৃতায় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের আহ্বানের বদলে খরচ কমানোর কথা শোনা যায়। ক্রুচাতভের উত্তরসূরী এ পি আলেকজান্দ্রভ '৬২ সালে বলেন "নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহারের পথে প্রধানবাধা হল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা'।' কিন্তু আরও পরে '৬৮ সালে এসে আলেকজান্দ্রভ স্বীকার করেন যে '৪৮ সালেই কর্মীদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় ছানি পড়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই স্বীকারোক্তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মানের পক্ষে সাংঘাতিক। কেননা খুব বেশী রকম তেজস্ক্রিয়তা না পেলে এই লক্ষণ দেখা যায় না। হিরোসিমা নাগাসাকিতে প্রাথমিক ভাবে বেঁচে যাওয়া মানুষদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এর অর্থ, নিউক্লিয়ার শিল্প শ্রমিকদের জন্য অপেক্ষা করছিল লিউকেমিয়া বা অন্য গোত্রের ক্যান্সার। সাধারণ মানুষ না জানলেও সরকারি মহলের কাছে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ অজানা ছিল না, স্বয়ং ম্যালিসেভই মারা যান লিউকেমিয়ায়। আর এ মৃত্যুর পিছনে তেজস্ক্রিয়তার হাত থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু নিউক্লিয়ার শক্তির মানবকল্যাণে ব্যবহারের আপ্তবাক্যটি প্রথম বড়সড় চোট খায় ডিসেম্বর '৫৭ থেকে জানুয়ারী '৫৮ র মধ্যে সাইবেরিয়ার কিসতিমের দুর্ঘটনায়। উরাল অঞ্চলের এই দুর্ঘটনাটি নিউক্লিয়ার শক্তির ইতিহাসে একটি স্থায়ী কালো দাগ রেখে যায়। যদিও '৫৮ সালেই

ডেনমার্কের সাংবাদিকরাএই দুর্ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশ করেন তবু রাশিয়ান সংবাদ মাধ্যমগুলির সম্পূর্ণ নীরবতা এবং কোন কারণবশত (হয়ত রাষ্ট্রনায়কদের নিউক্লিয়ার স্বার্থেই) পশ্চিমী দেশগুলিতেও এ ব্যাপারে হৈ চৈ না হওয়ায় ঘটনাটির উপর নিস্তব্ধতার এক আবরণ পড়ে যায়। অনেক পরে, ১৯৭৬ সালে নির্বাসিত রুশ বিজ্ঞানী জোরেস মেডভেডভ "নিউ সায়েন্টিস্ট" পত্রিকায় রাশিয়ায় বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন। মেডভেডভের মতে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল নিউক্লিয়ার বর্জ্যপদার্থের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটায়। মেডভেডভ এও দেখান যে রুশ বিজ্ঞানীরা এই অমূল্য 'সুযোগ' হাতছাড়া করেননি মোটেই। জীবদেহ তথা পরিবেশের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে '৬৬ সাল থেকে '৭৯ সাল অবধি রাশিয়ান পত্রিকাগুলিতে একশ'র উপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "ইলেঙ্কোর লেক" নামে পরিচিত এক জলাশয়ে "জলের নিচের জীবনের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব" সংক্রান্ত আলোচনায় লক্ষ্য করা হয় লেকটি যে চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলে অবস্থিত তা সেন্সরের নজর এড়িয়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। আর কিসতিম অবস্থিত চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলেই। মেডভেডভ এও দেখান যে বিশেষ অবস্থায় নিউক্লিয়ার বর্জ্যপদার্থের ভান্ডারে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বস্তুত, প্রাথমিক শৈথিল্য কাটিয়ে ওঠার পর কর্তৃপক্ষ ওই অঞ্চলের মানুষজন অন্য অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যান। তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষে ভরে ওঠে হাসপাতাল ক্লিনিক। উত্তর-দক্ষিণ প্রধান হাইওয়ে, যা কিসতিমের মধ্যে দিয়ে যায়, তা ন'মাসের জন্য বন্ধ রাখাহয়। যখন এই রাস্তা খোলা হয় তখন মোটর গাড়ী চালকদের সাবধান করে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা কুড়ি কিলোমিটারের মধ্যে না থামেন এবং সবসময় জানালা বন্ধ রাখেন। এক যুগ বাদেও ওই এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের উপদেশ দেওয়া হয় গর্ভপাত করাবার জন্য। কারণ জেনেটিক বিকৃতির সম্ভাবনা প্রবল।

কিসতিম দুর্ঘটনা ছাড়াও ক্রুশ্চেভের ক্ষমতায় আসাও সাময়িক ভাবে নিউক্লিয়ার শক্তির ক্ষেত্রে উৎসাহ কিছুটা কমায়। এই সময় বিজ্ঞান প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কথা বলা হলেও "লাল প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ"দের প্রভাব কিছুটা কমে, যদিও 'মিনিস্ট্রি অম মিডিয়াম মেশিন বিল্ডিং' টিঁকে থাকে। কিন্তু এর কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রচুর কমিয়ে দেওয়া হয়। আসলে সাধারণ নাগরিদের মাথার অনেক উপরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য নেতৃবৃন্দের যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল তাতে প্রভূত ক্ষমতাশালী "প্রযুক্তি আমলা"রা ছিলেন ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে। ক্রুশ্চেভ এঁদেরকে "ইস্পাত-খাদক" আখ্যা দেন, স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজ জীবনের সমস্ত স্তরে উদারনৈতিক সংস্কারের দাবিতে যে অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, সাময়িক ভাবে হলেও, তাকে সমর্থন করেন এবং পলিটব্যুরোর বিরুদ্ধে সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সাহায্য নিয়ে ক্ষমতার লড়াইতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন।

এই সময় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। এর জায়গা নেয় এক নতুন সপ্ত বার্ষিকী পরিকল্পনা। নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয় প্রায় ছেঁটে ফেলা হয়, ভারকেন্দ্র সরে যায় অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের দিকে। '৮০ সাল অবধি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত পরিকল্পনার রূপরেখায় ক্রুশ্চেভ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকে প্রায় বাদই দেন, কিন্তু অক্টোবর '৬৪ তে ক্রুশ্চেভের পতনের পর নিউক্লিয়ার শক্তির স্বপক্ষে প্রচারাভিযান আবার শুরু হয়। এই সময়েই প্রকাশিত হয় কুরচাভভের জীবনী।

ক্ষমতায় ফিরে আসা বিশেষজ্ঞরা বলতে থাকেন উন্নত ধরনের নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার কথা। '৬৪ সালের মধ্যেই নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র সংক্রান্ত কাজকর্ম আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে এবং শক্তিমন্ত্রকের অধীনে একটি "অ্যাটমিক পাওয়ার ডিভিশন" পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সময় থেকেই রাশিয়ান বিশেষজ্ঞরা দু'ধরনের রিঅ্যাক্টর কাজের জন্য বেছে নেন। একটি হল "লাইট ওয়াটার কুলড গ্রাফাইট মডারেটেড টাইপ" যাকে বলা হয় RBMK অন্যটি' 'প্রেসারাইজড ওয়াটার কুলড টাইপ' 'অর্থাৎ PWR। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে RBMK রিঅ্যাক্টর সাময়িক ভাবে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের অপছন্দ হলেও তার একটি উন্নত সংস্করণ ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে সম্ভবত অস্ত্র তৈরীর মানের প্লুটোনিয়াম পাওয়া সম্ভব বলেই, এবং চেরনোবিলেও এই রিঅ্যাক্টরেই দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৮৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ২৭ টি রাশিয়ান PWR রিঅ্যাক্টর ব্যবহৃত হয় অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে। RBMK অবশ্য বিদেশে রপ্তানী হয় না। এই টাইপের ২৮টি রিয়্যাক্টর রাশিয়াতেই কাজ করছে।

১৯৭১ সালে চব্বিশতম CPSU কংগ্রেসে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক নতুন নিউক্লিয়ার লক্ষ্যমাত্রা যোগ করা হয়। এটা ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে ৬-৮০০০ মেগাওয়াট এ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে না পারলেও দশম পরিকল্পনায় ('৭৬-'৮০) এই লক্ষ্যমাত্রা একই মানে রাখা হয়েছিল।

এই সময়েই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিতে এক নিউক্লিয়ার "তুষার যুগ" শুরু হয়। অর্থনৈতিক মন্দা ছাড়াও পরিবেশ আন্দোলন এব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের কোন স্বাধীন আন্দোলনের মুখোমুখি হতে হয় নি। পরন্তু তেল ও গ্যাসের অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজারে চাহিদাবৃদ্ধিও ফুরিয়ে যাওয়ার সাহায্য করে। ১৯৮০ সালের মধ্যে ১৩০০ থেকে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা করা হয় এবং '৮০ র দশকে প্রত্যেক বছর ১০০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরী করা হয়।

PWR ও RBMK ছাড়াও রাশিয়ানরা ১৯৭২ সালে তাদের প্রথম বাণিজ্যিক ব্রীডার রিঅ্যাক্টরের মডেল তৈরী করে (BN৩৫০)। ১৯৮০ সালের মধ্যেই এর একটি বড় সংস্করণ BN৬০০ বেলোইরাস্কেতে বসান হয় এবং এক বিশাল ১৬০০ মেগাওয়াট মানের রিঅ্যাক্টরের উপর গবেষণা চলছে। ১৯৯০ অবধি পরিকল্পনায় নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হার অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। ১৯৮২ সাল অবধি হিসাব অনুযায়ী দেশের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলি কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ ১৮,৫০০ মেগাওয়াট, আর এই মুহূর্তে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ২৮,০০০ মেগাওয়াট। এ হল সমস্ত রকমের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদেনের ১১ শতাংশ, পৃথিবীতে তৃতীয়, ফ্রান্স এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরই। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় যে নিউক্লিয়ার শক্তির উৎপাদন বাড়ানোর এই দ্রুত চেষ্টা কি এই ব্যবস্থাকে আরও নড়বড়ে আর বিপজ্জনক করে তুলেছে? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'অ্যাটমমাশের" কথা। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরী করার জন্য যা যা লাগে তার সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য এই নামের অনেকগুলি কারখানার সমষ্টি তৈরী করা হয় মস্কোর কাছাকাছি ভোল্গোদনস্ক-তে। রিঅ্যাক্টরের সমস্ত যন্ত্রাংশ তৈরী করার এই প্রকল্পে ২৮০০০ শ্রমিককে তিন শিফটে কাজ করতে হয়। এবং এর বিদ্যুৎ সরবরাহ

করার জন্য নিজস্ব রিঅ্যাক্টর ব্যবহার করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে "মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার মেশিনারী"র অধীন এই প্রকল্প আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাজনিত যন্ত্রাংশ সরবরাহের ব্যাঘাতকে কাটিয়ে উঠবে। এটি উৎপাদন শুরু করার দু'বছরের (১৯৮৩) মধ্যে আবিষ্কৃত হয় যে একটি জলাধারের খুব কাছাকাছি একে তৈরী করা হয়েছে এবং এর ফলে ভিতের ক্ষতি হওয়া খুবই সম্ভব। মেডভেডভ জানিয়েছেন সোভিয়েত শিল্পের এত বড় দুর্যোগের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। ইউরি আন্দ্রোপভ এই অবস্থার তদন্ত করার জন্য এক কমিশন নিয়োগ করেন। ভ্লাদিমির জেলগিখ, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি এবং পলিটব্যুরোর ক্যান্ডিডেট সদস্য, ভোল্গোদনস্ক উড়ে যান এই পর্যবেক্ষণে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কমিশনে পাওয়া তথ্য সাধারণ মানুষকে জানান হয় নি, কিন্তু স্টেট কন্সট্রাকশন কমিটির চেয়ারম্যান এবং আরো অনেককে বরখাস্ত করা হয়। কেউ অবসর নেন, কাউকে পোরা হয় জেলে। জানা যায় অ্যাটমিক শিল্পের বহু যন্ত্রাংশর মান খুবই নীচু। এই খবরের সমর্থন মেলে আমেরিকান পত্রিকা "নিউক্লিওনিকস উইক" থেকেও। পত্রিকাটি রাশিয়ান পত্রিকা সোসালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিকে উদ্ধৃত করে জানায় চেরনোবিল প্রকল্পের তৃতীয় ইউনিটের জন্য ভুল মাপের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করার কথা। বস্তুত অনুমান করা যায় ১৯৭৯ র পর থেকে ছোটখাট দুর্ঘটনার হার রাশিয়ায় বেড়েই চলেছে এবং একে আরও জটিল করে তুলেছে বর্জ্যপদার্থ রাখার ব্যাপারে নিদারুণ উদাসীনতা।

থ্রি মাইলস আইল্যান্ডের দুর্ঘটনার পর '৭৯ সালে পেনসিলভ্যানিয়ার গভর্ণর ডিক মর্ণবরো রাশিয়া সফরে গেলে বোরম্যান এম. ভিসিয়ানি, সোভিয়েত কমিটি ফর সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির ডেপুটি চেয়ারম্যান, তাঁকে বলেন "সোভিয়েত ইউনিয়নে নিরাপত্তার প্রশ্নটি সমাধান হয়ে গেছে।" এই বক্তব্যের সাথে চমৎকার সঙ্গতি রেখেই ঘটে গেল চেরনোবিল দুর্ঘটনা— নিউক্লিয়ার ইতিহাসের স্মরণীয় অশুভ দিনে।

## তি ন

> "একটি নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর উপর দুর্ভাগ্যের যে ছায়া নেমে এসেছে তা অনিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারের ফলে মানব-মৃত্যুর সম্ভাব্য পরিণতিকে আরও নাটকীয় করে তুলেছে"।
>
> —সাংবাদিক সম্মেলনে আনাতোলি কোভালিয়ভের (সোভিয়েত উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী) উক্তি।
>
> "সত্যিকারের অবস্থাটা লুকোনো অসম্ভব।"
>
> —আন্দ্রেই ভোরোবিইঅফ, অ্যাকাডেমি অফ মেডিকেল সায়েন্স।

রাশিয়ার নিউক্লিয়ার ইতিহাসের আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় আলাদা করে নিতে পারি। যেমন (১) নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদনে বিশেষ রাষ্ট্রীয় আগ্রহ, (২) এ ব্যাপারে ,পর্যাপ্ত তথ্য নাগরিকদের না জানতে দেওয়া, (৩) অন্যান্য দেশগুলির রাষ্ট্রনায়কদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব, (৪) সামরিক প্রয়োজনে সৃষ্ট প্রযুক্তিকে বেসামরিক .চেহারা দেওয়া, (৫) নির্মম আইন প্রণয়ন, যাতে নাগরিক অধিকার এই ক্ষেত্রে না প্রয়োগ করা যায়, (৬) নাগরিকদের তরফ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার (যা তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে) কাছে আত্ম সমর্পন, (৭) প্রযুক্তিগত কাজকর্মের

ব্যাপারে প্রযুক্তির দিক তথা মানবিক দিক থেকে না ভেবে রাজনৈতিক দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রভৃতি।

কেন সোভিয়েত নাগরিকরা তাঁদের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলি ঘেরাও করেন না? এ প্রশ্নে উত্তর খুব সহজ হবে না বলে মনে হয়। রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্ক কি ভাবে নির্ধারিত হয় সে প্রসঙ্গে মোটা দাগের ভাষায় এটুকু বলা যায় যে এ হতো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সমস্ত মানবসম্পদের পরিকল্পনামাফিক ব্যবহারের চেষ্টা। রাষ্ট্র পরিচালনাকারী পার্টি (এ ক্ষেত্রে পার্টি মানে পার্টি পরিচালক অল্প কিছু ব্যক্তি, যাঁরা পরিকল্পনা তৈরি করেন) উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য নাগরিকদের ব্যবহার করতে চায়। এক্ষেত্রে "উন্নয়ন" কথাটির অর্থ মোটের উপর, (ক) ক্যাপিটালিস্ট পৃথিবীর বিশেষত আমেরিকার অস্ত্রসম্ভারকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় এক বিশাল উন্নত বিজ্ঞান নির্ভর অস্ত্র সম্ভার তৈরী, (খ) ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার মাপে যা যা অত্যাবশ্যক পণ্য ও ভোগ্যপণ্য তা তৈরি করা, বিজ্ঞান নির্ভর অস্ত্রসম্ভার তৈরি করা, (গ) অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দমনের জন্য যে সমস্ত প্রতিস্ঠান প্রয়োজন, তাদের এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তৈরী করা, (ঘ) সামাজিক সহায়তা প্রদান। (এর মধ্যে চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়ে। 'গ' এবং 'ঘ' এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান)।

কিন্তু মানুষ বড়ই জটিল। সে যে এই 'উন্নয়নের' লক্ষ্যে চালিত হবে, এতেই যে তার সুখ, তার গ্যারান্টী কোথায়? তাই রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের সূক্ষ্ম থেকে স্থূল সব ব্যবস্থাই মজুত রাখতে হয়। কিন্তু শুধু বলপ্রয়োগেই কি সব সম্ভব? এ প্রসঙ্গে আইজ্যাক ডয়েটশারের মন্তব্য স্মরণীয়। স্তালিন যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের নির্মমতা মানুষ মেনে নেয় কেন, এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে শুধু সন্ত্রাস নয় মোহও আছে। আবার শুধু মোহ নয় সন্ত্রাসও আছে। তাই সাধারণ সোভিয়েত নাগরিকের 'মানসিক প্রোগ্রামিং'ও খুব জরুরী। এর গুণে সে বলে উঠবে, 'নিউক্লিয়ার শক্তি ফুলের মত সুন্দর — বিরুদ্ধে যারা কিছু বলে তারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল'!

চেরনোবিল দুর্ঘটনার পর সমস্ত শক্তি এবং জ্ঞান জড়ো করা হয়েছিল এর ভয়ঙ্কর প্রভাবকে শেষ করে ফেলার জন্য। সমস্ত আমলাতান্ত্রিকতা ভেদ করে সাময়িকভাবে হলেও মানবিকতার নানান বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত মানুষদের মধ্যে। মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাড়ের মজ্জা বদলে ফেলার সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের জন্য পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞদের এবং চরমতম মহার্ঘ্য যন্ত্রপাতি এক জায়গায় আনা হয়েছিল। অবশ্য অল্প কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া সাফল্য লাভ করেছিল। এর থেকে বড় ধরণের বিপদের ক্ষেত্রে সমস্ত সভ্যতা কি পরিমাণ অসহায় তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং সর্বোপরি ভবিষ্যৎ মানুষের সুরক্ষার দিক থেকে নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার মারাত্মক ফলদায়ী। অথচ দেখুন, রাশিয়ান শক্তি উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আলেক্সেই মাকুখিন মে মাসের শেষের দিকে বলেছেন আগামী চার বছরে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ দ্বিগুণ করা হবে। ২৫ শে ডিসেম্বর টি.ভি. মারফত জানা যায় চেরনোবিল আবার চালু হচ্ছে। আমরা বলতে পারি সিদ্ধান্তটি প্রযুক্তিগত বা মানবিক নয়, সিদ্ধান্তটি ক্ষমতাকেন্দ্রীক রাজনীতির। এই ধরণের সিদ্ধান্ত বোধহয় যেকোন নিউক্লিয়ার শক্তিধর রাষ্ট্রই নিত। তবে রাশিয়ার ক্ষেত্রে এর কিছু নিজস্বতা আছে, কারণ রাশিয়ায় প্রশাসক,

— ক্ষমতার কাঠামো এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেকার সম্পর্কের রূপটি বিশেষভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে, এবং রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ ও মতাদর্শগত প্রচার, যাঁরা ভুক্তভোগী, সেই সাধারণ নাগরিককে এক বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে গেছে।

পরিবেশ সচেতন, হিংসাবিরোধী এবং আনন্দনির্ভর এক খোলামেলা সমাজের কথা যাঁরা বলেন সেই পশ্চিম জার্মানীর "গ্রীন" রা একবার আমেরিকা ও রাশিয়ার শাসকগোষ্ঠী উভয়ের কাছেই প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার আবেদনসহ। এঁদের একজনের মনে হয়েছিল যে দু'পক্ষই স্কুলের বাচ্চাদের মত একে অন্যের দিকে অভিযোগের আঙুল বাড়াচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত ভাবে। আজকের পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন আতঙ্ক, হিংসা, সন্দেহ এই ধরণের মনোভাব দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। এবং চেরনোবিল দুর্ঘটনা এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসলে একজন মানুষের কাছে ভাল জীবন, টেনশন বিহীন জীবন কি হতে পারে তা তাকেই ঠিক করতে হবে। নয়ত রাষ্ট্রীয় 'ভাল জীবন' তাকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেবে।

আসলে যে ছোট গোষ্ঠী বিশেষ জ্ঞানের বলে সমস্ত নাগরিকদের উন্নত জীবনে নিয়ে যাবেন বলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন (যাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত দমনকারী যন্ত্র নতুন ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে) তাঁরা ক্ষমতার মাধ্যমে সমাজকে সুস্থ রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার তাঁদের কাছে সর্বাবস্থায় কাম্য ছিল। কিন্তু মানুষ যখন ক্ষমতার কাঠামোয় প্রবেশ করে তখন তার কি পরিবর্তন হয় তা পরবর্তীকালে বোঝা যায়। যে প্রযুক্তিকে প্রাণহীন মনে করা হয়েছিল তাও যে শুভাকাঙ্খী মানবিক শাসকদের মধ্যে ক্ষমতাভিত্তিক মানসিকতা তৈরীতে সাহায্য করতে সক্ষম তা ক্রমশ প্রকাশ পায়। যে সব ব্যবস্থা সাময়িক হিসাবে, 'প্রয়োজনীয় খারাপ ব্যবস্থা' হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তা ক্রমে চিরস্থায়ী এবং ক্রমপ্রসারমান রূপ নেয়। সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়ার অস্ত্র এবং তার জন্য অতি প্রয়োজনীয় সমাজতান্ত্রিক নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র প্রযুক্তির হিংস্র বহিঃপ্রকাশ হিসাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যক্তিমানসে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রনায়করা চাইলেও তাকে আর ছুঁড়ে ফেলতে পারেন না। এর সাথে সাথে আসে আতঙ্ক, যদি কেউ এই ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে চায়। তাই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদা সচেষ্টতা, তাই সংবাদপত্রের নিশ্চুপতা, তাই ব্যক্তি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের জন্য কারেকটিভ লেবার ক্যাম্প বা স্পেশাল সাইকিয়াট্রিক ক্লিনিক। এমত ছায়াচ্ছন্ন সময়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাশিয়ার নাগরিকরা তথা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, জানু-ফেব্রু ১৯৮৭

# সবুজ সম্ভাবনা

গ্রীন পার্টির আবির্ভাব বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিদেশী, লেখকদের রচনা থেকে বন্ধুরা খুঁজছিলেন গ্রীন পার্টি ও তার কাজকর্মের খবরাখবর। সত্যও এ বিষয়ে পড়াশুনো করছিল। এরই ফলশ্রুতিতে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিতভাবে ১৯৮৮ সালে *বি ও বি*-র চারটি সংখ্যায় এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

## এক

১৯৮৩ সালের ২২ মার্চ পশ্চিম জার্মানীর রাজধানীর প্রধান রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মূল মিছিলে মানুষের সংখ্যা সাতাশ। এঁদের মধ্যে আছেন একজন নার্স, একজন দক্ষ শ্রমিক, একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি, একজন রাজমিস্ত্রি, কয়েকজন শিক্ষক, একজন পশুচিকিৎসক, একজন অবসরপ্রাপ্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামার, তিনজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন পুস্তকবিক্রেতা, একজন স্থপতি, একজন সাংবাদিক, একজন কৃষি-অধ্যাপক এবং একজন আইন ব্যবসায়ী। মিছিলের সবাই পরে আছে উজ্জ্বল অথচ সাধারণ জামা-কাপড়, মাঝে রয়েছে একটি বিরাট রবারের গোলাকৃতি পৃথিবীর মডেল আর ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলের পরিবেশ দূষণের কোপে পড়ে শুকিয়ে যাওয়া একটি গাছের ডাল। শোভাযাত্রার সাথে রয়েছেন বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলনের তথা নানান দেশের প্রতিনিধিরা। মিছিলটি ক্রমশ জার্মান জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ বুণ্ডেস্ট্যাগ-এ ঢুকল। মিছিলটি অভিনব এই কারণে যে বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম একটি নতুন দল বুণ্ডেস্ট্যাগে প্রবেশ করে ডানদিকে বসে থাকা রক্ষণশীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট এবং বামদিকে বসে থাকা উদারনৈতিক বামপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটের মধ্যে জায়গা করে নিল। এই মানুষরাই হলেন "ডী গ্রুনেন" বা দ্য গ্রীনস)।

যাঁরা "সবুজ" তাঁরা বলেন যে তাঁরা হলেন 'দল-বিরোধী দল', অন্য অর্থে বিভিন্ন ধরণের নাগরিকদের আন্দোলনের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। তাঁরা মনে করেন বর্তমান পৃথিবী যে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা-জনিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত তা কখনই এক একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। কোনও আগে-পরে সমাধানের চেষ্টার ব্যাপার নয়। প্রতিটি সমস্যা ও তার সমাধান একে অপরের সাথে গভীরভাবে বিজড়িত এবং অবশ্যই তার চরিত্র আন্তর্জাতিক। তাঁদের মতে প্রতিষ্ঠিত যান্ত্রিক সভ্যতা তথা চালু শিল্প-নির্ভর সমাজই তৈরী করেছে এক আর্থিক ও আত্মিক দারিদ্র। গ্রীনদের তুলে ধরা জরুরী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না কোনও প্রতিষ্ঠিত

দল তথা শাসনব্যবস্থা। ফলে তাঁদের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে আরো শাণিত।

কোন্ ধরণের মানুষ আছেন গ্রীনদের মধ্যে? উত্তরটা আগ্রহ বা কৌতুহলোদ্দীপক। কারণ মতাদর্শ বা পেশাগত ভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ দ্বন্দ ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে নানান ধরণের কাজ করছেন এখানে। একদিকে যেমন রয়েছেন ইকোলজিস্টরা, তেমনই রয়েছেন নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহনকারিরা, আছেন শান্তি আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন তথা তৃতীয় বিশ্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এমন কর্মীরা। মতাদর্শর দিক থেকে ভাগ করলে স্বপ্নদ্রষ্টা সামগ্রিক চিন্তাবাদী(visionary/holistic) গ্রীনরা, ইকো-গ্রীনরা, শান্তি আন্দোলনকারী গ্রীনরা এবং মৌলিক পরিবর্তনবাদী বামপন্থী গ্রীনরা—সবাইয়েরই অবদান রয়েছে সামগ্রিক আন্দোলনে।

সবুজ রাজনীতিতে প্রথমেই এটা স্বীকার করে নিতে হয় যে আমরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছি এক বহুমুখী পৃথিবীব্যাপী সমস্যার পঙ্কিল আবর্তে যা আমাদের জীবনের সমস্ত দিককেই গ্রাস করছে। আমাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের উপায়, আমাদের পরিবেশের উৎকর্ষ, আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, প্রযুক্তি — শেষ বিচারে আমাদের অস্তিত্ব, কোন কিছুই বাদ যাবে না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায় ৫০ হাজার নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড একে অন্যের দিকে (নাকি নিজের দিকেই) তাক করে সাজান রয়েছে যা আমাদের সুন্দর সবুজ পৃথিবীকে বেশ কয়েকবার ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তবুও অস্ত্র প্রতিযোগিতা দ্রুতগতিতে এগিয়েই চলেছে। একই আকাশের নীচে যেখানে প্রতিদিন সমর খাতে খরচ প্রায় একশ কোটি টাকা সেখানে প্রতি বছর প্রায় পনের লক্ষ মানুষ স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা যায়, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে বত্রিশ জন, যাদের অধিকাংশই শিশু।

উন্নয়নশীল দেশে অস্ত্রের জন্য খরচ স্বাস্থ্যরক্ষাজনিত খরচের তিন গুণেরও বেশী। গোটা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদদের প্রায় অর্ধেক নিযুক্ত অস্ত্র নির্মাণ গবেষণায়। পাশাপাশি, একশ জনে পঁয়ত্রিশ জন মানুষ পান না পানের উপযুক্ত নিরাপদ পানীয় জল। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সীমা বিপজ্জনকভাবে নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার বদলে জমা করছে এখানের বদলে সেখানে এবং সেখানের বদলে এখানে। তাঁরা ভুলে যান যে একই ইকোসিস্টেমের মধ্যে "অন্য কোথাও" বলে কোন জায়গা হয় না। আধুনিক ওষুধই সময় সময় আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এক ভীতিকর জিনিস।

আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিকরা কোনও দিনও জানতে পারবেন না ঠিক কি ভাবে, কোথা থেকে শুরু করতে হবে এই ধ্বংসমুখী জীবনধারার চাকাটিকে সুস্থ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে ঘুরিয়ে দেবার কাজ। তাঁরা ক্ষতি কমাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিয়ে তর্ক তোলেন। তর্ক তোলেন অল্পমেয়াদী প্রাযুক্তিক ও অর্থনৈতিক দাওয়াইগুলির আপেক্ষিক সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। তাঁরা বোঝেন না যে আমাদের সময়ের বড় বড় সমস্যাগুলি একই সঙ্কটের বহুমুখী রূপ, অর্থাৎ আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সমস্যাগুলি কখনই ভালভাবে বোঝা যাবে না যদি বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলিকে দেখা হয়, অথচ মজার ব্যাপার হল যে সরকারী

সংস্থা তথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সেভাবেই দেখতে শেখায়। এই ধরণের প্রচেষ্টাগুলি সমস্যা সমাধানের বদলে সামাজিক তথা ইকোলজিভিত্তিক জটিল জালের মধ্যে তাদেরকে একদিক থেকে অন্যদিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। গ্রীনরা মনে করেন সমাধান লুকিয়ে আছে এই জালের কাঠামোর পরিবর্তনের মধ্যেই এবং তার অর্থ হল ধারণা, মূল্যবোধ এবং আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এক গভীর পরিবর্তন।

পৃথিবীব্যাপী যে সঙ্কট তা থেকে মুক্ত হবার প্রথম পদক্ষেপ হল এক নতুন 'প্যারাডাইম'কে স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ বাস্তবকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা। এই পরিবর্তনের শুরু এখনই দৃশ্যমান এবং আশা করা যায় যে এই দশককে তা প্রভাবিত করবে। যে প্রতিষ্ঠিত প্যারাডাইমটি এখন পিছু হটছে তা বেশ কয়েক শ' বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এসেছে, গড়ে তুলেছে আধুনিক পশ্চিমী সমাজকে, যার ছোঁয়াচ পড়েছে গোটা দুনিয়া জুড়েই। গ্রীনরা দেখিয়েছেন যে এই প্যারাডাইম থেকে গড়ে উঠেছে যে মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা তাকে ছোট করে প্রকাশ করলেও অন্তত কয়েকটি বহিঃপ্রকাশ মোটা দাগের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে ফেলা যায়।

ক. এই বিশ্বপ্রকৃতি হল এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা টুকরো টুকরো মৌলিক বস্তুপুঞ্জর সমাহারে তৈরি।

খ. মানুষের শরীর এক উন্নত মানের যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

গ. সমাজ-শরীরের প্রাণবস্তু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অস্তিত্বের জন্য পারস্পরিক সংঘাত।

ঘ. অর্থনৈতিক ও কারিগরি দক্ষতার বিকাশের মধ্য দিয়ে সীমাহীন বস্তুগত উন্নতিই মানুষের মূল লক্ষ্য।

এবং শেষ, যদিও সর্বশেষ নয়, এক বিশ্বাস —

সেই সমাজই প্রকৃতির প্রাথমিক নিয়ম মেনে চলে যে সমাজে নারীরা পুরুষের অধীন।

গ্রীনদের মতে এই ধারণাগুলির স্থূলতা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে এবং মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন নিবিড়ভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ববীক্ষা পরিবর্তনের এই যে প্রয়োজনীয়তা তার একটি অঙ্গ হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশেষত পশ্চিম জার্মানীতে সবুজ রাজনীতির বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। রাজনীতির প্রাচীন এবং ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষেত্রে ডানপন্থা এবং বামপন্থার সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ক্রমশ উপরে উঠে আসছে এক নতুন চিন্তার আলোক—সবুজ রাজনীতি, যা এক ইকোলজিভিত্তিক সর্বাত্মক (holistic) এবং নারীবাদী আন্দোলন। এই নতুন রাজনীতি যা বলতে চায় তার কয়েকটি সাধারণ দিক হল—

১. এই বিশ্বে যা ঘটছে তা একে অপরের সাথে জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

২. প্রকৃতির আবর্তন পদ্ধতির মধ্যে ব্যক্তিমানুষ তথা সমাজ গভীরভাবে গ্রথিত।

৩. পুরুষকর্তৃত্ব হল অন্যায় এবং ধ্বংসাত্মক এবং এর উন্মোচন প্রয়োজন।

৪. সামাজিক দায়িত্ববোধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

৫. এবং সর্বোপরি এমন এক সুস্থ, মানবিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে যা ইকোলজিভিত্তিক, বিকেন্দ্রীভূত, সমদর্শী এবং নমনীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মানুষের নিজের জীবনের উপর অর্থপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

সহযোগিতাভিত্তিক এক দুনিয়া গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে সবুজ রাজনীতি প্রকৃতির, ব্যক্তি মানুষের, সামাজিক গোষ্ঠীর এবং জাতিগুলির উপর শোষণের শেষ দেখতে চায়।

সমস্ত ধরণের হিংসা বিরোধিতায় গ্রীনরা সোচ্চার। সমাজের মধ্যে বহুমুখী ভাবধারার প্রচেষ্টায় এক উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্বাসী তাঁরা। জ্ঞান এবং সমবেদনাপূর্ণ এক বিকাশে আগ্রহী সবুজ রাজনীতি হল প্রাচীন পৃথিবীতে এক নতুন বসন্তের ইস্তাহার।

## দুই

যে সব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে গ্রীন পার্টি গড়ে উঠেছে সেগুলিকে বোঝা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনায় কয়েক দশক অন্তর এক একবার জার্মান যুবকদের এই ধরণের আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। তাতে নাৎসী যুব আন্দোলনের কথাও বাদ যায় নি, যেখানে জার্মানীর সীমানার ভিতর প্রকৃতি যে পবিত্র এই শিক্ষাও দেওয়া হয়েছিল। অন্যরা অবশ্য '৬০-এর দশকের ইউরোপ-আমেরিকা জোড়া ছাত্র-যুব আন্দোলন বা বিকল্প সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই এর প্রথম ইঙ্গিত লক্ষ্য করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সবুজ রাজনীতিকে বুঝতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান সমাজের পটভূমিতেই তাকে বুঝতে হবে, এবং তা বুঝতে গেলে আরও একটি অন্ধকার ছায়াও এসে পড়ে, তা হল নাজী যুগ।

যুদ্ধ পরবর্তী যুগে বড় হয়ে ওঠা ছেলে মেয়েরা তাদের অতীত সম্পর্কে এক ধরণের নৈঃশব্দ্য দেখতে পায়। এই সময় থেকে বয়স্করা জার্মানীকে শিল্পনির্ভর, স্বচ্ছল এক দেশে রূপান্তরিত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, এবং উৎপাদন-নির্ভর এক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু মূলত ছাত্র-যুবকদের মধ্যে এক ধরণের অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নটি বিশেষত ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের কাছে খুবই জরুরী হয়ে উঠেছিল। কারণ জার্মান উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে চরম আমলাতান্ত্রিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্ছিল।

এই আন্দোলন '৬০-এর দশকের শেষদিকে এক বিশাল আকার ধারণ করে। কিন্তু একই সাথে তা বহুধাবিভক্ত হয় এবং ভেঙে পড়তে শুরু করে। কেউ কেউ হয়ে ওঠেন গোঁড়া মার্কসবাদী। অন্যরা নানান ধরণের উদারনৈতিক বামপন্থী বা স্বতস্ফূর্তবাদী অনেক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যান। অল্প কিছু লোক সত্তরের দশকের মধ্যভাগে সন্ত্রাসবাদী হয়ে পড়েন (যেমন বাডের মেইনহফ গোষ্ঠী), কিন্তু অনেকেই রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক রূপগুলিতে আস্থা হারান।

'৭৪ সালের পর থেকেই এই সব মানুষেরা লক্ষ্য করতে শুরু করেন যে পরিবেশ ধ্বংস তথা নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্র গজিয়ে ওঠার বিরোধিতায় এক ধরণের নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ছাত্র বিক্ষোভ থেকে এই নাগরিক আন্দোলন "আদর্শ জার্মানি"র ধারণাকে প্রশ্ন করার উপাদান খুঁজে পায়। এই প্রথম বহু সৎ জার্মান, যাঁদের অনুগত ও বাধ্য হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাঁরা প্রশ্ন করতে শুরু করেন। এই সব প্রশ্ন ছিল বিশাল রাজপথ

তথা আকাশচুম্বী বাড়ী ভিত্তিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে, প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রসঙ্গে বা ক্রমবর্ধিত নদী ও বায়ু দূষণের প্রসঙ্গে। সরকারী পরিকল্পনার ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ সাধারণ নাগরিকদের আর অন্ধকারে রাখতে সফল হচ্ছিল না।

এই সময়ে ইকোলজি ভিত্তিক ধ্যানধারণায় প্রকাশিত সাহিত্যও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এমনটা বলা যায়। এ প্রসঙ্গে ক্লাব অফ রোম প্রকাশিত 'লিমিটস টু গ্রোথ', হার্বার্ট গ্রুহ্ল লিখিত 'আ প্ল্যানেট ইজ প্লাণ্ডারড' বা ইভান ইলিচ লিখিত বিভিন্ন বই তথা প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। সত্তরের দশকের শেষদিকে বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও নাগরিক আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সাথে যৌথ উদ্যোগ শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ওই গোষ্ঠীগুলির মহিলা কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে। বহু ধরণের চিন্তাভাবনা সম্বলিত এই নাগরিক আন্দোলনের একটি বড় শিক্ষা ছিল—সমস্ত ধরণের মতামতকে জায়গা দেওয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা গড়ে তোলা এবং তাদেরকে একই ধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা। এই ধারাটি আজও সবুজ রাজনীতিতে বয়ে চলেছে।

মধ্য সত্তরে আরও একটি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা ছাত্র প্রতিবাদ, নাগরিক আন্দোলন এবং আধ্যাত্মিকতা তথা ব্যক্তিমানস উন্নতিকরণ আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত ছিল। তা হল "বিকল্প গড়ে তোলার" আন্দোলন। বিকল্প সংস্কৃতি-ভিত্তিক জীবনে আগ্রহী মানুষেরা শুরু করেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবস্থা, জৈব কৃষি এবং সামগ্রিকতাবাদী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এরই নানান দিক। সুমাচারের লেখা "স্মল ইজ বিউটিফুল" ও আরও অন্যান্য বই এদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই সমস্ত আন্দোলনকে প্রথমদিকে বিদ্রূপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। "ইউটোপিয়া" শব্দটিকে তার ব্যঙ্গাত্মক অর্থ থেকে বের করে এনে সজীব করে তোলার প্রয়াসে আন্দোলনকারীরা বিরুদ্ধতার মুখে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন "স্বপ্ন দেখার সাহস যদি তুমি না দেখাও, তবে সংগ্রামের জন্য শক্তিও অর্জন করতে পারবে না।"

১৯৭৮ সালের মধ্যেই সবুজ আন্দোলনের সমস্ত উপাদানগুলি দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল। অবশ্য '৭৩ সাল থেকেই একটি ছোট গোষ্ঠী কিছু কিছু সবুজ নীতি, যথা নির্জোট পররাষ্ট্রনীতি বা পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কথা বলছিল। এর নাম ছিল অ্যাকশন কমিটি অফ ইনডিপেণ্ডেন্ট জার্মানস। এর পরে পরেই গড়ে ওঠে আর একটি গোষ্ঠী—গ্রীন অ্যাকশন ফিউচার। '৭৮ সালের নির্বাচনে লোয়ার স্যাক্সনি, রাইন ওয়েষ্টফ্যালিয়া এবং স্লেসউইগ-হলষ্টেইনে এই ধরণের স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি প্রার্থী দেন। কিন্তু প্রতিনিধিত্বর জন্য প্রয়োজনীয় ৫ শতাংশ ভোট তাঁরা পাননি।

এর পর ১৯৭৯ সালের ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলিকে এক জায়গায় আনার জন্য চেষ্টা চালান হয়। এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেয় ইউনিয়ন অফ জার্মান ইকোলজিক্যাল সিটিজেনস্। কিন্তু নির্বাচনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলে দুর্নীতি দেখা দিতে পারে বা স্থিতাবস্থার অঙ্গীভূত হওয়ার ভয় থাকতে পারে এই টেনশনও একই সাথে কাজ করতে শুরু করে।

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কফুর্ট কনভেনশনে পূর্বোক্ত গোষ্ঠীগুলি 'অ্যাকশন থার্ড

ওয়ে' ও 'ফ্রি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামক আরও দুটি গোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে "ফারদার পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন—দ্য গ্রীনস" তৈরী করেন। এই কনভেনশন দুটি বড় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। একটি হল নিউক্লিয়ার কার্যক্রম মুক্ত ইউরোপ, অপরটি হল বিকেন্দ্রিত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক ইউরোপ। এই নির্বাচনেও গ্রীনরা ৩.২ শতাংশ ভোট পান। ফলে নিম্নতম ৫ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় তাঁরা প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান না।

গ্রীন পার্টির সাংবিধানিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে কার্লশ্রুহে নামক স্থানে। এতে ১০০৪ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। এই সভায় সংবিধানকে ঘিরে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয় এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ওই বছরই মার্চ মাসে সারব্রুফেনে প্রতিনিধিরা দ্বিতীয়বার মিলিত হন। এখানে এক নতুন কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয় এবং ফেডারেল কর্মসূচী গৃহীত হয়। জুন মাসের ডটমুণ্ড সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নেন জার্মান জাতীয় পার্লামেন্টের অক্টোবর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁরা মাত্র ১.৫ শতাংশ ভোট পান, যদিও কোন কোন শহর পরিষদে তাঁরা প্রতিনিধিত্বের অধিকার পান। এরকমটা প্রথম ঘটে ব্রেমেনে ১৯৭৯ সালে। এই সময়ের মধ্যেই গ্রীনরা ইকোলজিভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য তাঁদের কর্মসূচীকে আরও সুগ্রথিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ করে তোলেন। '৮২ সালে গ্রীন পার্টির দুই সদস্য লেখেন "গ্রীন টাইমস ঃ পলিটিকস ফর আ ফিউচার ওয়ার্থ লিভিং"। ওই একই বছর নভেম্বর মাসে হ্যাগেনে অনুষ্ঠিত হয় গ্রীন পার্টির বাৎসরিক সম্মেলন। এই অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয় মহিলাদের সমবেত প্রতিবাদের জন্য।

কর্মসূচীর বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করার জন্য যে আলাদা আলাদা উপসমিতি তৈরি করা হয়েছিল তার মহিলা সদস্যরা বলেন যে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। ফলত তাঁদের তৈরী করা কর্মসূচী তাঁরা আলাদা জমা দেন। এই অধিবেশনে অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে সাঙ্ঘাতিক মতপার্থক্য দেখা দেয়, ফলে একটি দুই পাতার প্রস্তাব মাত্র গ্রহণ করা হয়। জানুয়ারী ১৯৮৩-তে সিন্‌ডেলফিনগেনে আয়োজিত অধিবেশনে শেষ অবধি ৩৯ পাতার সম্পূর্ণ ফেডারেল কর্মসূচীটি গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের পরেই গ্রীনরা ৬ মার্চ ১৯৮৩ সালের বুণ্ডেস্ট্যাগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের দিকে মুখ ফেরান। এবং অনেককেই অবাক করে দিয়ে ৫.৬ শতাংশ ভোট সংগ্রহ করে জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেন। এই নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ব্যর্থতা থেকে বোঝা গেল, প্রথাগত বাম রাজনীতি জনচিত্তে আগের মতো আর দাগ কাটছে না। ফলে নাগরিক স্বার্থরক্ষা করার জন্য ভবিষ্যতে গ্রীনরা যে উপযোগী ভূমিকা নিতে পারে এ রকম একটি ধারণা তৈরী হতে শুরু করে।

গ্রীন পার্টির গড়ে ওঠার বছরগুলোয় যে সব ব্যক্তিত্ব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাঁরা এসেছিলেন ডান ও বাম উভয় দিক থেকেই। পেত্রা কেলী, যাঁর নাম সবুজ রাজনীতিতে জড়িয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য ভাবে, তিনি ছিলেন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলে ১৯৭৯ সাল অবধি। হার্বার্ট গ্রুহল এসেছেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক দল থেকে। '৬০-এর দশকের জার্মান ছাত্র যুব আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা রুডি ডয়টস্‌কে (রুডি মারা যান ১৯৮০ সালে) বা পূর্ব জার্মানীর বিক্ষুব্ধ তত্ত্ববিদ রুডল্‌ফ বাহরো তো মার্কসবাদ বা বামপন্থার সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন।

এত বিভিন্ন পথের মানুষের একজায়গায় থাকার প্রশ্নটি স্বভাবতই যথেষ্ট কৌতুহল জাগায়। এ প্রসঙ্গে গ্রীনদের দেওয়া উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক সচেতনতার ছাপ. মানবজীবন তথা প্রকৃতির ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁরা অনুভব করেছেন। এটাই তাঁদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

## তি ন

সবুজ রাজনীতির চিন্তাধারা অনেক মানুষের ভেতরেই বেশ দানা বাঁধছিল, গ্রীন পার্টি গঠন সংক্রান্ত ধ্যানধারণা আসার অনেক আগে থেকেই। যাঁরা পরমাণু চুল্লীর প্রসার, নদীদূষণ, বনের অপমৃত্যু ইত্যাদি প্রশ্নে মধ্য-সত্তর থেকেই সোচ্চার হয়েছিলেন — সেই নাগরিকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, আমরা প্রকৃতিরই অংশবিশেষ — তার উর্দ্ধে নই — এবং আমাদের বাণিজ্যের বিশাল কাঠমো ও আমাদের জীবনপ্রণালী নির্ভর করছে জৈবজগত ও মানুষের মধ্যে বিচক্ষণ তথা শ্রদ্ধাপূর্ণ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তথা ব্যবস্থার মধ্যে ইকোলজিভিত্তিক জ্ঞান, প্রকৃত নিশ্চিত শান্তি, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অর্থনীতি এবং সর্বজনীন অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের (participatory democracy) অনুপস্থিতি দেখিয়ে গ্রীনরা তাঁদের ফেডারেল কর্মসূচি শুরু করেন এই বলে—

> "'বন্'-এর প্রতিষ্ঠিত সমস্ত রাজনৈতিক দলই মনে করে যেন এই পরিমিত বিশ্বে, অপরিমিত শিল্প উৎপাদন সম্ভব। তাদের ঘোষণা অনুযায়ীই, তারা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে পরমাণু রাষ্ট্র না পরমাণু যুদ্ধ— হ্যারিসবার্গ না হিরোসিমা — এই আশাহীন বেছে-নেওয়ার দিকে। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ-ভারসাম্য সঙ্কট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে, রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ফেলা নিয়ে সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছে। বন্যপ্রাণীরা সমস্ত প্রজাতি ধরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। নানান প্রজাতির গাছেরা ক্রমশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। নদী আর মহাসমুদ্র পরিণত হচ্ছে নর্দমায়। আর মানুষেরা এক পরিণত শিল্পনির্ভর এবং পণ্যভিত্তিক সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে আত্মিক তথা বুদ্ধিগত ক্ষয়ের দিকে ঝুঁকছে। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাচ্ছি এক অন্ধকারময় উত্তরাধিকার ....। আমরা প্রতিনিধিত্ব করি এক সামগ্রিক ধারণার যা, একমাত্রিক, অর্থাৎ 'আরো বেশী উৎপাদন'মার্কা রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমাদের কর্মপন্থা এক দূরদর্শী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়, যার ভিত্তি হল চারটি প্রাথমিক নীতি — ইকোলজি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, শিকড় অবধি প্রসারিত গণতন্ত্র (grassroots democracy) এবং অহিংসা।"

### ইকোলজি

গ্রীন রাজনীতিতে, প্রথম নীতি অর্থাৎ ইকোলজির ব্যাখ্যা বহুবিধ এবং যাদের একত্রীকরণে একটা বোধ 'গভীর ইকোলজি'— যা প্রচলিত নতুন চিন্তাধারার এক জগতকে সামনে তুলে ধরে। পরিবেশ সংরক্ষণবাদ-এর স্থিতাবস্থাকে কাটিয়ে এই বোধ নিয়ে এসেছে আরো এক

বিস্তৃত চিন্তাধারার জগৎ। প্রকৃতির নিজের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, মানুষের সাথে তার প্রতিক্রিয়া এবং মানুষের নিজেদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক — এই নিয়ে দুরূহ জালের যে বুনন—তার মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় 'গভীর ইকোলজি'র ধারণা।

আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য—সব ব্যাপারেই 'গভীর ইকলজি'র প্রভাব রয়েছে। পরিবর্তনহীন, কঠিন গঠনের ধারণার বদলে ইকোলজি এনেছে প্রকৃতির এক ক্রমপরিবর্তনশীল গতিময় রূপের ধারণা। আন্তঃসম্পর্কময়তা তথা বহমানতার ধারণা আমাদের চারপাশের ইকোসিস্টেমে ব্যবহার করতে চান গ্রীনরা। তাই তাঁরা শক্তি উৎপাদনের প্রকৃতিনির্ভর ধারা অর্থাৎ সূর্য, হাওয়া বা নদীর স্রোতকে ব্যবহার করতে চান—চান জৈব কীটনাশক বা পুনরুৎপাদনযোগ্য কৃষিব্যবস্থা। সর্বোপরি গ্রীনীরা প্রাকৃতিক সম্পদকে লুণ্ঠন করা, বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের আস্তাকুঁড় করা, জৈব জগৎকে বিষাক্ত করা, তেজস্ক্রিয়তার তথাকথিত নিরাপদ মাত্রা এবং বায়ুদূষণ বন্ধের দাবী জানায়। এই ধারণা আরো দূর অবধি বিস্তৃত হয়ে পরিণত হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের বদলে মানুষে মানুষে সম্পর্কেরএক নতুন আত্মিক বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'সিস্টেম' বা আরো গুছিয়ে বললে 'নেটওয়ার্ক' নামক ধারণাটি গ্রীনদের ইকোলজিভিত্তিক চিন্তাভাবনার মধ্যে একটি বড় জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে, আন্তঃসম্পর্ক তথা আন্তঃনির্ভরশীলতা একটি সিস্টেমের টুকরো টুকরো অংশগুলোর বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হিসেবে দেখানো যায়। যে কোনো সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এই স্বীকৃতি প্রয়োজনীয় যে, তার অংশগুলোর যোগফলই শুধু সামগ্রিকতা নয়— সামগ্রিকতা অখন্ডনীয় এবং এক অংশের ধ্বংসে সমগ্র সিস্টেমই তার বৈশিষ্ট্য হারাবে। তাই একটি দিক প্রধান বা অন্যটি অপ্রধান — কোনো সমস্যাকে এইভাবে বোঝা নয়, ইকোলজি শেখায় সংকটগুলো একে অন্যের সাথে জাড়িয়ে রয়েছে এবং একে বুঝতে হবে সে'ভাবেই। গ্রীনদের প্রচারে সবসময়ই এসে পড়ে ইকোলর্জিভিত্তিক ধ্যানধারণার মূর্ত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে গোটা পশ্চিম জার্মানি জুড়েই অ্যাসিড বৃষ্টি নিরোধে গ্রীনদের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ('ব্ল্যাক ফরেস্ট' অঞ্চলে বন্যসম্পদ ধ্বংস হওয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমের সূত্রে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল), এবং এই প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক সহায়তার দিকটিও তুলে ধরেছিল কারণ অ্যাসিড বৃষ্টি দেশগত সীমানাকে ছাড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশে। এর পাশাপাশি দেশজোড়া রাসায়নিক অস্ত্রভান্ডার গড়ে তোলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন তোলেন গ্রীনরা। ভয়ংকর বিষাক্ত 'ডায়োক্সিন'-এর কয়েক ডজন পিপে উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গ্রীনরাই প্রথম তদন্তের দাবী তোলে। পরিচ্ছন্ন জৈব কৃষির পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিরোধিতা করেন যন্ত্রনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিব্যবস্থার, তার দূষণগত দিকগুলো দেখিয়ে। ইকোলজিভিত্তিক শহর বা ব্যক্তিগত বাসস্থানের পরিকল্পনা থেকে একটি 'মডেল গ্রাম' তৈরীর প্রচেষ্টায় তাঁরা' ৮৩-৮৪ সাল থেকেই কাজ শুরু করেছেন।

### সামাজিক দায়িত্ববোধ

সামাজিক দায়িত্ববোধ বলতে অনেক গ্রীনই মনে করেন যে, এ হল সামাজিক ন্যায়বিচার, ইকোলজিগত চিন্তা চেতনায় পণ্যভিত্তিক সমাজকে বদলানো বা অর্থনীতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে

দরিদ্র তথা খেটে খাওয়া মানুষের কোনোরকম ক্ষতি না হবার প্রতিশ্রুতি । সীমিতভাবে হলেও, এই ধারণাটি বিসমার্কের সময় থেকেই জার্মানিতে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির মোকাবিলায়, কিছু কিছু জনমুখী আইন তৈরী হয়। যেমন সেই সময়ে একটি আইনবলে রেস্তোরাঁ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য কাজের দিন সন্ধে ছ'টায়, শনিবার দুপুর দু'টোয় এবং রবিবার পুরো বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়, যাতে শ্রমিক কর্মচারীরা অবসর সময়ে পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে। সামাজিক দায়িত্ববোধের অন্য এক অর্থ গ্রীনদের মধ্যে একটি অংশ করেন — তা' হল এক ধরণের সমাজতন্ত্রের ধারণা। এই কারণেই গ্রীনপার্টির চরিত্র, আপাত বিরোধী। তবুও একসাথে সংখ্যালঘু ও মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষার লড়াই বা চারলক্ষ বিদেশী শ্রমিকদের নিয়ে সুস্থ চিন্তাভাবনায় তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। বিভিন্ন মতাবলম্বী গ্রীনেরা তাই এক সুরে বলেন, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক এবং ইকোলজিভিত্তিক সমস্যাগুলো গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের জন্য অর্থনীতি আর প্রকৃতির জন্য অর্থনীতি একে অন্যের সাথে খারাপ বা ভালো - দু'দিকেই জুড়ে আছে ।

**শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র** (grassroots democracy)

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের পরিবর্তে গ্রীনরা চান এক সোজাসুজি অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র, যেখানে নিয়ন্ত্রণ তথা ক্ষমতা বেশী বেশী থাকবে সংগঠনের ভিত্তিস্বরূপ স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর হাতে। প্রাথমিক নীতিগুলো যতটা সম্ভব বড় জমায়েতে, ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হবে। স্থায়ী কর্মকর্তার বদলে নির্বাচিত করা হবে কমিটি, যার সদস্যদের পরিবর্তন করা হবে সময়ের সাথে সাথে। নাগরিক আন্দোলনের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করতে গিয়ে গ্রীনরা দেখেছেন যে, অনেক কর্মীই রাজনৈতিক দলে সরাসরি যোগ দিতে চান না। তাই গ্রীনদের ভিত্তিভূমির মধ্যে অসদস্যদের জায়গা আছে। কিছু কিছু স্থানীয় সংগঠন এঁদের দলের সভায় ভোট দেবার অধিকারও দিয়েছে। ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্তরযুক্ত ব্যবস্থার বদলে, নানান পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিকড় ঘেঁষা (grassroots) গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান গ্রীনরা।

গ্রীনদের কাছে শেকড় ঘেঁষা (grassroots) গণতন্ত্রের প্রধানতম অসুবিধাগুলোর মধ্যে একটি হল আবর্তন-নীতির (rotation principle) প্রয়োগ। ক্ষমতাকেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিকতাকে ধ্বংস করার জন্যে, গ্রীনরা চান প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সদস্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণত দু'বছর) আবর্তিত হোক।

আবর্তন-নীতির পক্ষে মতামত—আট বছর, এমনকি চার বছরও কোন ব্যক্তি রাজ্য বা জাতীয় সংসদে কাটাবার পর তাঁদের চিন্তাধারা প্রবলভাবে গোঁড়া ও একমুখী হয়। গ্রীনরা চান না তাঁদের সদস্যরা, প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের মতো তিন দিন আগে বলা কথা, আজকে ভুলে যান। মেয়াদের দীর্ঘতাই তথ্য ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে, যা শিকড় ঘেঁষা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

আবর্তননীতির বিপক্ষে মতামত— গ্রীনরা অধিকাংশ সময়েই নতুন নতুন মৌলিক ভাবনা চিন্তা, সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। রাজনৈতিক মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীনদের জানতেই হবে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরোধীদের কোণঠাসা করার উপায়গুলো,যা সম্ভবপর হবে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার আলোকেই। একজন নতুন সংসদ সদস্যের অন্তত এক বছর লাগে

এইসব কূটনৈতিক ব্যাপার শিখতে এবং দলের দক্ষতা ব্যাহত হয় যদি প্রতি বছরই এই রাজনৈতিক শিক্ষানবিশী চলতেই থাকে। এর ফলে দল হারায় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, প্রভাব এবং সর্বোপরি সুবক্তাও।

গ্রীনদের মধ্যে এই মতবিরোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য, বিতর্ক ও সমঝোতার প্রক্রিয়ায় কিছু ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

## অহিংসা

গ্রীনদের চতুর্থ মৌল নীতি অহিংসা। এ প্রসঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টা হল কাঠামোগত হিংসা (structural violence) এবং ব্যক্তিগত হিংসা—উভয়েরই বিলুপ্তি। রাষ্ট্র তথা প্রতিষ্ঠানগত হিংসার বিরুদ্ধতায় গ্রীনরা ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে দাঁড়ান। তাঁরা স্কুলে শান্তিসংক্রান্ত পাঠক্রম চালু করতে চান, যা শেখাবে দ্বন্দ্বের অহিংসামূলক মীমাংসা। গ্রীনদের মতে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে সৈনিকের যে ছবি গেঁথে দেওয়া হয়, তা' স্বাভাবিক নয় — এ হল এক বিশেষ সংস্কৃতির ফল। নারী শিশু বা সংখ্যালঘুদের উপর দমন-পীড়ন, যা পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সমাজের সহজাত প্রবৃত্তি—গ্রীনরা এর অবসান চান। গ্রীনরা মনে করেন প্রকৃতি আর মানুষের সম্পর্ক হওয়া উচিৎ যথেষ্ট ভারসাম্য এবং শ্রদ্ধামূলক—হিংসাপূর্ণ নয়। পেত্রা কেলী'র মতে ইকোলজিভিত্তিক সমাজে 'হিংসা না থাকা' একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান।

যদিও গ্রীনরা নীতিগতভাবে অহিংসায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তবুও তাঁরা মনে করেন, অহিংসানীতির প্রয়োগ যথেষ্ট সমস্যাসংকুল। রোনাল্ড ভন্ট্-এর মতে — "আমরা এখনো এটার সমাধান করতে পারিনি যে, আমরা কীভাবে নিজেদের অহিংস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করব, যখন নিজেরাই বিভিন্ন সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করব, কারণ রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানগত হিংসার জনক।"

হিংসা বিরোধিতার সবচাইতে বড় ক্ষেত্র হল রাষ্ট্র তথা সমর শিল্পকেন্দ্রিক নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং এই ক্ষেত্রে গ্রীনরা বিশেষভাবে সক্রিয়। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল গের্ট বাস্তিয়ান, যিনি সমরবাদের বিরুদ্ধে শান্তি সংক্রান্ত গ্রীন কর্মসূচী তৈরীর একজন প্রধান স্থপতি, তাঁর মতে—'পরমাণু যুগে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার কোন নৈতিক যুক্তি নেই। মানুষ যা যা ভালবাসে, তা' রক্ষা করার জন্যই সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন — পরমাণু যুগে এই যুক্তি ধোপে টেকে না কারণ পরমাণু যুদ্ধের পর সবই শেষ হয়ে যাবে।'

অহিংসার প্রশ্নটি বোঝা এবং ব্যবহারের প্রশ্নে, গ্রীনদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। হিংসার মধ্যে দিয়ে অহিংস সমাজ তৈরি করা যায় কি না কিংবা অহিংসা ও অস্তিত্ব সমার্থক কিনা ইত্যাদি প্রশ্নেও মত পার্থক্য রয়েছে।

পেত্রা কেলীর মতে, 'অহিংস ক্রিয়াকলাপের মাঝে বিরাট শক্তি লুকিয়ে থাকে। অনেকেই মনে করেন যেন তা অক্ষমতা, বাধ্যতা এবং ভিক্ষাবৃত্তির জন্ম দেয় এবং অহিংসার মাধ্যমে কিছুই পাল্টানো সম্ভব নয়। তাঁদের ধারণা যেন সব কিছুই ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু এই মহাবিশ্বে কিছু জিনিস থেকেই থাকে যার অপব্যবহার হওয়া উচিৎ নয়, এমন কি ব্যবহারও নয়। অহিংসা কখনই আপোসে মীমাংসা শেখায় না।'

জুরগেন্ রীন্টস্, বুন্ডেস্টাগ-এর একজন গ্রীন সদস্যের মতে—'আমি মনে করি না, জঙ্গী প্রতিরোধের মাধ্যমে সমরসজ্জার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি, একমাত্র রাজনৈতিক ভাবেই অর্থাৎ একমাত্র বেশী বেশী করে জনমত সংগঠিত করে যুদ্ধ উন্মাদনা বন্ধ করা যায়। অনেকেই মনে করেন, অহিংসাই পরম ধর্ম কিন্তু আসলে তা এক পবিত্র অধিবিদ্যা, যা মানুষকে আত্মবলির দিকেই ঠেলে দেয়। আমি এই ভেবে শঙ্কিত যে পরিশেষে একজন মানুষ নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকলেও রাজনৈতিকাবে তিনি বিফলই হবেন।'

কিছু মানুষ মনে করেন যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটি গ্রীনদের পঞ্চম নীতি হওয়া উচিত। সমস্ত গ্রীন প্রস্তাবই এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তিগুলির জটিল ক্রিয়াকলাপের উপর মানুষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। গ্রীনরা বলেন, অভেদ্যতা এবং অজ্ঞেয়তার মাঝেই লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন আর্থিক কিংবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, যার ফলে গণতান্ত্রিকতা ধ্বংস হয়। তাই অতি আমলাতান্ত্রিকতা বা ক্ষমতাকাঠামো নাগরিকদের উদ্যোগকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং শিল্পনির্ভর সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়। এর বিরুদ্ধে সরল ও ছোট এলাকা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা অনেক বেশী নাগরিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বদলে সাংস্কৃতিক ও ইকোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যভিত্তিক অঞ্চল তাঁদের কাছে বেশী আকর্ষণীয়। এই ধারণার বাস্তব প্রকাশ অনেক সময়ই জাতীয় সীমানা পার হয়ে যায়। ড্রেইকল্যাণ্ড এলাকার স্থানীয় মানুষ ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানিতে বিভক্ত। কিন্তু পরিবেশ দূষণের মতো বিষয়ে তাঁরা একসাথে কাজ করেন।

বিশেষভাবে গ্রীনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সমাজে, নারী নির্যাতনের বিষয়টি। তাঁদের কর্মসূচী পুরুষ-নারী বিভেদ জনিত অসাম্যমুক্ত। পুরুষ-কর্তৃত্ব কাটিয়ে উঠে, এক বৈষম্যহীন নতুন সমাজ সৃষ্টিতে তাঁরা দায়বদ্ধ। তাঁদের কাজকর্মে নারীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁরা কিছু নীতি গ্রহণ করেছেন, যদিও পুরুষ কর্তৃত্ববাদী সংস্কৃতির টান এ ব্যাপারে নানান অসুবিধার সৃষ্টি করছে। গর্ভপাত সংক্রান্ত আইন বা বিবাহোত্তর ধর্ষণের প্রশ্নে জাতীয় স্তরে বিতর্ক তুলতে গ্রীনরা সক্ষম হয়েছেন। সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও সবুজ রাজনীতিতে মহিলা অংশগ্রহণ অন্যান্য যে কোনো দলের চাইতে বেশী, এবং নারীবাদী ধ্যানধারনা ও ইকোলজির আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করারও চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে পেত্রা কেলীর বক্তব্য ঃ 'আমি গভীরভাবে দুঃখিত হই যখন অনেকে বলেন, ইকোলজির সাথে নারীবাদী ধ্যানধারণা (Feminism) এর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা জানেন না, তাঁরা কী বলছেন। আসলে ইকোলজিই Feminism এবং Feminism-ই ইকোলজি — এটাই কোনো কিছুকে দেখার পবিত্রতম রূপ।'

আরো একটি ব্যাপারে গ্রীনরা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, যা হল আত্মিক ক্ষয় বা আত্মিক দারিদ্র্যের প্রশ্নটি। পণ্যভিত্তিক সংস্কৃতির চাপে মননশীলতার যে ধারাটি মরে যেতে বসেছে তার বিরুদ্ধে স্কুল পাঠক্রম থেকেই এক ধরণের চর্চাকে প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা। রাজনীতির যে নৈতিক ও আর্থিক মাত্রা থাকা উচিত সে ব্যাপারে বহু মানুষই একমত। এ প্রসঙ্গে এরিক ফ্রোম রচিত 'টু হাভ্ অর টু বি' বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যেখানে ভোগ বা সুখসর্বস্ব এক ধরণের মালিকানাভিত্তিক জীবনযাপনের বদলে 'সব কিছুর থেকে আনন্দ পাওয়া'—এইভাবে বাঁচার কথা বলা হয়েছে।

ইকোলজি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিকড় ঘেঁষা গণতন্ত্র, অহিংসা, বিকেন্দ্রীকরণ, পুরুষ কর্তৃত্ববাদের অবসান এবং আত্মিকতা—সবুজ রাজনীতির এই যে সাতটি মৌলনীতি, তা প্রত্যেকেরই একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমস্তকিছুই যা বিমূর্ত এবং মূর্ত, ব্যক্তিগত এবং রাজনীতিগত, অর্থনৈতিক কিম্বা সামাজিক — তা সবই রয়েছে ক্রমপরিবর্তনশীলতার পথে। সবুজ রাজনীতি উত্তরণের কিম্বা পরিবর্তনের একটি পর্যায়— যা থাকবে চিরকালই চলমান পথে— এক স্বপ্নময় ভবিষ্যতের দিকে। এর রূপ ক্রমশ আকার পাচ্ছে—একটি ইকোলজিভিত্তিক সমাজ।

## চা র

এক ইকোলজিভিত্তিক শোষণহীন সমাজে মানুষ কীভাবে বাঁচবে এ প্রসঙ্গে গ্রীনদের ধারনা খুব সুসংহত নয়। ব্যক্তিমানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা স্বাধীন বিকাশের ওপর সবুজ রাজনীতিতে জোর দেওয়া হয়। অন্যদিকে ইকোলজির সূত্র বলে পারস্পরিক পরিকল্পনার কথা। এক নতুন সামাজিক অবস্থানে কিভাবে আমরা নতুন মূল্যবোধে আস্থা স্থাপন করব বা তাকে প্রয়োগ করব? প্রাত্যহিক জীবনে মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি কি হবে সে ভবিষ্যতের দিনগুলিতে? ব্যক্তিসত্ত্বা, পরিবার, গোষ্ঠী, বন্ধু ও সহকর্মী তথা বিশ্ব নাগরিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের আজকের সে বোধ তার কি পরিবর্তন হবে আগামী দিনে? এইসব মৌলিক প্রশ্নগুলির কোন উত্তর এখনও গ্রীনরা পুরোপুরি খুঁজে পাননি। খুব বড় মাপে ইকোলজির ধারণাকে সমাজজীবনে প্রয়োগ করে বিশাল কোন পরিকল্পনার রচনাও তাঁরা করছেন না। আসলে যা ঘটছে তা হল, সামনে যে বিষয়টি এসে পড়ছে তাই নিয়েই তাঁরা চিন্তা করছেন এবং বিকল্প খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। নানান বিষয়ের মধ্যে যে যে দিকে তাঁরা সৃজনশীলতার সাক্ষর রাখছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহিলাদের অধিকার, প্রযুক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যর মত বিষয়গুলি। পাশাপাশি, সংখ্যালঘুদের অধিকার বা সংস্কৃতি এবং সংবাদ মাধ্যমের মত বিষয়েও গ্রীনরা সোচ্চার।

### মহিলাদের অধিকার

আর পাঁচটা দেশের মতই পশ্চিম জার্মানিতে নিপীড়িতদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোষ্ঠী হিসাবে নারীরা হল সংখ্যায় সর্বাধিক। এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত জার্মান পার্লামেন্টের গ্রীন সদস্যদের কমিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'নারী ও সমাজ।' সবুজ কর্মসূচীর লক্ষ্য হল শিক্ষা, টাকা রোজগার বা রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই মহিলারা যে কাঠামোগত ও ব্যবহারগত বাধার মুখোমুখি হন তাকে সামনে তুলে আনা। এক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে গর্ভপাতকে প্রায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কেবলমাত্র ধর্ষণ বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির ক্ষেত্র ছাড়া। সব ক্ষেত্রেই প্রথম তিনমাসের পর গর্ভপাতকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

এই আইনের প্রসঙ্গে গ্রীন পার্টির মহিলা সদস্যদের মধ্যেও মতামতের ফারাক ছিল।

১৯৮০ সালের সারব্রুকেন সম্মেলনে এই প্রশ্নে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়। নারীবাদীরা বলেন যে প্রত্যেক মহিলারই তার নিজের শরীরের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। অন্যদিকে রক্ষণশীলরা বলেন যে গর্ভপাতও হত্যা, ঠিক যেমন তেজস্ক্রিয়তা বা বিষাক্ত রায়াসনিকে হত্যা, তেমনিই। এ প্রসঙ্গে পেত্রা কেলী বলেছেন "আমি এবং অন্যরা দু পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য প্রয়াস নিই, যদিও অধিকাংশরাই এ ব্যাপারে একমত হন যে যতদিন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ইকোলজিভিত্তিক কোন গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন গর্ভপাতকে বাদ দেওয়া যাবে না; যতদিন এই কুৎসিত আইন অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ২১৮ আমাদের উপর চাপান রয়েছে—যা বলে যে কোন মহিলা যদি গর্ভপাত করায় তবে সে খুনী অথচ যে পুরুষটি সন্তান জন্মের জন্য সমানভাবে দায়ী তার কথা কিছুই বলে না—ততদিন গর্ভপাতকে সমর্থন করতে হবে, এবং সর্বোপরি যতদিন প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রত্যেক বছর ভুখা থাকছে (যাদের অধিকাংশই শিশু) ততদিন গর্ভপাত থাকবে। গ্রীনরা মনে করেন যে, যেহেতু গর্ভপাত একটি বিপজ্জনক প্রক্রিয়া তাই তা করতে হবে উচ্চমানের চিকিৎসাভিত্তিক পরিবেশে এবং সরকারী স্বাস্থ্য বীমার আওতায়। গর্ভপাত, নিশ্চিতভাবেই গরীবের সমস্যা।'

অনুচ্ছেদ ২১৮ বাতিলের দাবী, পুরুষ-নারী উভয়ের সমান দায়িত্বের দাবী, এবং নিরাপদ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির দাবী জানিয়ে গ্রীন পার্টি যে অবস্থান নেয় তা ব্যাখ্যা করে ১৯৮৩ সালের পাঁচই মে জার্মান পার্লামেন্টে দশ মিনিটের জন্য বক্তৃতা দেন এক স্কুল শিক্ষিকা ওয়ালট্রাউড স্কোপে। এই বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে জার্মান পার্লামেন্টে ও সংবাদপত্র জগতে ঝড় বয়ে যায়। সামনে বেরিয়ে আসে ব্যঙ্গ, তাচ্ছিল্য আর হিংস্রতায় ভরা নারী-বিরোধী এক মানসিকতা, যার প্রথম প্রকাশ ঘটে পার্লামেন্ট সদস্যদের আচরণেই এবং বক্তৃতা চলাকালীনই। এই ঘটনা প্রমাণ করে জার্মান সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত গ্রীনদের ধারণার যথার্থতা। আর তাই সন্তান সহ মায়ের সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিও আরও নানান বিষয়ের মধ্যে গ্রীনরা তুলে ধরেছেন পাশাপাশি।

### প্রযুক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

প্রযুক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গ্রীনদের সমর্থন ব্যাপক। কিন্তু বাস্তবিক কিভাবে তা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ নয়। যে ঘটনাগুলি এ প্রসঙ্গে আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল কেন্দ্রীভূত কম্পিউটার তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের গোপনীয়তা নষ্ট করা, কাজের জায়গায় অটোমেশনের ফলাফল, ঔষধ কোম্পানী তথা কীটনাশক কোম্পানীগুলির নিত্য নতুন রাসায়নিক পদার্থ বাজারে নিয়ে আসা, নিউক্লিয়ার শক্তি আর বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থের বিপদ, আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানান পদ্ধতিতে তৈরী জৈব পদার্থগুলির জীবমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাব্য ভয়।

১৯৮৩ সালের বসন্তকালে নাগরিকদের এক আন্দোলন গড়ে ওঠে জাতীয় আদমশুমারীর এক প্রস্তাবকে ঘিরে। লোকের আশঙ্কা ছিল সমস্ত তথ্যকে একত্রিত করে এক বিশাল কম্পিউটার ফাইল তৈরি করা হবে, হয় অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট কার্লশ্রুয়েতে অবস্থিত জাতীয় পুলিশ তথ্য কেন্দ্রে (data-bank) বা হয়ত ওইরকম জাতেরই অন্য কোন জায়গায়। গ্রীনরা জার্মান

পার্লামেন্টে নাগরিকদের এই প্রতিবাদকে নিয়ে যান, পাশাপাশি ফেডারেল আদালতে এ বাবদ এক মামলা রুজু করেন। পরিণতিতে আদমশুমারীর ওই প্রস্তাব উঠিয়ে নেওয়া হয়, নাগরিকদের জন্য কম্পিউটারাইজড্ সরকারী পরিচয়পত্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইতেও যোগ দেন গ্রীনরা।

জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিষয়টি আজকের পৃথিবীতে একটি জরুরী ও জটিল আকার ধারণ করছে। নতুন নতুন জৈব প্রযুক্তির পিছনে রয়েছে বড় বড় ঔষধ এবং রাসায়নিক শিল্প সংস্থাগুলি। এদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ তৈরী করা, যা একবারই ব্যবহার করা যাবে। ফলে প্রত্যেক বছরই তা কেন্দ্রীভূত সংস্থার থেকে কিনতে হবে। শুধু ১৯৮৩ সালেই পশ্চিম জার্মানীর সরকার জৈব প্রযুক্তি (biotechnology) সংক্রান্ত গবেষণায় চার কোটি ডলার দিয়েছে। পাশাপাশি কর্পোরেট সংস্থাগুলিও খরচ করেছে বেশ কয়েক কোটি ডলার। এইসব গবেষণার ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন জৈব পদার্থ আমাদের বাতাবরণে চলে আসতে বাধ্য, কারণ গবেষণাগারের গণ্ডী পার হয়ে নতুন পণ্য রূপে বাজারজাত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এরা। খাবাবের ব্যবসায়, ওষুধের ব্যবসায় বা আরও নানান ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিতে, এই সব পরির্তিত জৈব পদার্থের অজানা প্রভাব সম্পর্কে গ্রীনরা শঙ্কিত। এরিকা হিকেল, গ্রীন পার্টির পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালে জার্মান পার্লামেন্টের শরতকালীন অধিবেশনে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করে এ প্রসঙ্গে একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন (অন্য অনেক সবুজ প্রস্তাবের মতই এটিও জার্মান পার্লামেন্ট অগ্রাহ্য করে)। প্রযুক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী হিকেলের বক্তব্য হল "দুটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি হল একটি শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম যা এখন মানুষের চেতনাকে পব্বিবর্তিত করবে এবং তাঁদের বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন করবে। এরপর, যে সব কম্যুনিটিতে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ব্যাপারটি সরাসরি এসে পড়ে সে সব জায়গায় একটি করে গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত কমিটি তৈরী করতে হবে। এই কমিটিতে থাকবেন যে সব লোকেরা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর জগতে কাজ করেন অথচ এ পথে অগ্রসর হবার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত এমন মানুষেরা, ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে এমন এলাকার বসবাসকারীরা এবং ইকোজলিভিত্তিক শিক্ষা তথা কাজকর্মে আগ্রহী ব্যক্তিরা।

.....এরপর আমরা একটি রাজনৈতিক কর্মসূচী গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে পারি এবং সর্বসাধারণের আলোচনার জন্য একে একটি বিষয় হিসাবে হাজির করতে পারি। আমরা একে থামাতে পারব না, কারণ এর পিছনে রয়েছে বিশাল কর্পোরেট স্বার্থ। কিন্তু আমরা একে সরকারী জগতের মধ্যে আলোচনার খোলা মাঠে টেনে আনতে পারি।

এ প্রসঙ্গে গ্রীনদের অসম্পূর্ণতা তথা ব্যবহারিক জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকল্প ধারণার অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীমতী হিকেল আরও বলেন, "সমস্যা এই যে, যেমন জার্মানিতে তেমনই আমেরিকায়, আমাদের ধারণা হল যে বিজ্ঞান হল মূল্যবোধ-মুক্ত, কিন্তু নারী হিসাবে এবং বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক হিসেবেও আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে বিজ্ঞান মূল্যবোধ-মুক্ত নয়......।"

শিল্পভিত্তিক দুনিয়া জুড়েই এক বহু প্রচলিত ধারণা আছে যে বিজ্ঞান ভিতর থেকেই মূল্যবোধ-মুক্ত। এই ধারণা চোট খায় যখন হাইজেনবার্গ দেখান যে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির মধ্যে

যে ছবি খুঁজে বার করেন তা তাঁদের মানসিক গঠনের ছবির (pattern) সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। গবেষণার যে ফলাফল বিজ্ঞানীরা পান এবং প্রযুক্তিগত ব্যবহারের জন্য যে সব অনুসন্ধান তাঁরা চালান, তা তাঁদের মনের গণ্ডীর শর্তাধীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা চিন্তা ও মূল্যবোধ তাঁরা কি করতে চান এই ব্যাপারটাকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করে। খুব ছোট ছোট অংশে যদিও এক ধরণের নিরপেক্ষতা বজায় থাকা সম্ভব কিন্তু গবেষণার সামগ্রিক চেহারায় মূল্যবোধের ব্যাপারটি এসেই পড়ে। তাই বুদ্ধিগত দায়িত্বের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্বের প্রশ্নটিও এ প্রসঙ্গে জরুরী।

পুঁজির চাপের পাশাপাশি, প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ধারণার মধ্যে পুরুষকর্তৃত্ববাদের সংস্কৃতি দেখতে পান গ্রীনরা। আধিপত্যবাদী চিন্তার সাথে সাথেই আসে প্রযুক্তিভিত্তিক অহমিকাবোধ। 'সব কিছুই করে ফেলা যায়, যদি বোঝা যায় কি ভাবে ঘটছে', এই ধরণের ধারণা আজকের জগতে বিজ্ঞানকে প্রায় এক মতাদর্শ করে তুলেছে, এমন ধারণা গ্রীনদের মধ্যে তৈরী হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের জগতে ইকোলজিভিত্তিক আধুনিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে, কিন্তু যে সব বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে আগ্রহী তাঁরা হলেন সংখ্যালঘু। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাই যান্ত্রিকতাবাদী রিডাক্শনিষ্ট ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত। উচ্চ প্রযুক্তির জগত আজ ভরে গেছে ইকোলজি বিরোধী, অমানবিক এবং অস্বাস্থ্যাকর উৎপাদনে। গ্রীনদের দাবী, একে বদলাতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে আন্তঃসম্পর্ক-যুক্ত নতুন নতুন প্রযুক্তির, যা নতুন মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। আর এখানেই এসে যায় 'ইউটোপিয়া'র প্রশ্নটি। গ্রীনরা আশা রাখেন, ইকোলজিবাদী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়াররা গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দেবেন যাতে তা বৃহৎ কর্পোরেট স্বার্থের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এমন এক বিজ্ঞান আসবে, যা মানবসমাজ ও প্রকৃতিকে সাহায্য করবে, এই তাঁদের চেষ্টা।

**শিক্ষা প্রসঙ্গ**

সবুজ রাজনীতিতে এমন সব পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয় যা শিক্ষাজগতে ছাত্রছাত্রীদের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। শিক্ষাগত মানের অবনতি না ঘটিয়ে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই কি ভাবে অনেক বেশী মানবিক করা যায়— যার ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত—গ্রীনরা এ ব্যাপারে আগ্রহী।

গ্রীনদের ফেডারেল কর্মসূচী বলে—আজকের দিনে শিক্ষা একটি শিশুকে দেয় বেশী নম্বরের জন্য অত্যধিক চাপ, প্রতিযোগিতা প্রহসনের ইঁদুর-দৌড়, মেরুদণ্ডহীনদের জন্য পুরস্কার, আতঙ্ক থেকে আত্মহত্যা, ক্লাস ঘরে উপচে পড়া ভিড়, এবং শিক্ষক অপ্রতুলতার কারণে প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাব। আজকের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একজন মানুষকে শুধু আদর্শ নাগরিক কিম্বা আদর্শ টেকনোক্র্যাট হিসেবে গড়ে ওঠার যে শিক্ষা দেয় তাকে পুনর্গঠিত ও অনেক বেশী বিস্তৃত করতে হবে, যাতে মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। মানুষকে নিশ্চিতভাবে আত্মিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে অনেক বেশী সৃষ্টিশীলভাবে—যেগুলি একজন মানুষের মানুষ হিসাবে অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করবে। সাথে সাথে অবশ্যই শিক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে তৈরী করতে হবে ইকোলজি

সম্বন্ধে গভীর বোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবহার। গড়ে তুলতে হবে সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধ।

গ্রীনরা ছোট ছোট স্থানীয় স্কুল গঠনের পক্ষে— যে স্কুলগুলি পরিচালিত হবে শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের যৌথ প্রয়াসে। তাঁরা মনে করেন এই ধরণের ছোট ছোট স্কুলগুলিতে উপর থেকে কোনও একনায়কতান্ত্রিক চাপ থাকে না ফলে বিভিন্ন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা একসাথে থেকে কাজ করতে পারে, স্ব-নির্দেশিত পথে নিজেদের স্ব-নির্ভর ভাবে গড়ে তুলতে পারে।

গ্রীনরা মনে করেন সামগ্রিকতাবাদী (holisitic) দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষার বিষয়বস্তু ঠিক করতে হবে। "শিক্ষা ব্যবস্থার উচিত একটি আন্তঃ সম্পর্কযুক্ত সুসংবদ্ধ ভাবনাচিন্তার পদ্ধতিকে অনুপ্রাণিত করা যাতে ছাত্র ছাত্রীরা সহজে সমাজের আন্তঃসম্পর্কময়তা তথা ইকোলজিচক্রের প্রকৃতিকে বুঝতে পারে।" সমস্ত বিরোধের মাঝেই যে লুকিয়ে থাকে স্বার্থ—এই বোধকে সবার মাঝে জাগিয়ে তোলার কাজ স্কুল থেকেই শুরু করা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। শিশুদের অবশ্যই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার শিক্ষা দিতে হবে। গ্রীনরা চান 'শিক্ষা পাওয়া', 'বসবাস করা' আর 'কাজ করা' নানান প্রকল্পের মধ্য দিয়ে চলে আসুক খুব কাছাকাছি, হয়ে উঠুক অখণ্ড। আর এসবের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠুক আত্মবিশ্বাস, আর এক কর্মপদ্ধতি। তাঁরা মনে করেন সঙ্গীত, নাটক, ছবি আঁকা, কর্মশিক্ষা এবং খেলাধূলা অবশ্যই স্কুল শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হোক। গ্রীনরা চান যে কম্পিউটার শিক্ষা সমস্ত শিশুদেরই দেওয়া হোক যাতে আলাদা করে কিছু লোক এব্যাপারে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে গড়ে না ওঠে।

গ্রীনরা মনে করেন শান্তি সংক্রান্ত শিক্ষাক্রম অবশ্যই স্কুলে পড়ান উচিত। অন্যদের মতো তাঁরা মনে করেন না যে হিংস্রতা এবং যুদ্ধ একেবারে নিশ্চিত এবং তাঁরা চান যে ছাত্র-ছাত্রীরা এটা জানুক যে বিকল্পও সম্ভব। তাই তাঁরা বলেন "যদি আমরা আমাদের শিশুদের শান্তি কি তা বুঝিয়ে না বলি, তাহলে পরে তারা অন্যদেরকে যুদ্ধ কি, তা বুঝিয়ে ছাড়বে।"

### প্রসঙ্গ জনস্বাস্থ্য

যেহেতু একটি নতুন ধরণের জনস্বাস্থ্য আন্দোলন মানবপ্রকৃতি, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং আমাদের চারপাশের ইকোসিস্টেমে মানুষের গভীরভাবে জড়িত অবস্থা, এ সবকে আমাদের নতুন ভাবে বুঝতে শুরু করায়, তাই অবাক না হওয়ারই কথা এটা দেখে যে গ্রীনদের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ফেডারেল কর্মসূচী শুরু হচ্ছে 'ইকোলজিভিত্তিক ওষুধের' কথা দিয়ে।

ইকোলজিভিত্তিক চিকিৎসা অবশ্যই একটি সামগ্রিকতা-ভিত্তিক চিকিৎসা। একজন অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে হবে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি গভীর নজর রেখে। রোগীর আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম সংকল্পকে জোরদার করতে হবে এবং রোগীর সেবার কেন্দ্রীয় জায়গাই হবে এটা। ইকোলজিভিত্তিক চিকিৎসা মানুষকে দৈহিকভাবেই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেবে। চিকিৎসাকে শুধুমাত্র একটি অঙ্গে সীমাবদ্ধ করা চলবে না, যে রকমটা করা হয় চলতি চিকিৎসায়। নিশ্চিতভাবেই রোগীকে ওষুধশিল্পের গিনিপিগ বানান ঠিক নয় যেমনটা ঠিক নয় অতি মহার্ঘ্য যন্ত্রপাতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে

তাকে দেখা। তাই ইকোলজিভিত্তিক চিকিৎসা, অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়া, অপ্রয়োজনীয় শরীর কাটাছেঁড়া করা এবং বিশাল বিশাল অতিপ্রযুক্তি ভিত্তিক ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে.....।

জনবসতির খুব কাছাকাছি ছোট ছোট হাসপাতাল তৈরী করা উচিত এবং সাথে সাথে যথেষ্ট সংখ্যায় জনস্বাস্থ্য-কেন্দ্রও থাকবে।..... এখানে চিকিৎসা করার সময় অসুখের সামাজিক ও মানসিক দিকগুলির সাথেও মোকাবিলা করতে হবে। জাগিয়ে তুলতে হবে এমন এক রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক যা আর বয়ে নিয়ে চলবে না রোগীর অজ্ঞতা আর অন্ধ নির্ভরশীলতার চলমান ছবি। ....পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে বিকল্প স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকল্প যা খুঁজে দেখবে স্বাভাবিকভাবে রোগমুক্তির নানান পদ্ধতি আর গড়ে তুলবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের পদ্ধতি।

সবুজ রাজনীতি বলে "যে শক্তি আমাদের স্বাস্থ্য আর আমাদের পরিবেশের স্বাস্থ্য ধ্বংস করছে তা হল সেই একই শক্তি যা আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে।" আসলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার বড় সমস্যাগুলির পিছনে আছে আরও নানান কারণের সাথে সাথে আমাদের কাজ, আমাদের অবসর, সাধারণ ভাবে জীবনের সাথে স্বাস্থ্য সমস্যার কৃত্রিম বিচ্ছিন্নকরণ। তাই গ্রীনরা কীটনাশক, রাসায়নিক পদার্থ পার্শ্বপ্রভাব-সম্পন্ন ওষুধ এসব বিক্রির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চান। তামাক অ্যালকোহল আর ওষুধের বিজ্ঞাপন বন্ধ করার পক্ষে তাঁরা। সবশেষে তাঁরা বলতে চান যে মানুষের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না কর্মক্ষেত্রে তার উপর চাপ কমান হচ্ছে। বিশেষ করে সেইসব প্রযুক্তি, নির্ভরতার ক্ষেত্রে যা মানুষের কথা মনেও রাখে না।

গ্রীনদের সামাজিক সর্মসূচী নানান ধরণের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি দাবী করে। বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, শিশু, কিশোর, সমকামী, বিদেশী শ্রমিক ও জিপসী, প্রত্যেকেরই জায়গা আছে তাঁদের চিন্তায়। বৃদ্ধদের জন্য সবুজ প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে এমন সব আইনগত, সংস্থানগত ও সমাজগত রক্ষাকবচ যা নানান বয়সের লোকের সাথে তাঁদের যৌথ বসবাসকে সুনিশ্চিত করবে। ঘরে গিয়ে সেবা করে আসা নার্সিং প্রকল্প, এবং ট্যাক্সবিহীন ন্যূনতম মাসিক অর্থের যোগানের মত পরিকল্পনার কথা তাঁরা সামনে নিয়ে এসেছেন বৃদ্ধদের জন্য। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের যৌথ বসবাসে আগ্রহী গ্রীনরা। আগ্রহী তাঁদের জন্য উন্নত শিক্ষা তথা চাকরীর সুবিধা সৃষ্টি করায়। সবুজ রাজনীতি বলে যে আজকের শিল্প নির্ভর সমাজে শিশু এবং নবীন যুবক-যুবতীদের জায়গা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। শিশুদের উপর হিংস্রতার প্রয়োগ অবসানে কঠিন আইন চান তাঁরা। পাশাপাশি বিরোধিতা করেন সেই সব দমনমূলক আইনের যা সদ্য যুবক-যুবতীদের কোমলতা, উষ্ণতা তথা নিজেদের মত করে বড় হয়ে ওঠাকে বাধা দেয়। সমকামীদের প্রতি যে সামাজিক এবং আইনগত বিরুদ্ধতা আছে জার্মানিতে, গ্রীনরা তার অবসান চান। তাঁরা মনে করেন, পশ্চিম জার্মানিতে যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিদেশী শ্রমিক আছেন, জার্মান অর্থনীতিতে বিস্ময়কর উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমেরও ভূমিকা আছে। তাই তাঁদেরও "জার্মানের মতই সমান" ও প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা উচিত। যে সব বিদেশী জার্মানির উন্নতির জন্য শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারও দিতে চান তাঁরা।

সংস্কৃতির প্রশ্নে গ্রীনরা সংস্কৃতিকে ফ্যাক্টরী ব্যবস্থার ধাঁচে গড়ে তোলার বিরোধিতা করেন।

কারণ "তা সাংস্কৃতিক ভাবে সৃজনশীল ব্যক্তি ও যাঁদের কাছে সৃজনশীল অভিব্যক্তি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট করে দেয়, পরিবর্তে বাড়িয়ে তোলে 'সাংস্কৃতিক পণ্য হিসেবে ভোগ করা।' তাঁরা মনে করেন, এই ব্যবস্থা মেনে নেয় এক সাংস্কৃতিক অনুন্নতি, যার ভিত্তি হল কাজের জায়গায় প্রচুর খাটুনি আর শিক্ষার অভাব। এই ব্যবস্থাই মানুষকে অসাড় (passive) শ্রোতায় পরিণত করে, উৎসাহ দেয় 'সংস্কৃতির বাজার' গড়ে তোলায়, আর গড়ে তোলে 'স্টার' পূজা। এসবের বিপক্ষে সবুজ রাজনীতি চায় একেবারে সাধারণ মানুষদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন— নাটকে, নাচে, গানে বাজনায়, ছবি আঁকা বা সাহিত্যে। তাঁরা আরও চান যে ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাগুলি—যেমন, মিউজিয়াম, কনসার্ট হল বা লাইব্রেরী—জনসমষ্টির চাহিদা ও দৈনিক সমস্যাগুলির ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দিক। শহরতলী বা গ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া হোক সব ধরণের প্রদর্শনীগুলিকে। সংবাদ মাধ্যমের জগতে গ্রীনরা বড় পত্রিকাগুলির ছোট ছোট স্বাধীন উদ্যোগগুলিকে গিলে খাওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং দাবী করেন সংগ্রামরত ছোট পত্রিকাগুলির রক্ষাকবচের জন্য। স্বাধীন দূরদর্শন ও বেতারের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁরা কমার্শিয়াল সিরিয়াল তুলে দেওয়ার কথা বলেন।

উপরে আলোচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে গ্রীনেদের অনুভূতির আর একটি মাত্রা হল এদের আন্তঃসম্পর্কময়তা। এক গ্রীন মহিলা স্যানন মারেন গ্রীসেবাখের কথায় এ ধারণা চমৎকার প্রতিফলিত হয়। কথা বলতে বলতে তিনি একসময়ে বলে ওঠেন "আমার কাছে সামাজিক ক্ষেত্রগুলি একেবারেই আলাদা নয়। সমালোচকরা কখনও কখনও প্রশ্ন করেন, গ্রীনদের মধ্যে আপনি কোথায় আছেন? আপনি কি সামাজিক আন্দোলনে আছেন না ইকোলজি-ভিত্তিক আন্দোলনে? আমার কাছে এ প্রশ্ন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, কারণ এই প্রশ্নের ভিত্তি হল ক্ষেত্র ভাগ করে নেওয়ার ধারণা। যা আমি কখনও আলাদা করে ভাগ করতে পারি না।.....ইকোলজিও হল এমন এক ধারণা যাকে সামাজিক প্রশ্নে নিয়ে যেতে হয়। আর এটাই আমরা বরাবর করে আসছি।"

# হেইনরিশ ব্যোল-এর দুটি গল্প

রুশ বিপ্লব ঘটে ১৯১৭ সালে। আর ওই বছরেই জন্মান হেইনরীশ ব্যোল কলোন শহরে। তাঁর পিতা ছিলেন এক ভাস্কর। ব্যোলের কর্মজীবন শুরু হয় এক বইয়ের দোকানে, কিন্তু অচিরেই তাঁকে যোগ দিতে হয় জার্মান সেনাদলের পদাতিক বাহিনীতে। ১৯৪৫ সালের পর যুদ্ধশেষে তিনি ঘরে ফেরেন আরও বহু সাধারণ জার্মান সৈন্যের মতই শূন্যতা, অপরাধবোধ আর অবলম্বনহীনতা নিয়ে। নানারকম কাজকর্মের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দশকেই তিনি হয়ে ওঠেন লেখক। উপন্যাস, ছোটগল্প আর রেডিওর জন্য নাটক লিখতে থাকেন পর পর। তাঁর একেবারের প্রথম দিকে লেখা উপন্যাস 'ট্রেন সময়ে চলছিল' বা 'এবং কোথায় ছিলে তুমি, অ্যাডাম'-এর বিষয়বস্তু ছিল সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত মানুষদের হতাশা এবং যন্ত্রণা। অবশ্য তাঁর পরবর্তীকালে লেখা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যের পিছনে লুকিয়ে থাকা অন্তঃসারশূন্যতা, যেমন 'অরক্ষিত বাড়িটি'তে। ছোট গল্প লেখায়, যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানিতে তিনি নতুন ধারা নিয়ে আসেন। শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এই লেখক আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের সভাপতি হয়েছেন, সলঝোনিৎসিন সমেত অন্য বিতর্কিত লেখকদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। হেইনরীশ ব্যোল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৭২ সালে। '১৯৪৭ থেকে ১৯৫১' শীর্ষক তাঁর এক রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায় ১৯৬৪ সালে। এখানে প্রকাশিত দু'টি গল্পই মূল রচনার লীলা ভেনেউইজ্ কৃত ইংরাজী অনুবাদ থেকে ফের বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। গল্পগুলি প্রথম জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে।

## বাচ্চারাও বেসামরিক ব্যক্তি

'না, তুমি পার না,' রূক্ষভঙ্গিতে বলল প্রহরীটি।

'কেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কারণ এটা বেআইনী কাজ হবে।'

'কেন এটা বেআইনী কাজ হবে?'

'কারণ এটা তাইই বন্ধু, অর্থাৎ রোগীদের বাইরে বেরোতে দেওয়ার হুকুম নেই।'

'কিন্তু আমি তো আহতদের একজন' আমি গর্ব করে বললাম।

প্রহরী আমার দিকে তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টিতে তাকাল, 'আমার ধারণা যে এই প্রথমবার তুমি আহত হলে নয়তো তুমি জানতে যে আহতরাও রোগীদের তালিকায় পড়ে। চল, পিছনে হট।'

তবুও আমি লেগে রইলাম। বললাম, 'একটু দয়া কর, আমি শুধু ওই বাচ্চা মেয়েটার থেকে কেক কিনতে চাই।'

একটা মিষ্টি ছোট্ট রাশিয়ান মেয়ে কেক বেচতে এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরেটায়। ঘুরে ঘুরে ঝরে পড়ছিল তুষার তার ওপর। আমি সেইদিকে দেখালাম। 'পিছনে হট, আমি বলছি না!' স্কুলের কালো হয়ে যাওয়া আঙিনাটায় বড় বড় ডোবাগুলোর মধ্যে নরম ভাবে ঝরে পড়ছিল তুষার, ছোট্ট মেয়েটা

দাঁড়িয়েছিল শান্ত ভাবে, মাঝে মাঝে ডেকে উঠছিল 'খেক্স্ ....খেক্স্....'

'হা ভগবান' আমি প্রহরীটিকে বললাম, 'আমার জিভে জল এসে যাচ্ছে, তুমি বাচ্চাটাকে একটু ভেতরে আসতে দিচ্ছ না কেন?'

'বেসামরিক ব্যক্তিদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ।'

'করুণাময় ঈশ্বর, এই কি মানুষ' আমি বললাম, 'একটা বাচ্চা তো একটা বাচ্চাই।' সে আমার দিকে আবার তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি হানল, 'আমি ধরে নেব যে বাচ্চারা বেসামরিক ব্যক্তির মধ্যে পড়ে না। হ্যাঁ?'

অসহ্য হয়ে উঠছিল, জনশূন্য অন্ধকার পথটা গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারে ঢাকা, আর তার মধ্যে একটি শিশু দাঁড়িয়ে, একাকী, মাঝে মাঝে তার ডাক "খেক্স্....", যদিও কেউই যাওয়া আসা করছিল না।

যাই হোক না কেন আমি বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম, কিন্তু প্রহরী আমার শার্টের হাতাটা আঁকড়ে ধরে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল 'পিছনে হট, নয়ত আমি সার্জেন্টকে ডাকব।'

'নির্বোধ কোথাকার!' তীক্ষ্ণভাবে উত্তর দিলাম আমি।

'তা ঠিক' সন্তোষের সাথে বলল প্রহরী। 'যে কোন লোক যার এখনও কর্তব্যবোধ টিকে আছে তাকে তোমাদের মতো লোকেরা নির্বোধ ছাড়া আর কি ভাববে?'

আরও আধ মিনিট আমি ঘুরে ঘুরে ঝরে পড়া তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম, শ্বেতশুভ্র বরফের টুকরোগুলো আস্তে আস্তে কাদায় পরিণত হচ্ছিল ; স্কুলের গোটা আঙ্গিনা জুড়েই জলভর্তি গর্ত আর তার মধ্যে মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট সাদা দ্বীপ যেন কেকের উপরে ছড়ানর জন্য তৈরি চিনির আস্তরণ। হঠাৎই চোখে পড়ল যে ছোট্ট মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে চোখে টিপল আর উদাসীনভাবে রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল। দেওয়ালের এপার ধরে আমিও তার পিছু পিছু চললাম।

'দূর হোক সব', চিন্তাটা মাথায় এল, 'আমি কি সত্যিই রোগী?' আর তখনই নজর করলাম যে পেচ্ছাবখানার পাশে একটা গর্ত, আর গর্তটার ঠিক ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেক সমেত বাচ্চা মেয়েটি। প্রহরী আমাদের এখানে দেখতে পাবে না। ফ্যারারের অসীম করুণা ঝরে পড়ুক তোমার কর্তব্যবোধের ওপর, মনে মনে বললুম আমি।

কি অপূর্ব দেখাচ্ছিল কেকগুলো : ম্যাকারুন আর ক্রিম স্লাইশ, বাটারমিল্ক টুইস্ট আর নাট্ স্কোয়ার তেল—চকচকে। 'কত করে?' আমি বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

মেয়েটা একটু হাসল, ঝুড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আড়াই মার্ক করে এক একটা' ওর গলা বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ।

'সব এক দাম?'

'হ্যাঁ, সে মাথা নাড়ল।

তার পাতলা ব্লন্ড্ চুলের ওপর তুষার পড়ছিল, রূপোলি গুঁড়োয় মাখামাখি করে দিচ্ছিল তাকে। কি চমৎকার মোহময়ী তার হাসি। পিছনের পথ ছিল বিষণ্ন, নির্জন, মনে হচ্ছিল পৃথিবী যেন মৃত ....

আমি একটা বাটার মিল্ক টুইস্ট তুলে কামড় বসালাম, সুস্বাদু। *মার্জিপ্যান** দেওয়া রয়েছে। 'আঃ' আমি ভাবলাম 'তাই এত দাম।'

বাচ্চা মেয়েটা একটু একটু হাসছিল। 'ভাল খেতে?' সে জিজ্ঞাসা করল। 'ভাল।' আমি মাথা নাড়ালাম। ঠাণ্ডা নিয়ে মাথা ঘামাব না, মাথায় পুরু করে বাঁধা ব্যান্ডেজটায় আমায় খুব রোমান্টিক দেখাচ্ছিল। একটা ক্রিম স্লাইশ তুললাম, আস্তে আস্তে মিষ্টি জিনিসটা মুখের মধ্যে গলছিল। আর আবার আমার জিভে জল এল......।

'এই শোন', আমি ফিসফিস করে বললাম, 'আমি সবগুলোই নেব, কতগুলো আছে?'

তার নোংরামতো সরু আঙুলে সে গুনতে শুরু করল সতর্কভাবে, আমি ততক্ষণে একটা নাট্ স্কোয়ার খেয়ে ফেললাম। ভারি শান্ত লাগছিল চারদিক, মনে হচ্ছিল যেন হাওয়ায় বোনা হচ্ছে এক তুষারকণার চাদর, নরম মৃদুছন্দে। সে খুব আস্তে আস্তে গুনছিল। একটা দুটো ভুলও করছিল আর আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আরও দুটো কেক খেয়ে ফেললাম। এক সময় হঠাৎই সে চোখ দুটো আমার দিকে তুলল এত বিস্ময়করভাবে বেশিরকম কোণাকুনি করে যে তার চোখের তারাগুলো ওপরের দিকে বেঁকে উঠে গেল আর সাদা অংশটুকু যেন তাজা দুধের মতই হাল্‌কা নীল। সে উত্তেজিতভাবে কিচ্‌মিচ্ করে কিছু বলল রাশিয়ানে, হাসি হাসি মুখ করে অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকালাম, তাতে সে নিচু হয়ে তার নোংরা ছোট্ট আঙুল দিয়ে তুষারের উপর লিখল (৪৫); আমি তার সাথে আমার খাওয়া পাঁচটা ধরে বললাম 'ঝুড়িটাও আমাকে দিয়ে দাও, কি বল?'

সে মাথা নাড়ল, সাবধানে গর্তটার মধ্য দিয়ে ঝুড়িটা আমায় দিয়ে দিল আর আমি কয়েকটা একশ মার্কের নোট তার দিকে গলিয়ে দিলাম। পুড়িয়ে ফেলার মত টাকা আমাদের আছে। একটা কোটের জন্য রাশিয়ানরা সাতশ মার্ক দিচ্ছে, আর তিন মাস ধরে আমরা কাদা, রক্ত, কয়েকটা বেশ্যা আর টাকা ছাড়া কিছু দেখিনি।

'কাল এস, ঠিক আছে?' আমি ফিসফিসোলাম, কিন্তু সে আর শুনছিল না।

চোখের পাতা ফেলার মধ্যেই সে পালিয়ে গেছে আর যখন আমি গর্তের ভেতর দিয়ে মাথাটা বের করে দেখলাম, আমার মন খারাপ লাগছিল, তাকে আর দেখাই গেল না, শুধুই সেই নিস্তব্ধ রাশিয়ান গলিটা, বিষাদাচ্ছন্ন আর নির্জন; মনে হচ্ছিল আস্তে আস্তে চওড়া ছাদওয়ালা বাড়িগুলো তুষারে ঢাকা পড়ে যাবে। এক বিষণ্ণ দৃষ্টির জন্তুর মতো আমি সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, বেড়ার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে, যখন ঠাণ্ডায় আমার গলাটা শক্ত হয়ে উঠল কেবল তখনই আমি বন্দীশালার মধ্যে আমার মাথাটা ঢুকিয়ে আনলাম।

আর এই প্রথমবার কোনাটা থেকে পেচ্ছাবখানার তীব্র গন্ধ আমায় ধাক্কা দিল, আর দেখলাম ছোট্ট সুন্দর কেক গুলোর ওপর তুষার জমেছে যেন চিনির আস্তরণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি ঝুড়িটা তুলে নিলাম আর বাড়িটার দিকে ফিরলাম; আমার ঠাণ্ডা লাগছিল না, সেই রোমান্টিক দর্শন ব্যান্ডেজটা মাথা ঘিরে ছিল আর আমি আরও এক ঘণ্টা তুষার

---

* *মার্জিপ্যান*—কাগ্‌জিবাদাম (অ্যালমণ্ড), চিনি, ডিম ইত্যাদির ঘন গোলা

পাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম। আমি চলে এলাম কারণ কোনো একটা জায়গায় তো যেতেই হবে। মানুষকে কোনো একটা জায়গায় তো যেতেই হয়, তাই না? তুমি শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পার না, পার না নিজেকে তুষারের মধ্যে কবর দিয়ে দিতে। তোমাকে কোনো জায়গায় যেতেই হবে, এমন কি তখনও, যখন তুমি আহত — এক অপরিচিত, কালো, ভয়ঙ্কর অন্ধকার দেশে ..........

# একটি পায়ের গল্প

তারা এখন আমায় একটা সুযোগ দিচ্ছে। দপ্তর থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠানো হয়েছিল আমায় দেখা করতে বলে। আমি গেলুম। দপ্তরে তারা আমার সাথে খুব সদয় ব্যবহার করল। তারা আমার ফাইল কার্ড খুঁজে বের করল আর বলল 'হুম'। আমিও বললাম 'হুম'।

'কোন পাটা?' জিজ্ঞাসা করল কর্মচারীটি।

'ডান পাটা।'

'গোটা পাটা?'

'গোটা পাটা।'

'হুম', সে আবার মুখ দিয়ে আওয়াজ করল আর ঘেঁটে চলল নানারকম কাগজপত্রর মধ্য দিয়ে। আমাকে অবশ্য বসতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

শেষ অবধি লোকটা একটা কাগজ খুঁজে পেল, আমার মনে হল ওটাই সঠিক কাগজ। 'আমার মনে হয় এখানে তোমার জন্য কিছু কাজ আছে' বলল লোকটা 'আর খুব ভাল কাজও বটে। এমন একটা কাজ যাতে তুমি বসতে পারবে। রিপাবলিক স্কোয়ারের পেচ্ছাবখানায় একটা জুতোপালিশের জায়গা। কেমন মনে হয়?"

'আমি জুতো পালিশ করতে পারি না; ওই একটা ব্যাপার লোকেরা বরাবরই আমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করে এসেছে, এই আমার জুতো পালিশ করার খামতির ব্যাপারটা।'

'তুমি শিখে নিতে পার', বলল লোকটা 'একজন যা ইচ্ছে শিখতে পারে। একজন জার্মান সব কিছুই করতে পারে। যদি তুমি চাও তো একটা বিনা পয়সায় ট্রেনিং নিতে পার।'

'হুম' আমি বললাম।

'তুমি কাজটা নিচ্ছ?'

'না'। আমি বললাম 'আমি নিচ্ছি না। আমি আরও বেশি পেনসন চাই।'

'তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ।' লোকটা উত্তর দিল, ওর গলার আওয়াজটা নরম আর ভালমানুষী মাখান। 'আমার মাথা খারাপ হয় নি, আর কেউই আমার পা ফিরিয়ে দিতে পারবে না, এমন কি আমাকে সিগারেট বিক্রি করতেও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, ওরা এর মধ্যেই আমার পক্ষে সেটা কঠিন করে তুলেছে।'

লোকটা ঝুঁকে বসা থেকে পুরোপুরি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, আর একবার গভীর শ্বাস টানল 'প্রিয় বন্ধু', লোকটা বলল, বক্তৃতা শুরু করার ভঙ্গীতে তোমার পা-খানা কাফি

দামি পা। আমি জানি যে তোমার এখন উনত্রিশ বছর বয়স, তোমার হার্টের অবস্থা বেশ ভাল, সত্যি কথা বলতে কি পায়ের ব্যাপারটা বাদ দিলে তোমার স্বাস্থ্য যথেষ্ট মজবুত। আমার ধারণা তুমি সত্তর অবধি হেসে খেলে টানবে। নিজেই হিসেব কর। প্রতি মাসে সত্তর মার্ক, বছরে বারো বারো। তাহলে দাঁড়াচ্ছে একচল্লিশ-গুণ্-বারো-গুণ্-সত্তর। নিজেই হিসেব কর, এ হল সুদ বাদ দিয়েই। ভেব না পা কেবল তোমারই আছে। যেটা ঘটনা সেটা হল যে তুমি একাই ভালমতো বুড়ো বয়স অবধি বাঁচবে না। আর তুমি কি না আরও বেশি পেনসন চাও। আমি দুঃখিত, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।'

'আমি মনে করি, স্যার', আমিও হেলান দিয়ে বসলাম আর গভীর শ্বাস টানলাম। আর, বলতে শুরু করলাম 'আমি মনে করি আপনি আমার পায়ের দাম সাঙ্ঘাতিক কম করে ধরছেন, আমার পা আরও বেশি দামী। নিশ্চিতভাবেই এটা খুবই মূল্যবান পা। ব্যাপারটা আসলে এই যে আমার মাথাও আমার হার্টের মতই কাজ করে। আমায় একটু বুঝিয়ে বলতে দিন।'

'আমি খুবই ব্যস্ত লোক।'

'আমি ব্যাখ্যা করছি!' বললাম আমি 'আপনি দেখবেন যে আমার পা অনেক লোকেরই জীবন বাঁচিয়েছিল যারা এই মুহূর্তে মোটা পেনসন মারছে।'

'যা ঘটেছিল তা এইরকম : ফ্রন্টের সামনের দিকে একা একাই আমি শুয়েছিলাম। আমার কাজ ছিল শত্রুপক্ষের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাতে আমাদের পক্ষের লোকজন সময়ে কেটে পড়তে পারে। পেছনের সৈন্যসামন্তরা সব গুছিয়ে নিচ্ছিল। যদিও তারা খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা ফাঁকা করে দিয়ে চলে যেতে চাইছিল না, কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সেখানে থাকাটাও তারা সহ্য করতে পারছিল না। একেবারে প্রথমে, আমরা দুজন ছিলাম, কিন্তু অন্য লোকটাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলল—মনে রাখবেন ওর জন্য আপনার এক পয়সাও খরচ হচ্ছে না এখন। এটা ঠিক যে সে বিবাহিত, কিন্তু তার বউ-র স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল আর খেটে খেতেও পারে, আপনার কোনো চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তার ব্যাপারে দর কষাকষিতে আপনারা ভালই জিতেছেন। লোকটা মাত্র একমাস হল সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল, ওর জন্য যা মোট খরচা হয়েছে তা হল কিছু রেশনের রুটি আর একটা পোস্টকার্ড। আপনাদের দিক থেকে ও একজন ভাল জওয়ান, অন্তত সে নিজেকে মরতে দিয়েছে। সে যাকগে, আমি শুয়েছিলাম, একা একাই, ভয় কাঁটা হয়ে আর খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, আমারও ভেগে পড়ার ইচ্ছে ছিল, আসলে আমি কেটে পড়তেই যাচ্ছিলাম যখন .....

'আমি সত্যিই খুব ব্যস্ত এখন' একটা পেন্সিল খুঁজতে শুরু করতে করতে বলল লোকটা।

'না, শুনুন' আমি বললাম, 'এইখানে এসে ঘটনাটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেই আমি পালাতে যাব, অমনি আমার পায়ের এই ব্যাপারটা ঘটল। আর যেহেতু ওখানে পড়ে থাকা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না, আমি ভাবলাম আমি সংকেতটা দিয়ে দিতেই পারি। তাই আমি সংকেতটা পাঠালাম আর ওরা সবাই মিলে পালাও, পালাও বলে ছুটল—অবশ্যই পদমর্যাদা মেনে। প্রথমে গেল ডিভিশনের লোকজনেরা, তারপর রেজিমেন্টের

লোকজনেরা তারপর ব্যাটেলিয়ান, তারপর আরও নীচের লোকেরা, একের পর এক। মজার কথা হচ্ছে, আপনি দেখুন, ওরা এত তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল যে আমায় নিয়ে যেতে বেমালুম ভুলে গেল! এটা কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমনই বাজে ঘটনা। ধরুন, আমার যদি পা না খোওয়া যেত তবে এতক্ষণে ওরা সব্বাই মরে ভূত হয়ে গেছে— জেনারেল, মেজর আরও নীচের দিকের লোকজন, আর আপনাদেরও ওদের কোনই পেনসন দিতে হত না। এখন হিসেব করুন আমার পায়ের জন্য আপনাদের কি পরিমাণ খরচা হচ্ছে। জেনারেলের বয়স বাহান্ন, কর্নেল আটচল্লিশ, মেজর পঞ্চাশ। প্রত্যেকেই উজ্জ্বল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, মাথা আর হার্ট দুই-ই ভাল, আর সামরিক জীবনসহই তাঁরা প্রত্যেকেই বাঁচবেন অন্তত আশি বছর করে, যেমনটি বেঁচেছিলেন হিন্ডেনবুর্গ। নিজেই হিসেব করুন, একশ ষাট-গুণ-বার-গুণ ত্রিশ—গড়ে আমরা ত্রিশই ধরতে পারি। পারি কি? আমার পাটা সত্যিই কাফি দামি পা হয়ে উঠেছে, যতগুলো অসম্ভব দামী পায়ের কথা আমার মাথায় আসছে তারই একটা, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি?'

'সত্যি সত্যিই তোমার একবারে মাথাটা গেছে।' বলল লোকটা।

'না' আমি উত্তর দিলাম, 'যায় নি। দুর্ভাগ্যবশত আমার হার্ট আমার মাথার মতই তেজী, আর এটা দুঃখজনক যে পায়ের ব্যাপারটা ঘটার মিনিট কয়েক আগে আমিও কেন গুলি খেয়ে মরলাম না। তাহলে হয়তো আমরা অনেক টাকাই বাঁচাতে পারতাম।'

'তুমি কি কাজটা নিচ্ছ?' জিজ্ঞাসা করল লোকটা।

'না' বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

*অদ্রোহ* : জুন, ১৯৮৮

একটি শোকবার্তা

## এখন মাঝরাত

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়/গীর্জার ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং/তরলিত জোৎস্না ঝরে গরাদের ফাঁকে ও ফোকরে/একজন কবি ও মানুষ/কলম বন্ধ করলেন আর একবার এবং অন্তিম সুরে/'কাউকে বিরক্ত কোরো না' বলে/চার দেওয়ালে ঘেরা জমাট বাতাস সমুদ্রে/ ভেসে গেলেন/আমি ভয় পাইনি/যদিও সিলিং-এ ঝুলছে সেই পরিচিত মুখ/আয়নায় যাকে দেখি অহরহ/কিন্তু দায়ী কে?/সকলেই একটু একটু করে— তুমিও কি?/ নোনা সমুদ্রের মাঝে তীব্র তেষ্টায় ঘুরে ফিরে/অবশেষে এক মুঠো ছাই যদিও জানি/তুমি কি পারতে না আরো কিছু দিন কিছু কাল...../অবশ্য কিইবা হত তা'লে/শূন্য থেকে যাত্রা শুরু শূন্যতারই পথে...

## প্রতিবেশীকে ভালবাস (LOVE THY NEIGHBOUR)

হঠাৎই এক বন্ধুর চিঠি এল দিল্লী থেকে। খামের মুখ ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল একরাশ যন্ত্রণায় ঘেরা এক খবর। আত্মহত্যা করেছে গোরখ পান্ডে। ছোট্ট খবর কিন্তু মনে হল আমাদের চারপাশে যে ছায়া নেমে আসছে দ্রুত, দেওয়াল উঠছে ক্রমশই উঁচুতে, এ হল তারই প্রতীক। কিন্তু আমাদের শৈশবে, যখন রাতের অন্ধকারে অল্প একটু পথ পার হওয়া জন্যও আমরা আঁকড়ে ধরতাম একে অন্যের হাত, আজও সেইরকম আমাদের হাত বাড়াতে হয় একে অন্যের দিকে— জ্বালিয়ে রাখতে হয় সযত্নে প্রদীপ এই দারুণ হাওয়াতেও।

গোরখ ছিল মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল ঘর থেকে আসা এক যুবক। জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অস্তিত্ববাদ ও সাহিত্য' নিয়ে পড়ার সাথে সাথেই সে যুক্ত ছিল নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মে। যে সব মানুষেরা সব সময়েই পাশের মানুষদের সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায় অথচ কখনই আমাদের চোখে পড়ে না তাদেরই একজন ছিল সে। ইউনিভার্সিটি শিক্ষাজগতের অমানবিক চাপ, রাজনীতি জগতের হৃদয়হীনতা, ব্যক্তি হিসাবে পেছিয়ে পড়া, বাতিল হয়ে যাওয়া যা অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট থেকে প্রেমের সাফল্য/ব্যর্থতা অবধি বিস্তৃত সব সময়েই মানুষকে সার্থক বা ব্যর্থ এই ছাপ দিয়ে আলাদা করে দেয়, আর এ সবই গোরখের অস্তিত্বে জড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপক অর্থে। ক্রমশই সে একা হয়ে যাচ্ছিল, ডুবে যাচ্ছিল অন্য এক জগতে। আমরা জানি এই অবস্থায় মানুষকে সুস্থ করে তোলার নামে কি করা হয়। আর তাই ড্রাগ, ইলেকট্রিক শক্, অ্যাসাইলাম কোন কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি—যাতে সে শান্ত হয়ে যায়, চিন্তা করতে ভুলে যায়, জীবিত অবস্থায় পরিণত হয় এক মৃতদেহে। এক বন্ধু যথার্থই বলেছে যে গোরখের মৃত্যুর জন্য আমরা সবাই একটু করে দায়ী।

গোরখ চেষ্টা চালিয়েছিল গভীর খাদ থেকে উঠে আসার জন্য। কিছু বন্ধুর সাহায্যে সে নিশ্চয়ই লড়াইটা বেশ কিছুকাল চালিয়েছিল মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য। এই প্রয়াসটাই আসল ব্যাপার। গোরখের আত্মহনন আমাদের বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় ব্যক্তিবাদ-কম্পিটিশন-বিচ্ছিন্নতার জগতের সামনা সামনিই তৈরী করতে হয় বন্ধুত্ব-সম্পর্ক-সহযোগিতার আর এক জগৎ।

# মিথ অফ সিসিফাস

দেবতারা সিসিফাসকে দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন অন্তহীনভাবে এক পাথরকে পর্বতশীর্ষে গড়িয়ে তোলার, যেখান থেকে তা নিজের ভারে পশ্চাদপসরণ করবে। তাঁদের এই চিন্তার মধ্যে কিছুটা যুক্তি ছিল যে বন্ধ্যা ও আশাহীন পরিশ্রমের চেয়ে আর কোন ভয়ঙ্কর শাস্তি হয় না।

যদি কেউ হোমারকে বিশ্বাস করে তবে বলতে হয় যে সিসিফাস ছিলেন মরণশীল মানব সমাজে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ও চরম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। অন্য এক ঐতিহ্য অনুযায়ী, যদিও তিনি বাধ্য হয়েছিলেন পথমধ্যস্থ দস্যুবৃত্তি চর্চায়। আমি এর মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখিনা। মতামতের ফারাক আছে, যুক্তির দিক থেকেও যে কেন তিনি নীচের জগতে ব্যর্থ পরিশ্রমে নিরত হয়েছিলেন। শুরু করতে গিয়ে বলা যায় যে তিনি দেবতাদের ব্যাপারে এক ধরণের তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের গুপ্ত রহস্য চুরি করে জেনে নিয়েছিলেন। জুপিটার এসোপাসের কন্যা এজিনাকে উঠিয়ে নিয়ে যান। পিতা এই কন্যা অপহরণে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং সিসিফাসের কাছে অভিযোগ করেন। সিসিফাসের এই অপহরণ সংক্রান্ত ঘটনা জানা ছিল এবং তিনি তা একশর্তে জানিয়ে দিতে রাজী ছিলেন। শর্ত হল, এসোপাস করিন্থের আশ্রয়স্থলে জলদান করবেন। স্বর্গীয় বজ্রপাতের তুলনায় জলদানের পুণ্যকেই সিসিফাস অগ্রাধিকার দেন। এইজন্য পাতালে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়। হোমার আমাদের বলেন যে সিসিফাস মৃত্যুকে শৃংখলিত করেছিলেন। প্লুটো তাঁর পরিত্যক্ত ও নিস্তব্ধ সাম্রাজ্যের দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। তিনি যুদ্ধদেবতাকে পাঠিয়ে মৃত্যুকে তার বিজেতার হাত থেকে মুক্ত করে আনেন। আরও বলা হয় যে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে সিসিফাস বেপরোয়াভাবে নিজের স্ত্রীর ভালবাসা পরীক্ষা করতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন যেন যে তাঁর অসমাধিস্থ দেহ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত উদ্যানের মাঝখানে ফেলে রাখতে। পাতালে চোখ মেলে সিসিফাস মানবিক প্রেমের সম্পূর্ণ বিপরীত এক বাধ্যতা দেখে বিরক্ত হন ও প্লুটোর কাছ থেকে অনুমতি যোগাড় করেন যাতে তিনি পৃথিবীতে ফিরে এসে স্ত্রীকে সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু যখন তিনি আবার দেখলেন পৃথিবীর মুখ, আনন্দ পেলেন রৌদ্র ও জলে, উত্তপ্ত পাথর আর সমুদ্রে, তখন তিনি আর, সেই নারকীয় অন্ধকারে ফিরে যেতে চাইলেন না। প্রত্যাবর্তনের ডাক, ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত, সতর্কবাণী কোন কিছুতেই কাজ হল না। আরও অনেক বছর তিনি বেঁচে রইলেন মাটির হাসি, ঝকঝকে সমুদ্র আর উপসাগরের বাঁকানো অংশের দিকে মুখ করে। সমস্ত দেবতাদের এক অনুশাসন জরুরী হয়ে উঠল। শেষ অবধি মার্কারী এসে উদ্ধত মানুষটির কলার চেপে ধরলেন এবং তাঁর সমস্ত আনন্দ থেকে ছিনিয়ে তাঁকে জোর করে পাতালে নিয়ে গেলেন যেখানে তাঁর পাথর তাঁর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন যে সিসিফাসই হলেন সেই অ্যাবসার্ডনায়ক। তিনি তাইই, যতখানি তাঁর গভীর আবেগের মধ্য দিয়ে, ততখানিই তাঁর নির্মম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। তাঁর দেবতাদের প্রতি অবজ্ঞা, মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা এবং জীবনের প্রতি প্রচণ্ড আবেগ তাঁকে জয় করে এনে দেয় সেই বাক্যাতীত শাস্তি, যার মধ্যে সমস্ত অস্তিত্ব প্রযুক্ত হয় শুধুই শূন্যতাকে পাবার জন্য। পার্থিব আবেগের জন্য যে দাম চুকাতে হয় তা হল এইই। পাতালে সিসিফাসের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কল্পনার জন্য অতিকথা তৈরি করা হয়েছে যাতে তার মধ্যে জীবনদান করা যায়। এই অতিকথা সম্পর্কে বলা যায় যে শুধু কেউ দেখতে পায় এক বিশাল পাথরকে শতবার ঢাল বেয়ে উপরে তোলার জন্য সমস্ত শক্তির টানটান হয়ে ওঠা, দেখা যায় সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠা এক মুখ, কপাল পাথরের সাথে দৃঢ়সংলগ্ন, কাঁধ দুটো আঁট হয়ে আছে কাদামাখা এক ভাবে। পা দুটো শক্ত, একবার নতুন করে যাত্রা শুরু দুই বাহু বিস্তৃত রেখে, মাটি মাখা দুই হাতে এক সম্পূর্ণ মানুষী নিরাপত্তা। আকাশহীন মহাশূন্য আর গভীরতাহীন সময়ের মাপে মাপা তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টার একেবারে শেষে উদ্দেশ্য সাধিত হল। তারপর সিসিফাসকে তাকিয়ে দেখতে হয় যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই পাথর কিভাবে নীচের পৃথিবীর দিকে ছুটে যায় যেখান থেকে তাঁকে আবার ধাক্কা দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তিনি সমতলের দিকে রওনা হন।

এই ফিরে যাওয়ার মধ্যে, ওই বিরতিতে, সিসিফাস আমাকে আকর্ষণ করেন। পাথরের খুব কাছাকাছি কঠোর পরিশ্রমে নিরত মুখ এর মধ্যেই পাথরে পরিণত হয়েছে। আমি দেখতে পাই সেই মানুষটি ফিরে নেমে যাচ্ছেন, ভারী অথচ মাপা পা ফেলে সেই যন্ত্রণার দিকে যার শেষ কোথায় তিনি জানেন না। তাঁর যন্ত্রণার মতই নিশ্চিতভাবে ফিরে আসা সেই নিশ্বাস নেওয়ার সময়টুকু, সেটাই হল সচেতনতার সময়। এই প্রত্যেকটি মুহূর্তে যখন তিনি শিখর ত্যাগ করেন এবং আস্তে আস্তে দেবতাদের আশ্রয়স্থলের দিকে নেমে যান, তখন তিনি তাঁর ভাগ্যকে ছাপিয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর পাথরের চেয়েও হয়ে ওঠেন শক্তিশালী।

যদি এ উপাখ্যান বিয়োগান্ত হয় তবে তা তার নায়ক এ ব্যাপারে সচেতন বলেই। প্রকৃতপক্ষে, তার যন্ত্রণা কোথায়, যদি প্রতিটি পদক্ষেপে জয়লাভের আশা তাকে উজ্জীবিত করে? আজকের শ্রমজীবী মানুষ তার জীবনের প্রত্যেকদিনই একই কাজ করে চলে এবং তার এই ভাগ্য কম অ্যাবসার্ড নয়, কিন্তু এটা তখনই শুধু বিয়োগান্ত, সেই দুর্লভ মুহূর্তে, যখন তা তার সচেতনতায় ধরা পড়ে। সিসিফাস, দেবতাদের মধ্যে প্রলেতারিয়ান, ক্ষমতাহীন ও বিদ্রোহী, তাঁর চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা সম্পর্কে জানতেন। নেমে আসার পথে এই চিন্তাই তার মনকে অধিকার করে। এই স্বচ্ছতা যা তার পীড়নকে নির্মাণ করে একই সময়ে তাঁর জয়কেও রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। এমন কোন দুর্ভাগ্য নেই যাকে নিদারুণ অবজ্ঞা দিয়ে কাটিয়ে ওঠা যায় না।

যদি এই অবতরণ কখনো কখনো দুঃখের মধ্যে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তবে তা, আনন্দেও হতে পারে। এটা খুব বেশী বলা নয়। পুনর্বার আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সিসিফাস ফিরে যাচ্ছেন তাঁর পাথরের দিকে, এবং দুঃখবোধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে। যখন মাটির ছবি স্মৃতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে, যখন আনন্দের ডাক অপ্রতিরোধ্য, তখন

মানুষের হৃদয়ে জেগে ওঠে এক বিষাদ, এটাই পাথরের জয়, এটা পাথর নিজেই। সীমাহীন অশান্ত দুঃখ আর বওয়া যায় না। এ হল আমাদের জন্য গেথসেমানের (গ্রীক পুরাণ বর্ণিত সমাধিস্থলের স্থান) রাত। কিন্তু স্বীকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই প্রচণ্ড সত্যের ধ্বংস। তাই ওয়াদিপাউস শুরুতে দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলেন তাকে না জেনেই। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি জানলেন, তাঁর ট্রাজেডি শুরু হল। অথচ একই মুহূর্তে অন্ধ তথা হতাশ সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে পৃথিবীর সাথে তাঁর যোগসূত্র হল এক নারীর শীতল হাত। তারপরেই বেজে উঠল এক অসাধারণ মন্তব্য "এত কঠোর পরীক্ষা সত্ত্বেও, আমার এই অগ্রসর বয়স ও আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে যে সবকিছুই ঠিক আছে।" আর এখানেই দস্তয়েভস্কির কিরিলভের মত সোফোক্লিসের ওয়াদিপাউস অ্যাবসার্ডের জয়লাভের এক পদ্ধতির প্রণালী দিয়ে যান। আধুনিক বীরত্ব অনুমোদন লাভ করে প্রাচীন জ্ঞানের।

অ্যাবসার্ডকে আবিষ্কার করতে গিয়ে যে কেউ অনুভব করে আনন্দলাভের সহজ পাঠ গোছের কিছু একটা লিখে ফেলার প্রেরণা। "কি এত সরু রাস্তা দিয়ে..... ?" কিন্তু পৃথিবী একটাই। একই পৃথিবীর দুই সন্তান আনন্দ আর অ্যাবসার্ড। তারা অবিচ্ছেদ্য। অ্যাবসার্ড আবিষ্কার থেকেই আনন্দ নিশ্চিতভাবে এসে পড়ে এটা বললে ভুল করা হবে। অবশ্য এটা ঘটে যে আনন্দ থেকে অ্যাবসার্ড অনুভূতি বেড়িয়ে আসে। ওয়াদিপাউস বললেন "আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে সবকিছুই ঠিক আছে।" এবং এই মন্তব্য পবিত্র হয়ে উঠল। মানুষের বন্য আর সীমাবদ্ধ দুনিয়ায় প্রতিধ্বনিত হল এই আওয়াজ। এটা শিক্ষা দিল যে সবকিছুই, হ্যাঁ সবকিছুই ফুরিয়ে যায়নি। বিতাড়িত হল সেই দেবতা এই পৃথিবী থেকে, যে নিয়ে এসেছিল অসন্তোষ আর বন্ধ্যা পীড়নের প্রতি এক আসক্তি। দুর্ভাগ্যকেও তা করে তুলল মানুষেরই নিজস্ব ব্যাপার যা নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হবে মানুষের মধ্যে। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সিসিফাসের সমস্ত নীরব সুখ। তাঁর ভাগ্য তাঁর নিজেরই। তাঁর পাথর তাঁর নিজেরই। একইভাবে অ্যাবাসার্ড মানুষ, যখন সে তাঁর যন্ত্রণাকে ছুঁয়ে দেখে, নিশ্চুপ করে দেয় সমস্ত দেবতাদের। আর যখন সমস্ত মহাবিশ্ব হঠাৎই ফিরে পায় তাঁর নীরবতা, তখন জেগে ওঠে এই পৃথিবীর অসংখ্য বিস্ময়কর নীচু গলার আওয়াজ। গোপন ডাক, সমস্ত মুখেই ফুটে ওঠে অচেতন আমন্ত্রণ। এ হল জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় দাম। একই সাথে তা আবার উল্টো পিঠও। ছায়া ছাড়া কোন সূর্য হয় না ও রাতের চেহারা কেমন তা জানাও প্রয়োজনীয়। অ্যাবসার্ড মানুষ হ্যাঁ বলেছে এবং তার প্রচেষ্টা এরপর থেকেই চলতে থাকে। যদি ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বলে কিছু থাকে তবে তার থেকে উঁচুতে নিয়তি আর কিছু নেই অথবা কমপক্ষে একটা কিছু থাকতে পারে যা সে মনে করে অবশ্যম্ভাবী তথা অবমাননাকর। বাকী সবকিছুর জন্য সে মনে করে যে তার প্রভু সে নিজেই। সেই অস্পষ্ট মুহূর্তে যখন মানুষ পিছন ফিরে তার জীবনের দিকে এক পলক তাকায়, সিসিফাস ফিরে যাচ্ছেন তাঁর পাথরের দিকে, সেই অল্প গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, মনের পর্দায় তিনি দেখে নেন পরপর ঘটে যাওয়া সেইসব পরস্পর সম্পর্কহীন ঘটনা যা পরিণত হয় তাঁর দুর্ভাগ্যে। তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই স্মৃতির পর্দায়, তারা একসাথে মিলে গিয়েছে। আর তাঁদের দরজা দ্রুত বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাঁর মৃত্যুতে। এইভাবে যা কিছু মানবিকতার উৎসও যে মানবিকই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এক অন্ধ মানুষ যে দেখতে আগ্রহী, যে জানে রাত্রির কোন শেষ নেই, তার পথচলা চলতেই থাকে, পাথর গড়াতেই থাকে।

এইখানে, এই পর্বতের পাদদেশে আমি সিসিফাসকে ছেড়ে আসি। প্রত্যেকেই আবার তাদের বোঝা খুঁজে পায়। কিন্তু সিসিফাস আমাদের শেখান সেই পরম বিশ্বাস যা দেবতাদের অস্বীকার করে আর পাথরকে নীচু থেকে উঁচুতে তোলে। তিনিও সিদ্ধান্ত নেন যে সবকিছু ঠিকই আছে। এরপর থেকে এই বিশ্ব কোন প্রভু ছাড়াই তার কাছে বন্ধ্যাও থাকে না, ব্যর্থও থাকে না। ওই পাথরের প্রত্যেকটি অণু, রাত্রির মধ্যেকার ওই পর্বতের প্রত্যেকটি ধাতব টুকরো নিজের মধ্যেই গড়ে তোলে এক বিশ্ব। শিখরের দিকে যাওয়ার সংগ্রামই যথেষ্ট মানুষের হৃদয়ভার তোলার জন্য। আপনি ভাবতেই পারেন যে সিসিফাস সুখী।

মূল রচনা : **আলব্যের কাম্যু**

**অনুবাদকের কথা**

আলব্যের কাম্যু আমাকে প্রভাবিত করেছেন নানাভাবে। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে আমার যে সব উপলব্ধি নানান সময়ে আমাকে জড়িয়ে থেকেছে, যার তাড়নায় কখনো অন্ধকার রাতের একাকীত্ব শেষ হয়েছে সকালের এক টুকরো নীল আকাশে, তাদের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। কাম্যু বোধহয় বলতে চেয়েছেন যে বিরাট ক্যানভাসে যৌথভাবে আঁকা স্বপ্নের যে আত্মপ্রতারণা, তার পাশেই লুকিয়ে আছে আমাদের নৈরাশ্য আর যন্ত্রণার মলাটে ঢাকা রক্তক্ষরণের নিজস্ব ইতিহাস। আর তারও পরে প্লেগ আমাদের হৃদয়কে আক্রমণ করে। তবু জীবন থেমে থাকে না। ফরাসী আলজেরিয়ার এক ছন্নছাড়া সন্তান কাম্যু বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসে পড়েন নাগরিক ফরাসী সভ্যতার মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান অন্ধকারের মাঝে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় "Le Mythede Sisyphc" আধুনিক মানুষের স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন জীবনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন কাম্যু। জীবনের অর্থবহতা নিয়ে। প্রশ্ন তোলেন জীবন ব্যর্থ জেনেও মানুষের আত্মহত্যার বৈধতা কতখানি?

তাঁর লেখা ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতই কাম্যু দাঁড়িয়েছেন বিদ্রোহ, স্বাধীনতা আর গভীর আবেগের সপক্ষে। একই সাথে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন নানান মোহ। নাইটদের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। এক ছোট্ট ও একই মাত্র রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা জীবনের কোন কোন মুহূর্তে হয়ে ওঠে বিশেষ, তারপরই তারা হারিয়ে যায় অসংখ্য নামহীন মানুষের ভীড়ে। সন্ধ্যার ট্রামের ফিরে আসার শব্দ, ফুটবল মাঠ ফেরতা মানুষের গলার আওয়াজ, আরও দূরে কোথাও সমুদ্রের অস্ফুট গর্জন জীবনকে এক নতুন মাত্রা দেয়। প্লেগের রিও-র মতো আমরাও বুঝি জীবনের অর্থবহতা। বুঝি যে এই আনন্দ আর বেদনার গাঢ় পট আঁকা হয়ে যায় নৈঃশব্দের মধ্য দিয়েই।

*নিষঙ্গ*, ১৯৮৯

# সত্যব্রত করের কবিতাগুচ্ছ

সত্য কবিতা লিখত এক সময়ে। বন্ধুদের পড়ে শোনাত—ছাপা হয়নি বিশেষ কোথাও—হয়তো তেমন গরজও ছিল না। শেষ ক-বছর আর কবিতা লেখেনি। আশঙ্কায় ছিলাম—কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলো পাওয়া যাবে তো! পাওয়া গেল অমিতা ও রামের চেষ্টায়—ডানকুনির বাড়ি থেকে। বেশিরভাগই আটের দশকে লেখা—মাত্র একটি দুটি প্রকাশিত হয়েছে, *অনোয়ান*, *The Telegraph* ও *অদ্রোহ* পত্রিকায়।

---

## এক

আমার কবিতা যেন সুঠাম যুবক
খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বাসস্টপ জুড়ে
আকণ্ঠ প্রতীক্ষায়, কোনো নীলাভ এক্সপ্রেস
তাকে নিয়ে যাবে পর্বতের সানুদেশে,
স্বচ্ছ নীলিমায়।

আমার কবিতা যেন সুঠাম যুবক
খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে বাসস্টপ জুড়ে
আকণ্ঠ প্রতীক্ষায়। ফের কোনো ধূসর এক্সপ্রেস
বাঁকানো ঘাড়ের মতো উদ্ধত গতিতে
তাকে নিয়ে যাবে পর্বতের সানুদেশে,
স্বচ্ছ নীলিমায়।

## দুই

এখনও প্রেমিক—
নক্ষত্রে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে,
এখনও বসন্ত সন্ধ্যায়
উতল হাওয়া ফিসফিসিয়ে বলে
(এখনও শান্তনু)
অগণিত মানুষের ভিড়ে
(এখনও একলা মানুষ)
খুঁজে ফেরে নির্জন উষ্ণতা
এখনও জীবন বেদনায়
ধূসর হয়
ঘুম ভাঙে মাঝ রাতে

## তিন

আমার এইসব লেখালেখি সম্বন্ধে
সব সময়েই বেজে চলে এক
অনিশ্চয়তার ঘন্টা। এই সব দুর্বল
ও জটিল শব্দের আকিঁবুকি
তাদের নিয়ে যুগপৎ এক
দ্বিধা ও মমতা কাজ করে চলে নিয়ত
মনের মাঝে। এইসব অকিঞ্চিৎকর
শব্দরাজি মেলে ধরা হবে অন্যদের
চোখের সামনে এই বোধ নিয়ে আসে
এক কুণ্ঠা। কবিতা এরা নয়, কারণ কবিতার
প্রজ্ঞা এদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত।

## চার

মোড় ফিরতেই
হঠাৎ দেখা
সন্দীপের সাথে।
কোন্ সন্দীপ।
অবাক করলেন
আরে ঘরে-বাইরের সেই
একমেবদ্বিতীয়ম।
তার উজ্জ্বল চোখ দুটোতে
চোখ রেখে
কথা শুনতে শুনতে
কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে
পড়লাম।
আমরাও তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
যেন ভাঙার নেশার এক
মোহন সুর বেজে উঠল।

## পাঁচ

আর্তনাদের ভঙ্গিমায়
শূন্যে তুলে এ দুই হাত,
আছড়ে পড়ি
জানু পাতার নিজস্ব সেই মূর্তিতে।
শূন্যতা, হে চরাচর
তোমার কাছেই প্রার্থনা,
ব্যাথায় বিষম পরাজয়ে
ব্যাপ্ত হওয়া, ফুর্তিতে
অসম্ভব, তাই সে আমার
নিজস্ব কোনো শব্দে লীন
প্রার্থনারই রাত ছিল কাল
প্রার্থনাতে অন্তহীন।

প্রার্থনার রাত।

## ছয়

একটি কবিতা আমি খোদাই করেছি
প্রিয়তম পবিত্রতা, অশ্রু ও রঞ্জক দিয়ে।
যেন কোন সুঠাম যুবক তার ধারাল পোশাক নিয়ে
ছুটে গেছে সময়ের বাসস্টপে, মগ্ন প্রতীক্ষায়।
ফের্ কোন ধূসর এক্সপ্রেস বাঁকানো ঘাড়ের মতো
উদ্ধত গতিতে তাকে নিয়ে যাবে
পর্বতের সানুদেশে স্বচ্ছ নীলিমায়।
অথচ শহর জুড়ে অন্ধকার কোলাজপ্রতিম
তিনতলা থেকে ভেসে আসে সুর
শ্যাঁপা নয় চাইকোভস্কি
বাস্তবের রানওয়েতে বারো ফুট জল।

আরো দূর মীরাট বা বদাউনে
পেট্রলের গন্ধ

## সাত

কফিহাউসের কোণের টেবিল ঘিরে
বসে থাকে ছজন হিজড়ে।
সাদা মোমবাতির আলোয়
ফ্যাকাশে তাদের মুখ।
বাইরে অসংখ্য মানুষ
বিকেলের বিবর্ণ আলোয়
বঞ্চনার হাত ধরে
পথ হেটে যায়

## আট

রবিবার রাত্রি। একটি শান্ত নিশ্চিত সময়।
সোমবারে শুরু হবে যে প্রাত্যহিক মলিনতা
এখনও তার থেকে কেড়ে নিতে পারছি
একটি কয়েকটি ঘণ্টার অবসর। এখনও
ব্যাপৃত করে রাখতে পারছি নিজের
সত্তাকে সামান্য শিল্পকর্মের অনুভবে।
বাখের সৃষ্ট সংগীত বা বু. ব.-র লেখা
কবিতাপ্রসঙ্গ এসবের মধ্যেই আছি।
আর সঙ্গী বিষাদপ্রতিম এক নিবিড়
ছোঁওয়া। মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে চলে
তার সঙ্গে কথা বলার এক অপটু
প্রচেষ্টা। আর অন্য কোথাও বোধহয়
বা সমস্ত শরীর দিয়েই বেজে চলে
এক মথিত করা ভায়োলিন। শুধু
যন্ত্রণাই এক নিশ্চিত উত্তর দেয় আর
পরাজয় বসে থাকে সামনের চেয়ারে।
ধসে যাচ্ছে পাড়, আর হাওয়া এসে দুলিয়ে
দিয়ে যাচ্ছে বারান্দাটিকে। শরীর জুড়ে
লেগে আছে হালকা এক স্বাদ। এই
রাতটি আর কতক্ষণ?

# রাজধানী ১৯৮৮ কলেরা মহামারী

**কেন এই প্রতিবেদন**

১৯৮৮ সালে ঘটা দিল্লির কলেরা মহামারীর ঘটনা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সহায়তায় আমাদের কানে এসেছে। আমরা অবশ্য সংবাদটি ভুলতে শুরু করেছিলাম। এমন সময় হাতে এলো 'নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতি' (এন. এম. জে. এস) প্রকাশিত এক রিপোর্ট। অল্প কিছু মানুষ যথেষ্ট আন্তরিকতার আর দায়িত্ব নিয়ে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন এই মহামারীর পিছনের নানান ঘটনা।

এন. এম. জে. এস শুধু যে এই ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কারা তাই-ই জানাতে চান তা নয়। তাঁরা আরও চান, জনমত গড়ে উঠুক, সচেতনতা বাড়ুক, যাতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায়, যাতে দিল্লি ছাড়িয়ে আমাদের দেশের নানান অঞ্চলে একই ধাঁচের যে সব বিপর্যয় ঘটে বা ঘটা সম্ভব তাদের সাধারণ যোগসূত্রগুলি খুঁজে বার করা যায়।

**কি করে শুরু হল মহামারী**

এ বছর দিল্লিতে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় প্রবল। এবং চলে অনেকদিন ধরে। ফলে বস্তি এবং রিসেটেলমেন্ট কলোনিগুলির অবস্থা দাঁড়ায় এরকম — ক. জঞ্জালের স্তূপ বাড়তে থাকে, কারণ বেশ কয়েক মাস ধরে তা সাফ করা হচ্ছিল না। খ. নর্দমাগুলোর মুখ বন্ধ হয়েছিল ফলে ময়লা সরছিল না। গ. সাধারণের জন্য বানানো পায়খানার সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি পরিষ্কার না করায় সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফলে লোকজন রাস্তার ধারেই প্রাতঃকৃত্য সারছিল। ঘ. যে সব হ্যান্ড পাম্প থেকে এই সব এলাকার মানুষেরা জল নেন, তা মাটির অল্প নীচ থেকেই জল তোলে। অথচ মল ও অন্যান্য নোংরা ময়লা মাটির অল্প নীচে চুঁইয়ে ঢুকছিল। আর তাই মানুষের খাবারের জল দূষিত হচ্ছিল মলমূত্র ও অন্যান্য ময়লার দ্বারা।

এরই পরিণতিতে জুন-জুলাই-আগস্ট '৮৮ তে ঘটে দিল্লির কলেরা ও আন্ত্রিক মহামারী।

**বিপর্যয় কত বড়**

দিল্লি প্রশাসন চাইছিল, কলেরার মহামারীর খবরটা যেন ছড়িয়ে না পড়ে।

এন. এম. জে. এস-এর ধারণা, মহামারী যে আসছে প্রশাসন তা জানত। তা সত্ত্বেও কোনো কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রত্যেক স্তরেই সরকার এই বিপর্যয়কে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়। বস্তুত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ

এশিয়ার রিজিওনাল ডিরেক্টর এক সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হ’ন, “অবস্থা, এতই গুরুতর যে একে মহামারী বলা যায়” (*প্যাট্রিয়ট*—১৯.৭.৮৮)। সেপ্টেম্বর মাসের দু-তারিখে এন. এম. জে. এস-এর এক প্রতিনিধি দলের সাথে কথা বলতে গিয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিকেবল ডিজিজেস্ (এন. আই. সি. ডি.)-এর অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর বলেন যে, যা ঘটেছে তা হল মহামারী; অথচ দিল্লি প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকার সবসময়ই অন্য কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, হয়তো আমলা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই। দিল্লি প্রশাসনের হিসেবে তেরশোর বেশি মানুষ কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। অথচ নবনিযুক্ত লে. গভর্নর বলেছেন যে মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট কম, তাই একে মহামারী বলা যাবে না। সরকারের বক্তব্য, সামগ্রিক হিসেবে ৩০০ জন মারা গেছেন, ১৩০০ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন, আর আন্ত্রিক রোগের শিকার হয়েছেন তিরিশ হাজার জনেরও বেশি লোক। অথচ ওয়াকিবহাল ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেছেন যে প্রকৃত সংখ্যা এর পাঁচ গুণ। এন. এম. জে. এস-এর লোকেরা হাসপাতাল ঘুরে দেখেছেন শুধুমাত্র “কালচার টিউবের” অভাবে বহু ক্ষেত্রে কলেরা রোগ নির্ণয় হচ্ছে না। একেবারে ঝুপড়িগুলিতে পুরোপুরি বিনা চিকিৎসায় লোক মারা যাওয়ার খবর জাতীয় দৈনিকেই বেরিয়েছে (*জনসত্য* “একটি বস্তিতে ১৩ জনের মৃত্যু”)। এন. এম. জে. এস. নানান তথ্য থেকে সুনিশ্চিত যে, মৃতের সংখ্যা অন্তত পনেরো-শ।

**অপারেশান মিসম্যানেজমেন্ট**

অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হওয়ার পর সরকারি ব্যবস্থা-গ্রহণ পর্ব শুরু হয়। আরম্ভ হয় আর এক অধ্যায়ের, যার মধ্যে রয়েছে অব্যবস্থা এবং ক্ষতিকর পদক্ষেপের নমুনা। যেমন—

ক. কলেরার মহামারী পর্বে টিকে দেওয়া

খ. স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলায় ব্যর্থতা।

গ. বাড়িতেই সহজে একটি জীবনদায়ী ওষুধ তৈরির সুযোগ না নেওয়া।

ঘ. হাসপাতালের অব্যবস্থা।

**কলেরার টিকে নিষ্ফল এবং মারাত্মক**

পার্ক এবং পার্কের লেখা *টেক্সট বুক অফ প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোস্যাল মেডিসিন* বইয়ের একাদশ সংস্করণে লেখা আছে, ‘মহামারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কলেরার টিকের কোনো মূল্য নেই। অথচ কলেরাবিরোধী প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ অতীতে প্রশাসক ও টিকে-গ্রহণকারী—উভয়ের কাছেই এক মিথ্যে নিরাপত্তার বোধ নিয়ে এসেছিল। কোনো মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে

এই সব মৃত্যু আটকানো যেত সহজেই, যদি সরকার স্বীকার করত যে মহামারীই শুরু হয়েছে। আর যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে এর সাথে লড়াইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হত।

যে গণ-টিকে দেয়ার কাজ গতানুগতিকভাবে চালানো হয় তাকে মূল্যবান সম্পদ ও সময়ের অপচয় বলে মনে করা যেতে পারে। উপরন্তু, অনেক দেশে গণ-টিকে দেওয়ার পরপরই সিরাম হেপাটাইটিসের মতো গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় বলে জানা গেছে।" যদিও ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনের ডাইরেক্টর জেনারেলও এই কথাই সমর্থন করেছেন তবুও প্রচারের কথা মনে রেখেই বোধহয় বেশ কয়েক লক্ষ লোককে টিকে দেওয়া হয়েছে। ফলে কলেরার পাশাপাশি এই সব লোকেদের সামনে জ্বর, ফোঁড়া বা যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সিরাম হেপাটাইটিস ও পোলিওর মতো রোগের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে (গণ-টিকে দেওয়ার পরে পোলিও সংক্রমণের সম্ভাবনার কথাও উপরোক্ত বইয়ে বলা আছে)। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী ঘাড়পাড়েই পার্লামেন্টে জানিয়েছেন যে, জুলাই '৮৮-তে পোলিও রোগে আক্রান্তর সংখ্যা ৩৭৯, যদিও জুলাই '৮৭-তে পোলিও রোগীর সংখ্যা ছিল ১৮৯। আগস্ট '৮৮-তে ওই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১২ (২৪ তারিখ অবধি), যেখানে আগস্ট '৮৭-তে তা ছিল ১৮২. মজা হল, দিল্লির লে. গভর্নর আগস্ট মাসের আট তারিখে বলছেন "এখনও কোনো পোলিওর ঘটনা প্রশাসনের নজরে পড়েনি" (*ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*)।

### স্থানীয় চিকিৎসা-কেন্দ্রের ব্যবস্থা হল না

পার্ক এবং পার্কের বইয়ে লেখা আছে—"মহামারী যেখানে ঘটছে তার কাছাকাছি কোনো স্থানীয় বাড়ি বা ইস্কুলকে অস্থায়ী চিকিৎসা-কেন্দ্রে পরিবর্তিত করা উচিত।" বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে কলেরা মহামারীর সময় সেটাই করা হয়েছিল। অথচ দিল্লির বেলায়? এন. এম. জে. এস-এর দুই সদস্যকে দিল্লি রেড ক্রস সোসাইটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আগস্ট মাসের একত্রিশ তারিখে বলেন, স্থানীয় ক্যাম্পের দরকার নেই কারণ খুব বেশি লোক তো আক্রান্ত হয় নি!!

### যে সহজ কথটি জানানো হল না!

চার বছরের ছোট্ট সীমা মারা গেল গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে জুলাই মাসের ১৪ তারিখে। কারণ—শরীরে জলের যোগান ফুরিয়ে গেছে মাত্র একদিনের অসুস্থতায়। তার মা বললেন যে, রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নুন-চিনির শরবত খাইয়ে যেতে হয় একথা তিনি জানতেন না। কেউ তাঁকে বলে দেয় নি (এমনকি, যে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে তিনি গিয়েছিলেন তিনিও বলেন নি)—যে, এক গ্লাস জলে দুই চায়ের চামচ চিনি আর এক চিমটি নুন দিয়ে শরবত তৈরি করে ক্রমাগত খাইয়ে যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপারই তাঁর আদরের মেয়েকে বাঁচাতে পারত। এ হল, বাঁচিয়ে-তোলা-যেত এমন শত শত রোগীদের মধ্যে একজনের কথা। এ ব্যাপারে তথ্য জানানোর বদলে সরকার এক-দুই প্যাকেট ওরাল রিহাইড্রেশন সল্যুশন প্রত্যেক পরিবার পিছু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিলি করেছে। এন. এম. জে. এস-এর হাতে এইরকম একটি প্যাকেট এসেছে। অত্যন্ত শৌখিন, ফিনল্যান্ডে তৈরি এই প্যাকেটটির উপরে ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় শরবত কি করে বানাতে হয় তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু কোনো ভারতীয় ভাষায় কিছু লেখা নেই। ইউনিসেফের

মাধ্যমে পাওয়া এই চকচকে বিদেশী মোড়ক দেখে সাধারণ লোকে মনে করতেই পারেন কোনো দামী ওষুধ বা টনিক। এ প্রসঙ্গে এন. এম. জে. এস-এর এক কর্মীর বক্তব্যে ছবিটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি এরকম প্যাকেট বিলির একটা ঘটনা দেখেছিলেন। তাঁর জবানিতে ব্যাপারটা এই রকম : "একটি ভ্যান গাড়িতে করে আসা স্বাস্থ্যকর্মীরা গাড়ির মধ্যে থেকে দেড়শরও বেশি পরিবারের এক জনসমষ্টির জন্য বিলি করলেন একশরও কম প্যাকেট। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ভ্যানটি চলে গেল। যাঁরা এই প্যাকেটগুলি বিলি করলেন তাঁরা কিন্তু মানুষের কাছে যথাযথ ভাবে বললেন না যে কিভাবে শরবত তৈরি করতে হয়, কখনই বা এটি খেতে হবে। প্রাপকরা বাড়ি চলে গেলেন এবং তক্ষুনি জলে গুলে খেয়ে ফেললেন প্যাকেটের মধ্যেকার গুঁড়োটুকু—যেন কোল্ড ড্রিঙ্কস বা টনিক খাচ্ছেন এমনভাবে। যে সব পরিবার প্যাকেট পান নি তাঁদের দেখা গেল তিক্তস্বরে অভিযোগ করতে—বৈষম্যের বিরুদ্ধে।"

### বড় হাসপাতালের অব্যবস্থা

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না করতে পারায় বেশ কয়েক হাজার রোগীকে পাঠানো হয় বড় হাসপাতালগুলিতে। কিন্তু অব্যবস্থা সেখানেও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াতেই থাকে।

তিনটি বড় হাসপাতাল রোগীদের পাঠিয়ে দিচ্ছিল আই. ডি. হাসপাতালে। এই হাসপাতাল-বদলের বলি হল দশ মাসের ললিত, দেড় বছরের মঞ্জু বা চার বছরের আফসানারা। এদের কেউ মারা গেছে বদলির সাত মিনিটের মধ্যে। কেউ মারা গেছে দু-ঘণ্টার মধ্যে, আবার কেউ বা মারা গেছে একশ মিনিটের মধ্যে। অথচ গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালের ডাক্তাররা বলছেন যে রোগীর শরীরে জল কমে যাওয়ার ব্যাপারটা শুধরে দিয়ে তবেই তাঁরা রোগীদের আই.ডি. হাসপাতালে বদলি করেছেন। তাহলে রোগীরা মারা গেল কী করে? এত বেশি রোগীকে অন্যান্য হাসপাতাল থেকে আই.ডি.তে আনা হয়েছিল যে, একটি বেডে তিনজন রোগীও রাখতে হচ্ছিল। অথচ আই.ডি. আসলে ছোট্ট হাসপাতাল। বেডের সংখ্যা ১৬৯; তার মধ্যে কলেরা ও আন্ত্রিকের জন্য রাখা ছিল ৭৫টি। আর ডাক্তারের সংখ্যা? মাত্র সাত। অথচ কিছুতেই বোঝা যায় না যে, সেই সময়েই লোকনায়ক হাসপাতালের মতো বড় হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডটি কেন বন্ধ করে দেওয়া হল, যেখানে ডাক্তারের সংখ্যা প্রচুর এবং ল্যাবরেটরির সুযোগ রয়েছে। আই. ডি. থেকে সামান্য মল পরীক্ষার জন্যও যেতে হয় এন. আই. সি. ডি-তে। এন. এম. জে. এস-এর প্রশ্নের জবাবে এমনকি আই. ডি-র ডাক্তাররাও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এই ধরনের সিদ্ধান্তর ব্যাপারে।

### বিশাল অর্থের অপচয়

ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রকোপ কিংবা নাগরিকদের অভিযোগ কিছুই প্রশাসনকে নড়াতে পারে না। সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার বা জঞ্জাল সাফাইয়ের মতো দৈনন্দিন কাজের জন্যও প্রয়োজন হয় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সফর। সে কাজও ঠিকমতো হয় না। দুটি পরিকল্পনার কথা জানাই—

ক. আগস্ট মাসের আট তারিখের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি ছ-কোটি টাকার ৩৪ কি.মি. রাস্তা ইঁট দিয়ে বাঁধায়। বেশ কয়েক জায়গায় এই ইঁট বিছানো হয় নোংরা ময়লা এবং জঞ্জালের ওপরই। জলে পচে সেই ময়লা এবং পোকা মাকড় লোকের ঘরে গিয়ে উঠেছে—বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। কিছু দিনের মধ্যে ইঁট অদৃশ্য হতে শুরু করে। এই হল ইঁট বাঁধানো রাস্তার বিশাল পরিকল্পনার পরিণতি।

খ. বস্তি ও রিসেটেলমেন্ট কলোনির সমস্যাগুলির সহজ সমাধান হিসেবে 'সুলভ শৌচালয়' প্রকল্প নেওয়া হচ্ছিল এই সময়। দিল্লি কর্পোরেশন এজন্য সাড়ে তেরো কোটি টাকা বরাদ্দ করে। যে কাজ নিজের করার কথা তার দায়িত্ব ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে আসলে কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট ১৯৫৭-কেই লঙ্ঘন করছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিল্লি অফিসের পিছনেই অবস্থিত আন্নানগর বস্তির লোকেরা এন. এম. জে. এস-কে জানান, "কলোনির ১২৫০ পরিবারের জন্য 'সুলভ শৌচালয়' ৩০টি পায়খানা তৈরি করে। যদিও আমরা বস্তি কমিশনারকে বলি যে ৭০০০ লোকের জন্য ৩০টি পায়খানা কিছুই নয়, তবু তিনি পায়খানার সংখ্যা বাড়াতে অস্বীকার করেন। আমরা এই পায়খানা ব্যবহার করতে যাচ্ছি না। এগুলো এমন এক কোণায় অবস্থিত যে আমাদের মহিলারা সেখানে যাওয়া নিরাপদ মনে করে না। আর আমাদের প্রত্যেক বার পায়খানায় যাওয়ার দর্শনী বাবদ কুড়ি পয়সা দেবার সামর্থ্যও নেই।"

এই হল জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির চেহারা।

### কিভাবে বাঁচেন তাঁরা

দিল্লি জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ৪৪টি রিসেটেলমেন্ট কলোনির মানুষের সংখ্যা কুড়ি লক্ষের বেশি। এই সব কলোনির ইতিহাস আর আজকের কলেরা মহামারীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে রাজনীতিকদের লিস্টে জনকল্যাণের কাজ সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।

কলেরার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ট্রান্স-যমুনা রিসেটেল্‌মেন্ট কলোনিগুলির প্রকৃত অবস্থা, আর ১৯৬১ থেকে '৮১ সালের মাস্টার প্ল্যান মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কিভাবে জেনে বুঝে প্ল্যানের নির্দেশগুলি অমান্য করা হয়েছে। যেমন : ক. অধিকাংশ কলোনিগুলিই (৭২ সাল অবধি ১৮টি এবং এমার্জেন্সির সময় আরও ১৬টি) তৈরি করা হয়েছে "বসবাসের অযোগ্য" জায়গা ও "জলাভূমির" ওপর।

খ. এখানকার ১০০০ হেক্টর জমি যমুনা নদী থেকে ১০-১২ ফুট নিচু। দিল্লি ডেভেলপমেন্ট

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

কুষ্ঠ রোগীদের এক কলোনিতে ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক কানেকশন চেয়েছিলেন রোগীরা যাতে রাতের অন্ধকারের সুযোগে বড় ইঁদুর বা শুয়োর তাঁদের অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না খেয়ে যেতে পারে। কিন্তু বস্তির বাসিন্দাদের এই অধিকার নেই! তাঁদের দাবি নাকচ করা হয়েছে। এই হল জনকল্যাণের চেহারা।

অথরিটি (ডি. ডি. এ.) ১৩ কোটি টাকা খরচ করে জমি বোজায়, যাতে গরিব লোকেদেরকে আবর্জনার মাঝে বসিয়ে দিয়ে যাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ম্যাপের সাহায্যে দেখান যে, আবর্জনা সরানো বা জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা তৈরি করা এখানে অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই আপত্তি উড়িয়ে দেওয়া হয়। নর্দমাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সমস্ত ময়লা মাটিতে মিশে যায়, আর সেই মাটি থেকেই হ্যান্ড পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হয়। এভাবেই কলেরা এসেছে জাঁকিয়ে।

গ. এছাড়া ঘন বসতির প্রশ্নটি তো আছেই।

এটা আজ পরিষ্কার যে ট্রান্স-যমুনা অঞ্চলে গরিব মানুষদের পুনর্বাসন হল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। নীচের তলার মানুষদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাবার অধিকারও স্বীকৃত নয় এই সিদ্ধান্তে।

বহু মানুষই যে পরিশ্রুত জল সরবরাহ থেকে বঞ্চিত এ-কথা ডি. ডি. এ-র এক সেমিনারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল ১৯৮১ সালেই। আর কলেরা চলাকালীনই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ দিল্লির (এম. সি. ডি) স্বাস্থ্য বিভাগ কলেরা আক্রান্ত এলাকার জল পরীক্ষা করে রায় দেন যে, নমুনাগুলির ৭৪ শতাংশই পানের অযোগ্য। ডি. ডি. এ. যে হ্যান্ডপাম্পগুলি দশ বারো ফুট গভীর স্তরে বসিয়েছিল বহু লোকই যথার্থভাবে তার নামকরণ করেছিলেন "মারণ পাম্প"।

**দায়িত্ব কার?**

এই সব রিসেটেলমেণ্ট কলোনিগুলির দায়িত্ব কার তাই নিয়ে ডি ডি. এ. আর এম. সি. ডি.-র মধ্যে চলেছে এক টানাপোড়েন। এম. সি.ডি-র ভিজিলেন্স ডাইরেক্টর এস. কে. সিং তাঁর তদন্তের ফলাফলে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, দোষ হল ডি. ডি. এ. এবং এম. সি. ডি-র। এবং তিনি ১৭ জন অফিসারকে দোষী হিসেবে দেখিয়েছেন তাঁর রিপোর্টে। মজাটা হল যে *টাইমস অফ ইন্ডিয়ায়* (২৫.৯.৮৮) প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী উপরোক্ত-রিপোর্টটি নিয়ে আরও তদন্তের জন্য একটি সাবকমিটি তৈরি করা হয়েছে যাতে অভিযুক্ত অফিসারদের কয়েকজনও রয়েছেন। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, উপর মহল কি চায়।

**সরকারি চিন্তাভাবনা**

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত সুখটঙ্কর কমিটি তার রিপোর্টে বলেছে যে মহামারীর জন্য দায়ী হল হ্যান্ড পাম্পগুলিই। আর এখন সেগুলি লাল রং করে দেওয়া হচ্ছে যাতে কেউ ওই পাম্পগুলির জল না পান করে। একই সাথে সরিয়েও ফেলা হচ্ছে পাম্পগুলিকে, যাতে অপরাধের সাক্ষ্য কিছু না থাকে। প্রশ্ন হল, বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সমাজকর্মী তথা সরকারি অফিসারদের পরামর্শে সময় মতো কান দেওয়া হল না কেন? কেনই বা এই অমানবিক আচরণ করা হল রাজধানী দিল্লির গরিব মানুষদের সাথে?

সূত্র . *'ক্রাইম গোজ আনপানিশ্‌ড'*

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

## সাইপ্রাসের গল্প

# কি ভাবে বাঁচি

আমি বেড়ে উঠেছিলাম এটা ভাবতে ভাবতেই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল বড় হওয়া আর বিয়ের মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ান। তোমাদের অনেকের ভাবনার থেকে সেটা একেবারে আলাদা হয়ত—তোমরা যারা বড় হওয়া, প্রেমে পড়া আর তারপরেই বিয়ে, এই পর্যায়ক্রমের মধ্য দিয়ে যাবে। আসলে আমার সম্বন্ধ করেই বিয়ে দেওয়া হবে। তারা আমাকে একটা লোকের সামনে নিয়ে যাবে আর আমি যদি তাকে পছন্দ করি এবং লোকটা যদি আমায় পছন্দ করে তাহলে হয়ত আমাদের পাকাদেখা হবে আর মাসদুয়েকের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে যাবে।

প্রথমবার আমাকে যখন একটা লোকের সামনে আনা হয়েছিল তখন আমার বয়স চোদ্দো বছর। আমরা একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানেই একটা লোক আর তার মা আমাকে দেখে। কিন্তু আমার মা তাদের না বলে দিয়েছিলেন আমার বয়স খুব অল্প, এই অজুহাত দিয়ে।

অন্য বিয়েটিয়ের আসরে কোন কোন সময় বিবাহযোগ্য ছেলেদের মায়েরা আমার মায়ের কাছে আসত আর বলত 'আমার একটা ভাল ছেলে আছে। তোমার মেয়ের সাথে তাকে খুব ভাল মানাবে।' এইসব কথাবার্তায় আমার কেমন একটু অসুস্থ অসুস্থ লাগত—সবকটা মা-ই তাদের ছেলেদের সাথে আমার বিয়ে দিতে চায় এই কথা ভেবে। আর একটু বেশি মেজাজ খারাপ লাগত কারণ তারা সবসময়ই আমার মায়ের সাথেই কথা বলত যদিও তারা তো আর আমার মায়ের সাথে তাদের ছেলেদের বিয়ে দিতে যাচ্ছিল না, এক্ষেত্রে পাত্রী তো আমি (আমি যদিও ওই লোকগুলোকে বিয়ে করার জন্য মুখিয়ে ছিলাম না, তবুও তারা আমার সাথে তো অন্তত কথা বলতে পারত)।

আমার ষোলো বছর পূর্ণ হওয়া অবধি ব্যাপারটা এইরকম চলল। তারপর মায়ের এক পিসতুতো ভাই আমাদের বাড়ি এল আর মায়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে চাইল। আসলে আমি জানতাম কি ঘটতে চলেছে যখন আমি শুনলাম যে এইসব কথাবার্তা চলছে আড়ালে। মা যখন কথাবার্তা সেরে এলেন এবং আমায় বললেন যে মামা কয়েকজনকে আমাদের বাড়ি আসার জন্য নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছে, আমি বললাম যে আমি কোন একটা মাথামোটা ছেলের সাথে আলাপ করতে চাই না আর বিয়ের পিঁড়িতেও বসতে চাই না

এক্ষুনি। এইভাবে যে আমি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি না তাও বললাম মাকে। জানালাম যে মার জীবনের মত কোন কিছুতেই জীবনকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবতে পারছি না আমি।

জীবনে এই প্রথমবার মা আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন আর বললেন 'তুমি কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি আমি। চিন্তা কোরো না। আমি এক্ষুণি তোমার বিয়ে দিচ্ছি না।'

দু-সপ্তাহ্ কেটে গেল। তারপর একদিন সত্যি সত্যিই দরজায় টোকা পড়ল। আমার বোন দরজা খুলে দিতে গেল আর তাদের এনে বসাল বাইরের ঘরে। তারপর রান্নাঘরে দৌড়ে এল ও। আর চাপা স্বরে বলল 'তারা এসে গেছে'। 'কে এসেছে' প্রশ্ন করলাম আমি। 'তুই জানিস না, মামা যাদের সাথে তোর সম্বন্ধ করেছে তারা।' উত্তর দিল আমার বোন।

আমি হাসতে শুরু করলাম। তখনই মা রান্নাঘরে ঢুকলেন আর বললেন 'চটপট চা বানাও, যত তাড়াতাড়ি পাট চোকে ততই মঙ্গল।' আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার যাওয়ার কোন দরকার আছে কিনা। 'তোমায় আলাদা করে কিছু করতে হবে না, চায়ের কাপগুলো একটু এগিয়ে দেবে, আর চুপ করে বসে থাকবে।' জবাব পেলাম আমি।

ভালভাবেই জানতাম সময়টা ভাল কাটবে না, তবুও চা-টা বানাতেই হল আর হাজির হতে হল বিচারকদের সামনে। চা এগিয়ে দিতে দিতে খেয়াল করলাম যে কর্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্যরা আমাকে খুঁটিয়ে দেখছে। মনে মনে ভাবলাম বাজারে গরু বিক্রি ব্যাপারটা কেমন, এখন ঠিক ঠিক আমি তা বুঝতে পারছি।' আমার নিজেকে ওই অবোধ পশুগুলোর মতই মনে হচ্ছিল। কি আর করব, বসে বসে বাক্যালাপ শুনতে লাগলাম, আর মাঝে মাঝে হাসার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটু বাদেই আমার খেয়াল হল আরে, আসল ছেলেটা কোথায়! আঃ, কেমন লাগছিল আমার, যখন আমায় জানালো হল ছেলে আর বলা চলে না ভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে, সে যথেষ্ট ধেড়ে লোক। কি ভয়ঙ্কর! আবার মাপা হচ্ছে আমায়! যখন কানে এল গিন্নিটি বলছেন 'এবার আমরা উঠি', ওঃ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন।

অনেক হাত নাড়ানাড়ি হল এবং তাঁরা বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে মহিলা আমার মাকে বললেন 'কি চমৎকার মেয়ে আপনার!' এক সপ্তাহ কেটে গেল তারপর জানতে পারলাম সেই 'ছেলেটি' আমায় বিয়ে করতে রাজি। 'কি হাঁদা', ভাবলাম আমি 'জানেই না আমি কি রকম, অথচ বিয়ে করতে তৈরি।'

আমার জবাবের জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। আমায় একটু সময় নিয়ে ভাবতে বলা হল আর আমি বললাম 'এক মুহূর্তও দরকার নেই। আমি বলে দিচ্ছি যে আমার জবাব হচ্ছে, না।' কয়েক সপ্তাহ বাদে শুনলাম লোকটা একটা মেয়েকে বিয়ে করছে যার বাবা কারখানার মালিক। 'কি খারাপ' চিন্তা করলাম আমি 'লোকটা মেয়েটা সম্পর্কে কিছুই জানে না, হয়ত ভালও বাসে না তাকে, কিন্তু বিয়ে করতে চলেছে। বলেই দেওয়া যায় মেয়েটার চেয়ে তার টাকা-পয়সাই লোকটার পছন্দ বেশি।'

এর পরের লোকটা বেশ পয়সাওয়ালা ছিল। আমার জামাইবাবু এই লোকটার কাছে

চাকরি করত। আর সে-ই আমাকে আর আমার দিদিকে এক জায়গায় খেতে নিয়ে যায়। দিদিকে বলে দেওয়া হয়েছিল আমাকে যেন একটু বিশেষভাবে সাজানো হয়, আর যেন মনে হয় আমি পূর্ণ যুবতীই। আমার দিক থেকে, বলতে গেলে, খাওয়ার জায়গাটায় পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনি। আমার জামাইবাবু একটা চারজনের জন্য সাজানো টেবিলে বসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'খাওয়া কখন শুরু হবে?' সে বলল 'একটু বাদে। আমরা একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।' তারপরই হঠাৎ জামাইবাবু দরজার দিকে প্রায় দৌড়ে গেল। যে কেউ ভাবতে পারত যে স্বয়ং সম্রাট আসছেন।

যখন আমি লোকটাকে দেখলাম, কেবলমাত্র তখনই আমি বুঝতে পারলাম কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হয়েছে। আমার খারাপ লাগতে শুরু করল, যেন আমিই ওই লোকটাকেই ধরার জন্য চেষ্টা করছি, আর সেই জন্যই এই সব খাওয়া-টাওয়ার ব্যবস্থা। অমার খাওয়ার ইচ্ছেটা পুরোপুরি উবে গেল। দিদিরও একই অবস্থা। সে বুঝতে পারছিল যে আমি অস্বস্তিতে ভুগছি। তাই-ই বোধহয় হঠাৎ বলে উঠল 'চল একটু বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে আসি'। হাত ধুতে ধুতে আমি তাকে বললাম 'তোমাদের আমায় বলা উচিত ছিল যে খেতে আসার আসল কারণ কি।' সে বলল সেও কিছুই জানত না, আর তার ধারণা আমায় যে জামাইবাবু কিছু জানায়নি তার কারণ সে জানত, জানালে আমি আসব না। আমরা যখন ফিরে এলাম, তখনও তারা বকবক করছিল। আমি খেয়াল করলাম যে, লোকটা আমায় খুঁটিয়ে দেখছে। আমি অবশ্য তার মুখটাও ভাল করে দেখিনি। আমি নিজে নিজেই মনে মনে বললাম 'বাজি ধরতে পারি যে রাস্তায়ও এর থেকে ভাল মানুষ মিলবে।'

আমরা কোলা জাতীয় কিছু একটা পান করলাম। তারপর লোকটার গাড়ি চেপে বাড়ি ফিরে এলাম। সে ভেতরে এল, আর মা তাকে এক কাপ কফি খাওয়ালেন। সব সময়টাই আমি আমার ছোট্ট বোনঝিটার সাথে খেলতে লাগলাম। যখন তার কফি খাওয়া শেষ হল তখন জামাইবাবু আমায় ডেকে তার কাপটা নিয়ে যেতে বলল। আমি শুধু কাপটা তুললাম আর ট্রের মধ্যে রাখলাম। কয়েক মিনিট বাদেই লোকটা বিদায় নিল। আমার জামাইবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করল তার সম্বন্ধে কি ভাবছি। আমি বললাম যে 'আমি এইরকম লোকদের ঘৃণা করি।' সে বলল 'তুমি বলতে চাইছ যে তুমি আগ্রহী নও? কিন্তু তার টাকা, তার গাড়ি, তার ব্যবসা এগুলো কি কিছুই নয়?' আমি বললাম, 'সে তার টাকা, গাড়ি আর সব কিছু গিলে খেতে পারে, কিন্তু যদি সে বউ কিনতে বেরোয় তবে অন্য জায়গায় খুঁজুক, কারণ আমাকে সে পাচ্ছে না।' কয়েকদিন বাদেই জানলাম আমাকে তার মনে ধরেছে। আমি বলে ফেললাম 'কেটে পড়, আমি বিক্রির জন্য নই।'

এখন আমি যখনই সম্বন্ধ করে ঘটা বিয়ের কথা শুনি কিংবা আমার কোন আত্মীয় যখন বলে তার হাতে চমৎকার একটি ছেলে আছে আমার কেমন অসুস্থ লাগতে শুরু করে। আমি বলে ফেলি আমার আর এসবের দরকার নেই।

যেহেতু আমার বাবা মারা গেছেন তাই কাকাই আমাদের অভিভাবক। যখন তিনি শুনলেন যে আমি বারো ক্লাসের পরও কলেজ ছাড়ছি না, তখন তাঁর প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল 'তুমি কি ভাল চাকরি বা আরও ভাল ডিগ্রি পাওয়ার জন্য এটা করছ?' কিন্তু

হায়, তাঁর প্রশ্নটা ছিল 'কি, ওখানে কোন ছেলে বা মাস্টার আছে নাকি, এত নিয়মিত কলেজ যাওয়া কেন?'

আমি ওদের বোঝাতে পারব না যে, আমি এই কারণে কলেজকে আঁকড়ে ধরে আছি যে আমি কলেজ ছাড়লে ওরা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। না, না, আমায় জোর করবে না। আসলে আমিই 'না' বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যাব, ফলে এক সময় আসবে যখন সামনে যেই আসবে তাকেই 'হ্যাঁ' বলে দেব। শুধুমাত্র বাড়ির বাইরে বেরোনোর তাগিদে।

কাকা বলে দিয়েছেন যেন আমি কলেজে ছেলেদের সাথে বেশি মেশামেশি না করি। কিন্তু এটা কি মানা সম্ভব? কাউকে ভাল লাগা—সেটা তুমি আটকাতে পার না শুধুমাত্র কাকার বারণের জন্য। আমি একটি বিশেষ ছেলেকে তিনমাস ধরে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু যতই চেষ্টা করি, কাকার নিষেধের কথা ততই মনে পড়ে যায়। ফল নীট শূন্য। আমার মনে আছে একটা ছেলে, যাকে আমি অনেকদিন ধরে পছন্দ করতাম, আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। সে হয়ত ভেবেছিল গোটা ব্যাপারটাই আমার অপছন্দ, কিন্তু কি করে আমি তাকে বোঝাব আমার পরিবার কেমন, আমার কাকার কথা যিনি আমায় বরাবরই নৈতিক শিক্ষা দিয়ে এসেছেন!

এখন আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। আর আমি জানি যে বন্ধুদের আড্ডায় যাওয়ার সুযোগ একেবারেই কমে গেল। কিন্তু আমি বাড়ীতে বলে যাচ্ছি যে আমি যে কোন একটা সন্ধ্যাবেলার কোর্স করতে চাই। তাহলে অন্তত আমি বেরোতে পারব। এটা বিরাট কোন সুবিধা নয়, তবে অন্তত একটু দরজা তো খুলবে।

কিছুদিন আগে একটি ছেলেকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু যেহেতু আমি কলেজ ছেড়ে দিয়েছি তাই তার সাথে দেখা হওয়ার আর কোন সুযোগ নেই, যদি না আমরা রাস্তায় মুখোমুখি পড়ে যাই। আমি এখনও তাকে ভুলতে পারি নি।

আমার আশা এই যে একদিন আমি একটি হৃদয়বান আন্তরিক ছেলে খুঁজে পাব আর কিছু একটা করে বসব। কিন্তু যতদিন তা না ঘটছে ততদিন এই মেয়ে দেখতে আসা বরাহনন্দনগুলোকে আমায় 'না' বলতেই হবে।.......

মূল রচনা : **আইসে, মারিয়া এবং জেইনেপ** [ *স্পেয়ার রিব বিড়ার, পৃ.৮৫* ]



**আমেরিকার গল্প**

# আমার একটা বউ চাই

মানুষদের বিভিন্নরকম ভাগাভাগির মধ্যে আমি বউ গোত্রে পড়ি। আমি বউ বটে, আবার মা-ও বটে, এবং সেটা শুধু ঘটনাচক্রে নয়।

খুব বেশি দিনের কথা নয় আমার এক পুরুষ বন্ধু বিবাহবিচ্ছেদের পর তরতাজা হয়ে আমাদের মাঝখানে সদ্য দেখা দিয়েছে। তার একটিই বাচ্চা, আর স্বাভাবিক নিয়মেই লোকটির পুরনো বউয়ের জিম্মাতেই তাকে রাখা হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই সে আর একটা বউ খুঁজছিল। কোন এক সন্ধ্যায় জামাকাপড় ইস্ত্রি করতে করতে আমার তার কথা মাথায় এল, আর হঠাৎই মনে হল আমারও একটা বউ থাকলে বড় ভাল হত। শুনতে চান, কেন আমার একটা বউ থাকা প্রয়োজন?

আমি ফিরে যেতে চাই ছেড়ে আসা কলেজে, যাতে করে আমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারি। নিজেরটা নিজে চালাতে পারি আর প্রয়োজনে তাদেরও সাহায্য করতে পারি যারা আমার ওপর নির্ভরশীল। আমার এমন একটা বউ চাই, যে নিজে কাজ করে আমায় কলেজে পাঠাবে। আর যখন আমি কলেজে যাচ্ছি তখন আমার এমন একটা বউ চাই, যে বাচ্চাদের দেখভাল করবে। আমার এমন বউ চাই, যে বাচ্চাদের ডাক্তার দেখানো ইত্যাদি সামলাবে (দাঁতের ডাক্তার অবধি)। আর এ ব্যাপারে আমার প্রয়োজনটাও খেয়াল রাখবে। আমার এমন একটা বউ চাই, যে ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা সেটা দেখবে। আর তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবে। আমার এমন একটা বউ চাই, যে বাচ্চাদের কাপড়-চোপড় কাচবে আর সেলাই-ফোঁড়াইও করবে।

আমার এমন একটা বউ চাই, যে আমার ছেলেমেয়েদের ভাল প্রতিপালনকারী পরিচারিকা হবে, যে তাদের ইস্কুলের ব্যাপারটা গুছিয়ে ঠিক করবে, এটা দেখবে যে ছেলেমেয়েরা যেন তাদের সাথীদের সাথে যথাযথ সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে পারে। যে তাদের পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবে, চিড়িখানায় বেড়াতে নিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার এমন বউ চাই, যে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দেখাশোনা করবে, এমন বউ যে বাচ্চাদের বিশেষ প্রয়োজনের সময় পাশেপাশেই থাকবে। কারণ, আমি তো আর কলেজে ক্লাস কামাই করতে পারি না। আমার বউয়ের কাজে যেতে দেরি হতেই পারে তবে চাকরি না চলে যায় সেদিকে তাকে নজর রাখতে হবে। সময়ে সময়ে তার মাইনে কাটা যেতেই পারে, তবে আমার মনে হয় আমি তা মানিয়ে নিয়ে পারব। বলাই বাহুল্য যে আমার বউ যখন চাকরি করে তখন সেই-ই বাচ্চাদের দেখাশোনা করার ব্যাপারটা সামলাবে, পয়সাকড়ির ব্যাপারটা সমেতই।

আমার এমন একটা বউ চাই যে আমারই, শুধু আমারই দৈহিক চাহিদার দিকে খেয়াল রাখবে। আমার এমন একটা বউ চাই, যে আমার ঘর-দোর তক-তকে করে রাখবে। এমন বউ যে আমার ঠিক পিছনে পিছনে থাকবে। আমার এমন একটা বউ চাই, যে আমার জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, ইস্ত্রি করবে, সেলাই করবে, প্রয়োজনে নতুন কিনে আনবে আর খেয়াল রাখবে যেন আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র ঠিক ঠিক জায়গায় থাকে, যাতে আমি ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তেই তা খুঁজে পাই। আমার এমন একটা বউ চাই, যে আমার জন্য রান্নাবাড়া করবে। আসলে তাকে ভাল রাঁধুনি হতে হবে। আমার এমন একটা বউ চাই, যে কি কি রান্না হবে তা ঠিক করবে, সেই অনুযায়ী বাজার করে আনবে, খাবারগুলো তৈরি করবে, সুন্দরভাবে সেগুলো পরিবেশন করবে, আর আমি যখন পড়াশুনা করব তখন ধোয়া-মোছার কাজটাও সেরে ফেলবে। আমার এমন একটা

বউ চাই, যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার দেখাশোনা করবে, আমার যন্ত্রণায় 'আহা-উহু' করবে, আমার কলেজ কামাইয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করবে। আমি এমন একটা বউ চাই, যে যখন আমি ছুটিতে পরিবারের অন্যান্যদের সাথে বেড়াতে যাব তখন এইসব ব্যাপার-স্যাপারগুলো চালিয়ে যাবে যাতে করে আমার আর বাচ্চা-বাচ্চাদের সুবিধা হয়। এটা তো ঠিক যে আমারও একটু বিশ্রাম আর হাওয়া বদল প্রয়োজন।

আমার এমন একটা বউ চাই, যে, বউয়ের ক্ষেত্রে আমার দায়িত্বের প্রসঙ্গে অসংলগ্ন অভিযোগ করে আমায় বিরক্ত করবে না। তবে এটা আমি চাই যে লেখাপড়ার জগত থেকে যে সব বিষয় আমার আলোচনা করতে ভাল লাগে সে ব্যাপারে আমার বউ আমার কথাবার্তার ভাল শ্রোতা হোক। আর আমি এটাও চাই যে আমার লেখাপত্র পরিষ্কার করে কপি করে দেওয়ার কাজটাও আমার বউই করুক।

আমার এমন একটা বউ চাই, যে আমার সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটির খোঁজ রাখবে। যখন আমার বন্ধুরা আমাকে আর আমার বউকে নিমন্ত্রণ করবে তখন আমার বউই ঠিক করবে ঐ সময়টুকুর জন্য বাচ্চাদের দেখাশোনা কে করবে। বাইরের জগতে আলাপ হওয়া যে সব লোককে আমার পছন্দ হবে, আমি চাইব বাড়িতে তাদের আপ্যায়িত করতে। এ ব্যাপারে আমি চাইব এমন বউ, যে ঘর-দোর ঝকঝকে করে রাখবে, এই উপলক্ষ্যে কিছু ভালমন্দ রাঁধবে, খাবার টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে বেড়ে দেবে আর যখন আমি আমার বন্ধুদের সামনে আমার জানাবোঝা বিষয় নিয়ে কিছু বলব তখন কথার মাঝে কিছু বলে বসবে না। আমার এমন একটা বউ চাই, যে অতিথিরা আসার আগেই বাচ্চাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাদের শুতে পাঠানোর জন্য তৈরি রাখবে যাতে তারা বড়দের কথাবার্তার মাঝে ঝামেলা না করতে পারে।

আর আমি এটাও চাই যে, আমার বউ যে হবে সে বুঝবে যে, কখনও কখনও আমারও একটা-আধটা রাত বাইরে কাটাতে হতে পারে।

আমার এমন একটা বউ চাই, যে অনুভূতিপ্রবণ হবে আমার শারীরিক আনন্দের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে, এমন বউ, যে ভালবাসবে আবেগে ভরপুর হয়ে। আর যখনই আমার প্রয়োজন সে তৈরি থাকবে। এমন বউ, যে বুঝে নেবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি কি না। আর অবশ্যই এটা বলে দিতে হবে না যে, আমার বউ নিশ্চয়ই এসব ব্যাপারে আমায় বিরক্ত করবে না, যখন আমি ক্লান্ত বা আমার কিছু ভাল লাগছে না। আর বাচ্চা-টাচ্চা যাতে না হয় সেটাও তাকেই খেয়াল রাখতে হবে, কারণ আমি আর বাচ্চা চাই না। আমি এমন একটা বউ চাই, যে অন্য কোন পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হবে না। আমি সত্যিই আমার মননগত গভীর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ঈর্ষাকে ঢুকতে দিয়ে সব পণ্ড করতে দিতে পারি না। আর আমি এমন একটা বউ চাই, যে বুঝবে যে আমার শারীরিক চাহিদা আমায় একজনের প্রতি অখণ্ড মনোযোগের বাইরেও নিয়ে যেতে পারে। যাই হোক না কেন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হবার ব্যাপারে আমার নিশ্চয়ই যত দূর সম্ভব যেতে হবে।

যদি ঘটনাচক্রে এমন কোন মহিলাকে আমি খুঁজে পাই যে বউ হিসেবে আমার বর্তমান বউয়ের থেকেও বেশি উপযুক্ত, তবে আমার এ স্বাধীনতা চাই যাতে আমি আমার বর্তমান

বউটিকে বদলে ফেলতে পারি। স্বাভাবিকভাবেই আমি আশা করব একটি পরিচ্ছন্ন নতুন জীবন। আর বউয়ের ভাগে পড়বে বাচ্চারা আর সেই-ই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে তাদের, যাতে আমি মুক্ত থাকতে পারি।

যখন আমি কলেজের পাট চুকিয়ে ফেলব আর চাকরি করব তখন আমি চাইব যে, আমার বউ কাজ ছেড়ে দিক আর ঘরেই থাকুক যাতে সে আরও ভাল করে বউয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

হে আমার ঈশ্বর, এমন কে আছে যে একটা বউ চাইবে না?

মূল রচনা **জুডি সীফার্স** [ *ইন কন্‌ফ্লিক্ট অ্যান্ড অর্ডার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোসাইটি*, পৃ. ৩৫২-৫৬। ]



# আনা উইকহ্যাম আর তার কবিতা

[ .....আমার স্বামীর চোখে কবিতা লেখার ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল ঠিক যেন মানসিক ভ্রষ্টাচার, যা তার ঈর্ষা সহ্য করতে পারত না .... ]

**জেন এবং একটি উভয়সঙ্কট**

সেই ভদ্রলোক যাঁকে আমি বিয়ে করেছিলাম,
বলেন আমিই ধ্বংস করেছি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি
তাঁকে বিয়ে করে।
সেই ভদ্রলোক যাঁকে আমি বিয়ে করিনি,
বলেন আমিই ধ্বংস করেছি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি
তাঁকে বিয়ে না করে।
আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এই দুই ভদ্রলোকের
একজনেরও বুদ্ধি বলে কিছু ছিল কি।
আমি অবাক হয়ে ভাবি বিয়ে কি
বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কোন ব্যাপার।
কিন্তু এখন আমি ধার করব একটি পুস্তক
একজন হিজড়ের কাছ থেকে।
আমি আগ্রহী হতে শুরু করেছি
আমার নিজেরই বুদ্ধির প্রশ্নে।

মূল রচনা **নাওমি লুইস** [ *স্পেয়ার রিব রিডার* ]

## কবিতা

মেয়েটি ছিল ঘুমিয়ে, আমি ছিলাম জেগে।
স্বপ্ন দেখল সে ঘুমের মাঝে, দাঁড়িয়ে আছেন
জীবনদেবী সামনে তার, তাঁর দুই হাতে দুই
উপহার—এক হাতে প্রেম, অন্যটিতে
স্বাধীনতা। আর দেবী বলিলেন তাকে "বল
কোনটি লইবে?" আর সে অনেকক্ষণ
অপেক্ষা করে বলল 'স্বাধীনতা!'
আর দেবী কহিলেন "তুমি ঠিকই
বলিয়াছ, যদি তুমি বলিতে 'প্রেম',
তবে আমি তোমায় তাহাই প্রদান
করিতাম আর আমি তোমায়
ছাড়িয়া যাইতাম, আর তোমার নিকট
কখনই ফিরিয়া আসিতাম না। এখন
সেই দিন প্রত্যাসন্ন, যখন আমি
ফিরিয়া আসিব। সেই দিন দুইটি
উপহারই তুমি এক হাতে পাইবে।"
আমি শুনতে পেলাম ঘুমের
মধ্যে মেয়েটি হাসছে।

মূল রচনা : **অলিভ শ্রেইনার** [ *স্পেয়ার রিব রিডার* ]



### অনুবাদকের কথা

কয়েকদিন আগে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম একটি পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার। পত্রিকাটি সমাজ-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে লিখে থাকে। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি প্রবন্ধের ওপর বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের সমস্যা'। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই বুঝতে পারলাম যে লেখাটি একজন বিশেষজ্ঞর, এবং প্রবন্ধটি মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার সময়টার যে শারীরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছে যে এই সময়ে যে সব শারীরিক, মানসিক ও কিয়দংশে সামাজিক সমস্যায় মেয়েদের ভুগতে হয় তার কারণগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে। ভুলেই যাচ্ছিলাম প্রায় লেখাটির কথা, কারণ খবরের কাগজ থেকে সিনেমার হোর্ডিং

অবধি সব কিছুতেই চোখ বুলিয়ে একটু পরেই ভুলে যাওয়াটা আমাদের অর্থাৎ মেট্রোপলিসের নাগরিকদের কাছে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কোথাও একটা অস্বস্তি রয়ে যাচ্ছিল ঐ লেখাটির ব্যাপারে, যাকে ঠিক ছোঁওয়া যাচ্ছিল না।

অন্যমনস্কভাবে চায়ের দোকান, আড্ডা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে শীতের লোকজন, হঠাৎই মনে পড়ল অস্বস্তির কারণটি কিছুদিন আগে পড়া একটি বইতে মহিলাদের নানান শারীরিক-মানসিক সমস্যা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সতেজে ঘোষণা করেছিলেন এক মহিলা যে এইসব সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাপ্রোচ করি তাতে মস্ত এক গলদ আছে। যখন কোন বিশেষজ্ঞ এই সব অনুভূতি-সম্পর্ক ভিত্তিক জটিল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ান, তখন তিনি সব উত্তর খুঁজতে যান শারীরবৃত্তীয় টেকনিক্যাল কাঠামোয়। এক্ষেত্রে আবেগবর্জিতভাবে সমস্যাটিকে দেখে জীবনকে একটি বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আর এই বিশেষজ্ঞদের জগতটাই হল পুরুষ বিশেষজ্ঞদের জগত। এর বদলে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তৈরি ডাক্তার-রোগীর যৌথ অনুসন্ধানের এক বিকল্প নারীবাদী পদ্ধতির কথা বলেছিলেন লেখিকা।

আসলে প্রথমে বর্ণিত প্রবন্ধটি পড়ে আমার দ্বিতীয়টির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল এবং হ্যাঁ, প্রথম প্রবন্ধটি একজন পুরুষেরই লেখা।

আপনি ভাবতে পারেন যে কিছু অনুবাদকর্মের মুখবন্ধ হিসেব এসব প্রসঙ্গর অবতারণা কেন? আসলে আমিও দ্বিধাগ্রস্ত। যে লেখাগুলি এখানে জড়ো করা হয়েছে তাদের অবশ্যই এক বিশেষ চরিত্র আছে। অনুবাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব তেমন কিছু নয়, যাঁদের কথা তাঁরা বলবেন, আমি শুধু ভাষান্তর ঘটিয়েছি মাত্র। কিন্তু তাও বলে ফেলা ভাল যে, এই লেখাগুলির মানুষেরা ও আমি—আমরা এক অর্থে আলাদা এবং সেটা প্রথম অংশে আলোচিত অর্থেই। আসলে যত অল্প মাত্রাতেই হোক এটাও অনধিকার চর্চা দেখাতে পারে, তাই এই কুণ্ঠা।

তবে পুরুষদের মধ্যে ভীরু, পিছিয়ে পড়া অংশের একজন হিসেবে বলতে পারি যে, সীমান্তের ওপারে ছবিটা কেমন তা জানা আমার নিজের অস্তিত্বর স্বার্থে প্রাসঙ্গিক। আর আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি আমার বেশি মনোযোগ কোথায় নিবদ্ধ করতে চাই, তবে অবশ্যই আমি বলব তা হল একান্তভাবেই পুরুষদের নানান মানসিক-সামাজিক সমস্যা যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত সমস্যা বা বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রেই।

*অদ্রোহ, বইমেলা ১৯৮৯*

# প্রসঙ্গ : সলঝেনিৎসিন

সলঝেনিৎসিন সেই পুরস্কারেরই যোগ্য যার জন্য সে প্রবল উৎসাহ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে— এক বিশ্বাসঘাতকের যা পরিণতি, যার থেকে ক্রোধে আর নিদারুণ বিরক্তিতে মুখ না ঘুরিয়ে পারবে না সমস্ত সোভিয়েত শ্রমজীবী মানুষ তথা বিশ্বের প্রত্যেকটি সৎ লোক।

—*প্রাভদা,* ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৪

সুপ্রীম সোভিয়েত, ইউ এস এস আর-এর এক ডিক্রির বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ক্ষতিকারক তথা সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকত্বের পক্ষে অসঙ্গত এমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কাজকর্মের জন্য এ আই সলঝেনিৎসিনকে ইউ এস এস আরের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

—*প্রাভদা,* ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

যখন সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য ব্যবহার করে তার নিজের সঙ্গতি তার সত্যিকারের চরিত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য, ফিরে পায় আজকের দিনের বিশাল সমস্যার সামনে দাঁড়ানোর জন্য তার শৈল্পিক দায়িত্বের বোধ, তখন আজকের নীরব শক্তিগুলি কাজ শুরু করতে পারে, জুড়তে পারে নিজেদের ওজন এই পরিবর্তনের পক্ষে। স্তালিন যুগের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা থেকে এক মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার অর্থে এই রূপান্তর ও পুনঃসৃষ্টির পথে সলঝেনিৎসিন হলেন এক আলোকসঙ্কেত যা আলোকিত করছে ভবিষ্যতের পথকে।

—গেওর্গ লুকাচ, *পলিটিক হেরডো,* ১৫-২১ অক্টোবর ১৯৭০

অসত্য আমাদের সাথেই শুরু হয় নি, না তো তা আমাদের সাথেই শেষ হবে।

—সলঝেনিৎসিন, আগস্ট ১৯১৪

সলঝেনিৎসিনের নাম কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ভাল করে প্রথম শোনা যায় তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে। প্রথম ১৯৭০ সাল নাগাদ। মূলত তাঁর পরিচয় হয়েছিল *গুলগা দ্বীপপুঞ্জ* বইয়ের জন্যই। এই বইটি ছাড়া ওই সময়েই তাঁর *প্রথম বৃত্ত* বইটিও বাংলায় অনূদিত হয়। বিতর্কিত লেখক সলঝেনিৎসিনের প্রথম পরিচয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র বিরোধী লেখক হিসেবেই। ত্রিশের দশক থেকে যে তথাকথিত সোভিয়েত বন্দিশিবিরের কথা আভাসে ইঙ্গিতে শোনা যেত তার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই হল *গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ*। সমস্যা হল বহু বছর ধরে আমাদের দেশের বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পীরা বলে আসেন যে আসলে এই সব বন্দিশিবিরের অস্তিত্ব নেই, এ সম্পর্কিত তথ্যাদি আসলে সোভিয়েত বিরোধী দেশগুলির রটনা, মিথ্যা প্রচার, তাই সলঝেনিৎসিনও আসলে লেখকই নন, উনি হলেন সোভিয়েত বিরোধী চক্রগুলির এক ভাড়াটে প্রচারক। কমিউনিস্ট বিদ্বেষী।

কোন সিরিয়াস চর্চা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তগুলি কিন্তু প্রায় দাঁড়িয়ে যায়। এবং এই মুহূর্তে যেহেতু সলঝেনিৎসিন পাদপ্রদীপের আলো থেকে অনেকটা সরে গেছেন তাই হয়ত আরও বেশি করেই একটি জটিল ঘটনার সরলীকৃত ব্যাখ্যাটি হয়ে উঠবে ধ্রুবসত্য। সেই প্রাসঙ্গিকতায় কিছু লেখা এখন প্রয়োজনীয়ও বটে।

সলঝেনিৎসিন কিন্তু সোভিয়েত বন্দিশিবির নিয়ে লেখা *গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ* দিয়ে শুরু করেন নি। খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল যে, ১৯৫৭ সালে খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন'। *নোভিমির পত্রিকায়* এই ছোট্ট মাপের উপন্যাসটি ছিল এক অর্থে পথপ্রদর্শক এবং দ্রুতই তা জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠে। ক্রুশ্চেভ শিবিরের সাথে প্রাচীনপন্থীদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি স্তরেই কেবলমাত্র সম্ভব হয় এই উপন্যাসটির প্রকাশ। *নোভিমির* পত্রিকার সম্পাদক ভার্দোভসিচ খোদ ক্রুশ্চেভের ব্যক্তিগত অনুমতিসহই উপন্যাসটি ছাপেন। কিন্তু ভাদোভস্কির জীবনব্যাপী সাহায্য সত্ত্বেও দ্রুত সোভিয়েত আমলাতন্ত্রের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন সলঝেনিৎসিন। তাঁর লেখাগুলিতে বিপ্লোবত্তর রাশিয়ার কেবল অন্ধকার দিকগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য। তাঁর অল্প কয়েকটি গল্প ছাড়া রাশিয়ার সরকারি পত্রিকায় আর কিছুই ছাপা হয় নি। ক্যান্সার ওয়ার্ড, অগস্ট ১৯১৪ বা পূর্বোক্ত উপন্যাস প্রথম বৃত্ত এসবই প্রচারিত হয়।

আলোচনা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার কিন্তু এসেই যায়। তা হল সোভিয়েত বন্দিশিবিরের অস্তিত্ব আজ ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করা সত্যিই অসুবিধাজনক। তাঁর লেখা উপন্যাস স্তালিনযুগের বন্দিশিবির সংক্রান্ত ক্রুশ্চেভ গোষ্ঠী অনুমোদন করেছিলেন ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে যখন ক্ষমতার লড়াইয়ে তা প্রকাশিত হওয়া তাঁদের পক্ষে জরুরি ছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভ এ-কথাও বলেছিলেন যে, নোংরা কাপড় তিনি বাইরের লোকের সামনে ধুতে চান না। ক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়ার পর স্তালিনোত্তর সোভিয়েত শাসক গোষ্ঠী আর এই ধরণের লেখা-পত্র অনুমোদন করতে চাইলেন না। উল্টে যাঁরা তা করতে চাইলেন তাঁদের ওপর নেমে এল প্রশাসনিক খড়্গ। ৬০ এর দশকেই বিক্ষুব্ধদের সাথে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ হয়ে ওঠে ব্যাপক। আর সলঝেনিৎসিন এসে পড়েন এই ঘটনাবলির চরিত্র হিসেবে।

আলেকজান্ডার ইসাইয়েভিচ সলঝেনিৎসিন জন্ম গ্রহণ করেন ১৯১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ককেসাসের কিসলোভোদস্কে। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবা এক দুর্ঘটনায় মারা যান। ছবছর বয়সে তিনি তাঁর মার সঙ্গে চলে আসেন রোস্তভ অন্ ডন। তাঁর মা কাজ করতেন টাইপিস্টের। খুবই সাধারণ এই পরিবারের সন্তান সলিঝেনিৎসিন রোস্তভ বিশ্ববিদালয়ে পড়েন গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে এবং স্তালিন স্কলারশিপ পান উচ্চশিক্ষার জন্য। এ হল এক অদ্ভুত ঘটনা যে, তাঁর জীবনের বড় কাজই হল স্তালিন যুগের অন্ধকারময় জগতের ছবি আঁকা। ১৯৪১ সালে তিনি মস্কো ইনস্টিটিউট অফ ফিলোসফিতে , লিটেরেচার অ্যান্ড হিস্টরির এক করসপন্ডেন্স পাঠক্রম শেষ করেন এবং রোস্তভ মাধ্যমিক স্কুলে গণিত শিক্ষকের চাকরি নেন। এর মধ্যেই তিনি বিয়ে করে ফেলেন তাঁর সহপাঠিনী নাতালিয়া রেসেতোভস্কায়াকে। এই সময় *নামিয়া* পত্রিকায় পাঠানো তাঁর লেখা বাতিল হয়ে ফিরে আসে। বাতিল করেন ত্রিশের দশকে খ্যাতিমান লেখক কনস্তানতিন ফেদিন। ঘটনাচক্রে

যিনি বহুবছর বাদে বাধা দেন নোভিমির পত্রিকায় ক্যান্সার ওয়ার্ড প্রকাশেরও।

এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ে। গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার হিসেবে সলজেনিৎসিন দু দুবার পুরস্কৃত হন। এবং তাঁকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে এক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে স্তালিনের সমালোচনা করার অভিযোগে এশিয়ার রণক্ষেত্র থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মস্কোর কুখ্যাত কারাগার লুবিয়াঙ্কা থেকে কারাগান্ডার কারলাগ শ্রমশিবির পর্যন্ত তিনি অন্তরীণ থাকেন ১৯৫৩ সাল অবধি। এরপরও তিনি মুক্তি পান না, আভ্যন্তরীণ নির্বাসনে তাঁকে দক্ষিণ কাজাখস্তানে নির্বাসিত করা হয়। এইখানেই তিনি পেটের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং তাসখন্দ চিকিৎসিত হন। ১৯৫৬ সালে তাঁর ওপর থেকে নির্বাসনের খড়গ তুলে নেওয়া হয় এবং এক বছর বাদে সরকারি ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে তাঁকে ভুলভাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১১ বছর নরকযন্ত্রণা, যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে তা শেষ হবার পর তিনি রিয়াজান শহরে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে বসবাস শুরু করেন।

*গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ* সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিক্ষুব্ধ মার্কসবাদী রাশিয়ান বুদ্ধিজীবী রয় মেডভেডভ সলঝেনিৎনিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অন্ধকারে আবৃত রাখা ঘটনার আবরণ উন্মোচন করার জন্য। তারপর অবশ্য তিনি একথাও লিখেছেন যে কমিউনিস্টরা আছেন তা দেখতে পান নি, বা দেখাতে চান নি। সলঝেনিৎসিন সম্পর্কে এই মতামত প্রনিধানযোগ্য। মনে হয় যে, বিনা দোষে ১১ বছর কারাবাস এবং এই জীবনের মধ্য দিয়ে অসখ্যে মানুষের উপর নিপীড়ন দেখা তাঁকে সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট বিরোধী করে তুলেছিল। তাও কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সংঘর্ষে যেতে চাননি কিন্তু তাঁর লেখক সত্তায় যে আঘাত লেগেছিল উপন্যাস প্রকাশ না করতে দেওয়ার মধ্য দিয়ে মিথ্যা কুৎসা রটনার মধ্য দিয়ে, সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তা তাঁকে তাঁর দেশের শাসনব্যবস্থার সম্পর্কে এত তিক্ত করে দিয়েছিল যে তিনি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে অন্য কিছু দেখতে পান নি। ক্রমশই ঝুঁকেছেন ঈশ্বরের দিকে, একজন বিশ্বাসী গ্রীক অর্থডক্স চার্চ ভুক্ত ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে। মিথ্যাচার আর অন্যায়কে এক করে দেখেছেন নাস্তিকতার সাথে, যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়ে উঠেছে সততার বোধের এক মূর্ত প্রকাশ। সলঝেনিৎসিন হচ্ছেন আমাদের যুগের এক বিতর্কিত রাশিয়ান লেখক। চেকভ, দস্তয়েভস্কি, আর তলস্তয়ের ধারা বেয়েই তিনি খুবই রাশিয়ান। তাই বোধহয় রাশিয়ান বাস্তবতার বাইরে তিনি সুবিধা করতে পারেন না। তিনি পশ্চিমী সভ্যতার দুরাচার, সংগঠিত চার্চের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ দেখতে পান নি ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার জন্য। তাঁর মনে হতে পারে হয়ত তাঁর না দেখা জগতই অনেক সুসম, অনেক বিকশিত। নিজের জগতের সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সস্তা উজ্জ্বলতা আর হালকা আশাবাদ তাঁর সাহিত্যে আছে। আছে এক গভীর ট্র্যাজিক মানবতাবোধ যা তাঁর লেখায় যোগ করেছে এক বিশেষ মাত্রা। *প্রথম বৃত্ত* উপন্যাসে বন্দী নেরঝিন যখন নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্নেল মেজর সিকিনের কাছ থেকে প্রায় কেড়ে আনে তার স্ত্রীর উপহার, প্রিয় কবি সের্গেই ইয়েসেনিনের কবিতায় বই, কিম্বা *আগস্ট—১৯১৪* উপন্যাসে তরুণ কর্নেল ভরোটিন্টসেভ যখন সেনাবাহিনীতে নিজের ভর্বিষ্যতের মায়া না করে তীব্র আবেগ মিশ্রিত গলায় সেনাপতিদের দেখিয়ে দেয় ৯০,০০০ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁরাই।

# সবুজ আন্দোলনের পরিবেশ ভাবনা

**গোড়ার কথা : "ডী গ্রুনেন" পরিচিতি**

পশ্চিম জার্মানির গ্রীনস্‌দের বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই লক্ষ্য করতে হয় সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার, যার মধ্য দিয়ে বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে স্থিতাবস্থা ভাঙা তথা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার নানান সুর। মননের জগতেও যে নতুন বিশ্ববীক্ষা এগিয়ে এসেছে সর্বাত্মক (holistic) এক ইকোলজি-ভিত্তিক চিন্তা ভাবনাকে পাথেয় করে তার প্রভাবও এক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। দলভিত্তিক প্রাচীনগন্ধী রাজনীতির জগতে এ হল এক অন্য হাওয়ার ঝলক, এক নতুন বসন্তের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানিকে এক স্বচ্ছল রাষ্ট্রে পরিণত করার মূলত শিল্পভিত্তিক, ধনতান্ত্রিক যে মডেলটি উৎপাদননির্ভর কাঠামোর ওপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল তা প্রথম ধাক্কা খায় ৬০-এর দশকের ছাত্র যুব আন্দোলনে। নাৎসীর অতীত যাঁরা দেখেননি মূলত সেই প্রজন্মগুলিই ওই সময়ে মুখর হয়ে ওঠেন নিয়মতান্ত্রিকতাসর্বস্ব জার্মান রাষ্ট্র তথা সমাজজীবনের নানান ফাঁক-ফোকরের প্রশ্নে। আর এসবের মধ্য দিয়েই উঠে আসে জার্মান এস. ডি. এস; পরিবর্তনমুখী এক ছাত্রসংগঠন। ১৯৬৬-৬৭ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় জার্মান জনজীবনে নিয়ে আসে দশ লক্ষ বেকার, উন্নয়নে বিশাল ভাঁটা। কয়লা, ইস্পাতের মতো শিল্পেও দেখা যায় কাঠামোগত বিপর্যয়। সমাজের নানা অংশে পরিবার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারখানাতে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসে থাকা পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকানুন মুখোমুখি হয় অবাধ্যতার, চ্যালেঞ্জের।

৬০-এর দশকের শেষদিকেই এই বিশাল ছাত্র-যুব বিদ্রোহ বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং ভেঙে পড়তে শুরু করে। নানান মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা। কিন্তু চিন্তা এবং কাজের জগতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তার ছাপ থেকে যায় বরাবরের জন্য। আর তা ধারণ করার জন্য আসতে শুরু করে আরেক ধাঁচের সংগঠন, যাকে পশ্চিম জার্মানিতে বলা হয় 'নাগরিকদের উদ্যোগ'। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল অবধি নানান দিকে ছড়ানো এইসব উদ্যোগগুলি তৈরি করে নিজেদের মধ্যে এক যোগসূত্র। আর '৭৭ সালের পরে তা চেহারা নেয় এক গণ আন্দোলনের। ৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই এই সব মানুষেরা লক্ষ্য করতে শুরু করেন যে বাতাস জল বা মাটি দূষিত হচ্ছে প্রবলভাবে, অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, চাষযোগ্য জমি হয়ে উঠছে বন্ধ্যা, নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রগুলি বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের জন্য

মানুষের সামনে চরম বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে থাকে উন্নয়নের সমস্ত দিকগুলি ঘিরেই। সত্তরের দশকের শেষদিকেই বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও নাগরিক আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সাথে যৌথ কাজকর্ম শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ওই গোষ্ঠীগুলির মহিলা কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। নারী আন্দোলন, ছাত্র-যুব বিক্ষোভ, নাগরিক আন্দোলন এবং আত্মিকতা তথা ব্যক্তিমানস উন্নতিকরণ আন্দোলনের পাশাপাশি এই সময়ে আরো একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। তা হল 'বিকল্প গড়ে তোলার আন্দোলন'। যথোচিত প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি ব্যবস্থা, জৈব কৃষি ও সামগ্রিকতাবাদী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এরই নানান দিক। আর এইসব প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হয় শান্তি আন্দোলন ও পরিবেশ আন্দোলন। এদের সবার দার্শনিক ভিত্তিই হল 'ইকোলজি' (Ecology)। আমরা একটু পরেই দেখব গ্রীনস্‌রা ইকোলজি বলতে ঠিক কী বোঝেন, কী ভাবেই বা এটা তার বৈজ্ঞানিক চিন্তাবৃত্তি ছেড়ে বেরিয়ে এসে মানবতাবাদী সমাজদর্শনের প্রতিষ্ঠাভূমি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শেষ পর্য্যন্ত।

গ্রীনস্‌রা কী ধরনের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছেন সে প্রসঙ্গে ডিয়েটার রুখ্‌টের মতে, প্রথম পর্যায়ে ইকোলজি আন্দোলনের পিছনে ছিলেন, (১) স্বঘোষিত সংরক্ষণবাদী রোমান্টিকরা, (২) ইকোলজিভিত্তিক দর্শনে বিশ্বাসীরা যাঁরা সমাজতন্ত্র বা ধনতন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ইকোলজিভিত্তিক একধরনের সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (৩) সংস্কারপন্থীরা, এঁদের মধ্যে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত নানা মানুষেরা, (৪) গণতন্ত্রবাদী সমাজতন্ত্রীরা যাঁরা সমাজ পরিবর্তনে দায়বদ্ধ, (৫) ধনতন্ত্র বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ততাবাদীরা যাঁরা মুক্তিবাদী নানান ধ্যানধারণা থেকে এসেছেন, এবং (৬) ভেঙে যাওয়া কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর মানুষেরা। এর পাশাপাশি শান্তি আন্দোলনে তথা নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরাও রয়েছেন এতে।

এত বিভিন্ন মত ও পথের মানুষদের একজায়গায় থাকার প্রশ্নটি স্বভাবতই যথেষ্ট কৌতূহল জাগায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৭৮ সাল থেকে যখন প্রথম কিছু কিছু বিকল্প ধারণা নিয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হবার চেষ্টা করছিলেন তখন থেকেই নানান প্রশ্নে এঁদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। এরপর ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্ট কনভেনশন। এখানেই প্রথম পূর্বোক্ত গোষ্ঠীগুলি 'অ্যাকশন থার্ড ওয়ে' ও 'ফ্রি ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি' নামক আরও দুটি গোষ্ঠীর সাথে তৈরি করেন, 'ফারদার পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন—দ্য গ্রীনস্‌'। এর প্রথম সাংবিধানিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে, কার্লশ্রুহে'তে। আর নানান তীব্র মতামতের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আলোচনা গড়ায় মার্চ মাসে সারব্রুকেন সম্মিলন অবধি। এখানেই প্রথম ফেডারেল কর্মসূচীটি পেশ করা হয় যদিও শেষ অবধি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীটি গৃহীত হয় জানুয়ারি ১৯৮৩-তে আয়োজিত সিনডেল-ফিনগেন অধিবেশনে। এত জটিলতা ও মতবিরোধ সত্ত্বেও গ্রীনস্‌দের একত্রিত থাকার পিছনে রয়েছে তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক আচার আচরণ সম্পর্কিত এক সচেতনতার বোধ। মানবজীবন তথা প্রকৃতির ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁরা অনুভব করছেন, বোধের প্রেরণা থেকেই।

## জার্মান গ্রীনস্‌দের সবুজ রাজনীতি

প্রতিষ্ঠিত সব রাজনৈতিক দলগুলোর বিকল্প গ্রীনস্‌রা। বহুমুখী ছোট ছেট বিকল্প দল ও মানুষের সংহতির মধ্য দিয়েই গ্রীনস্‌রা গড়ে উঠছে। জীব জগৎকে রক্ষা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার আন্দোলন, মানবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সংগ্রাম, শান্তি আন্দোলন, নারী স্বাধীনতার জন্য লড়াই, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার লেগেছে বিশ্ব জুড়ে, গ্রীনস্‌রা তার প্রতিটি অংশের সাথেই একাত্মতা অনুভব করে।

সব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলই মনে করে এই পরিমিত বিশ্বে যেন অপরিমিত শিল্প-উৎপাদন সম্ভব। ক্রমশ তারা আমাদের ঠেলে দিচ্ছে এক আশাহীন বেছে নেওয়ার প্রশ্নে—পরমাণু রাষ্ট্র না পরমাণু যুদ্ধ—হ্যারিসবার্গ না হিরোসিমা? পৃথিবী জুড়ে ইকোলজি-র সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে। খনিজ সম্পদ ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতিসমূহ বিলুপ্ত হতে চলেছে, সাগরের জলও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, নদী-নালা নর্দমায় পরিণত হচ্ছে এবং আধুনিক শিল্প-ভিত্তিক সমাজের মধ্য গগনেই মানুষ ক্রমশ মানসিক ও আত্মিক দারিদ্রতায় ডুবছে। আগামী প্রজন্মকে আমরা উপহার দিতে চলেছি এক মারাত্মক উত্তরাধিকার।

জীবন এবং কর্মের ভিত্তিটাকেই ধ্বংস করে দেওয়া এবং মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কেড়ে নেওয়ার মাত্রাটা এখন এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতির মৌলিক বিকল্প খুঁজে বের করাটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এ কারণেই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক নাগরিক আন্দোলনগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অঙ্কুরিত হচ্ছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপনের বিরোধিতা করে হাজার হাজার মানুষ এখন সক্রিয় লড়াইয়ের ময়দানে। কারণ এটা এখন প্রমাণিত যে পারমাণবিক কাজ-কর্মের ঝুঁকি কৌশলে এড়ানো অসম্ভব। প্রকৃতিকে ধ্বংস করা এবং গ্রাম-জীবনের উপরে শহর-জীবনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধতা করেও বিভিন্ন নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। সব মিলিয়ে যে কার্যকারণ সম্পর্কগুলোর জন্য সমাজটা ক্রমশ দূষিত হয়ে উঠছে, সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য মানবিক আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

অদূরদর্শী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের কথা এখনই ভাবতে হবে। গ্রীনস্‌রা মনে করে বর্তমানের সব প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক মতবাদই সুখের রাস্তা দেখাতে অথবা জীবনকে পরিপূর্ণতা দিতে অক্ষম। জীবন-ধারণের বস্তুগত মানকে খুব বড় করে না দেখে যদি মানুষ আত্ম-স্বয়ম্ভর হওয়ার পথে যেতে পারে, যদি প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা এই বিশ্ব মেনে নিতে শেখে তাহলে মানুষের সৃজনশীল সক্রিয় শক্তি অবশ্যই পারবে ইকোলজিভিত্তিক জীবনের বোধ তৈরি করতে।

গ্রীনস্‌দের বিভিন্ন নীতিসমূহ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যতের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যার চারটি প্রাথমিক নীতি হল ইকোলজি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র এবং অহিংসা।

**ইকোলজি** (Ecology)

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম অনুসারে এবং বিশেষত পরিমিত বিশ্বে অপরিমিত উৎপাদন অসম্ভব এই ধারণা থেকে বলা যেতে পারে ইকোলজি হল আমাদের এবং আমাদের পরিবেশকে প্রকৃতির একটি অংশ হিসেবে দেখা। মানুষের জীবনও একই ইকোসিস্টেমের সূক্ষ্ম জটিল জালের মাঝেই জড়িয়ে রয়েছে। মানুষ কাজ-কর্মের মাধ্যমে প্রকৃতি ত্রাণে যেভাবে অংশগ্রহণ করবে, সেও সেভাবেই ফেরত দেবে। তাই, মানুষের কখনই এই ইকোসিস্টেমের স্থায়িত্বকে ধ্বংস করা উচিত নয়।

আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ইকোলজিভিত্তিক নীতিসমূহ শোষণভিত্তিক অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদের স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার এবং ইকোসিস্টেমে ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের ধারণাগুলোকে পুরোপুরি বাতিল করে গঠিত। এটা খুবই ঠিক কথা যে প্রকৃতি এবং মানুষের উপর সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করবে মানুষই। এই লড়াই ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে জীবনের উপর নেমে আশা ভয়ঙ্কর অভিশাপকে।

মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে সক্রিয় যৌথ কারবারই গ্রীনস্‌দের নীতিসমূহের মূলকথা। স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট ছোট অর্থনৈতিক ও শাসন কাঠামোর ক্ষেত্রেই এই নীতি সুপ্রযোজ্য। গ্রীনস্‌রা সেই অর্থনীতির প্রবর্তন চায় যা আজকের মানুষের প্রয়োজনের কথা ভাববে এবং সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাও মাথায় রাখবে। এটা তখনই সম্ভব যখন একই সাথে মানুষ প্রকৃতিকে রক্ষা করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যত্নশীল ব্যবহার করবে। গ্রীনস্‌রা এমন একটা সমাজব্যবস্থা চায় যা অবশ্যই হবে গণতান্ত্রিক এবং যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক।

**সামাজিক দায়বদ্ধতা** (Social Responsibilities)

ভবিষ্যতের সামাজিক পরিকল্পনাগুলো নিশ্চয়ই একটা স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের কথা চিন্তা করেই ভাবতে হবে। সামাজিক পরিকল্পনার সাথে অর্থনীতি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর জন্যই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার সম্পদের বৈষম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গ্রীনস্‌রা বিত্তশালীদের দ্বারা শাসনের অবসান চায়। সমস্ত উৎপাদিত বস্তুসমূহ এবং সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্ব কখনই অল্পসংখক মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীভবন অথবা একচেটিয়া ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়ার ফলে তথাকথিত উন্নতির নামে এক বিকৃত প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি ক্রমশ আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসছে। ফলে এক দূষিত পরিবেশে মানুষের জীবনের অস্তিত্বই আজ গভীর সংকটের মুখে। এই কারণেই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন তথা ইকোলজি আন্দোলন বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেডইউনিয়নের মাঝেও বিস্তৃত হচ্ছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ইকোলজির এই সংকটকে প্রতিরোধ করতে পারে আক্রান্ত মানুষের দৃঢ় সংকল্পিত ঐক্য।

যেহেতু গ্রীনস্‌রা বিশ্বাস করে প্রত্যেকটি মানুষ বিকশিত হবে মুক্ত পরিবেশে ও স্ব-ইচ্ছা অনুসারে সেহেতু গ্রীনস্‌রা চায় মানুষ তার জীবনের রূপ গঠন করুক সৃজনশীল

একতার মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে তালে তাল রেখে—বাইরে থেকে কোনও চাপের মধ্য দিয়ে নয়, নিজের ইচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ঘরে এবং বাইরে দুই ক্ষেত্রেই মানবিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর ধারণার মধ্যে মৌলিক ভাবনা-চিন্তার স্থান।

বর্তমানের সামাজিক অবস্থাই ভয়ঙ্কর মানসিক ও সামাজিক দুঃখ তৈরি হওয়ার মূল কারণ। বিশেষভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন সমাজের ধর্মীয়, বর্ণগত, যৌনগত বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সামাজিক সম্পর্কগুলো ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে; ফলে ক্রমশ হিংসা বাড়ছে, মাত্রাতিরিক্ত আত্মহত্যা হচ্ছে, মদ ও অন্যান্য নেশায় মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এই সামাজিক অবস্থার জন্যই সমাজের সব স্তরেই মহিলারা বিশেষভাবে অবহেলিত ও নিষ্পেষিত।

**শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র** (Grassroots Democracy)

শিকড়-ঘেঁষা গণতন্ত্র বলতে বোঝায় ক্ষমতার আরও বেশি বেশি বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ধারণা। অর্থাৎ নিচুতলার সিদ্ধান্তকে সর্বক্ষেত্রেই সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ছোট ছোট বিকেন্দ্রীভূত শাসন কাঠামোগুলোর হাতেই তুলে দিতে হবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। ইকোলজি-ভিত্তিক বিভিন্ন ধারণার বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রে যে কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তা মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন বিভিন্ন তৃণমূলস্তরে সচেতনতা, ঐক্য এবং সহমর্মিতা।

এই কারণেই গ্রীনস্‌রা নতুন ধরণের পার্টি কাঠামোর কথা ভাবছে যার মূল ভিত্তি শিকড় অবধি প্রসারিত গণতন্ত্র এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—কেননা এ দুটোকে আলাদা ভাবে ভাবা সম্ভবও নয়। এই ক্ষেত্রে মূল কথাটা হল সমস্ত কার্যনির্বাহক সদস্য, প্রতিনিধি এবং সংস্থার উপর সাধারণ সদস্যদেরও নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং যে কোনও সময়ে যে কেউই তার পদ ছাড়তে বা পরিবর্তন করতে বাধ্য থাকবেন। ফলে পুরো সংগঠনের চেহারাটা প্রত্যেক সদস্যের সামনে সব সময়ই থাকবে স্বচ্ছ যেখানে কেউই নিজেকে উপেক্ষিত মনে করবেন না।

**অহিংসা** (Non-violence)

গ্রীনস্‌রা এমন একটা অহিংস সমাজের প্রত্যাশী যেখানে একের দ্বারা অন্যকে শোষণের অস্তিত্বই থাকবে না। গ্রীনস্‌দের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিই হল, তারা বিশ্বাস করে অমানবিক পথে মানবিক কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

আত্মরক্ষা এবং বিভিন্নরূপী সামাজিক আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে সুচিন্তিতভাবে অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব। হিংসা আশ্রয় না নিয়েও দীর্ঘকাল ধরে যে প্রতিরোধ আন্দোলন চালান যায় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরমাণু-শক্তি বিরোধী আন্দোলনগুলো। বলার অপেক্ষা রাখে না রাষ্ট্রশক্তির প্রমত্ত প্রকাশ যে যুদ্ধ তাকে গ্রীনস্‌রা ঘৃণা করে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দমন পীড়নের বিরুদ্ধে অহিংস কখনই বিভিন্ন সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর বিরোধিতা করে না এবং সেই কারণেই এটা কোন নিছক নিষ্ক্রিয় দর্শন নয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই কারণেই গ্রীনস্‌রা একটি সক্রিয় অহিংসা নীতির

প্রবর্তন চায়। গ্রীনস্‌রা বিরোধিতা করে উপনিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টাকে ও বিভিন্ন জাতিগুলোর উপর দমন-পীড়নকে, এবং সমর্থন করে প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতার ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে। প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের ধারণার সাথে শান্তি ব্যাপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ অবশ্যই করতে হবে। পৃথিবীর সমস্ত জৈব, রাসায়নিক এবং আণবিক মারণাস্ত্রগুলোকে ধ্বংস করতেই হবে। সাথে সাথে বিদেশী রাষ্ট্র থেকে সমস্ত সৈন্য অপসারণ করতে হবে।

**প্রকৃতি ও পরিবেশ : গ্রীনস্‌দের দৃষ্টিভঙ্গি**

**পরিবেশ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে**

প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতি সমূহের বাসস্থানে মানুষের অনধিকার প্রবেশ এবং ফলে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্যের ক্রমঅবলুপ্তি প্রকৃতির ভারসাম্য ধ্বংস করে দিচ্ছে। সাথে সাথে মানুষের নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নটাও আজ বিরাট জিজ্ঞাসার সম্মুখে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই ভারসাম্যমূলক জৈব জগতকে রক্ষা করা—বর্তমান প্রজন্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। চিন্তার জগতে এক সার্বিক পুনর্মূল্যায়ন খুবই জরুরি। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই অপরিমিত শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ধ্বংস করে দেওয়ার মারণ খেলা বন্ধ করা দরকার। গ্রীনস্‌রা যে সব কারণে আতঙ্কিত এবং কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এমন বিষয়গুলি হল :

- অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য পণ্য-সামগ্রীর মতো মাটি, জল ও হাওয়ার দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবহার।
- ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুপ্রাচীন বনসম্পদের মূল্য নির্ধারণ, বিক্রয় এবং ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষের অমানবিক আধিপত্য বিস্তার।
- প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য থেকে মানুষের বঞ্চিত হওয়া।
- অনুকূল পরিবেশ ও বাসস্থানের অভাবে বিভিন্ন প্রাণী ও প্রজাতি সমূহের ক্রমঃঅবলুপ্ত হয়ে যাওয়া।
- বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের বর্জ্যপদার্থ এবং তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে পৃথিবীর জল, মাটি ও হাওয়ার দূষিতকরণ।
- অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাস্তা-ঘাটে, ঘর-বাঁড়ি, শিল্প এলাকা গঠন এবং অপরিমিত বনোচ্ছেদের কারণে আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তন, ভূমিক্ষয় এবং মৃতবৎসা জমির ক্রমবৃদ্ধি।

আসলে, ইকোলজিভিত্তিক নীতিসমূহ তৈরি করতে গেলে প্রাকৃতিক চক্র এবং তার ভারসাম্য রক্ষা ও মানুষের হস্তক্ষেপের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এই ইকোলজিভিত্তিক নীতিসমূহের প্রয়োগ, যা বর্তমানে খুবই জরুরি, তা এখনও ভয়ঙ্করভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর দ্বারা।

**প্রকৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে**

প্রকৃতিকে সংরক্ষণের প্রথাগত ধারণায় আমরা ভাবি শুধুমাত্র শিল্পাঞ্চলে বনসৃজন বা কোনও নির্দিষ্ট প্রাণীকে সংরক্ষণ। আসলে তা নয়। যেখানে মানুষ বাস করে যেমন শহর ও গ্রাম—

তার আশেপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষকে বেশি করে সচেতন হতে হবে। বনসৃজন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প শুধু শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করেই নয়, সুচিন্তিতভাবে সর্বক্ষেত্রেই রূপায়িত করতে হবে। শুধুমাত্র মানুষের অস্তিত্বই নয়, বিশাল বিচিত্র প্রাণী জগতের অস্তিত্বের স্বার্থেই মানুষকে আরও যত্নবান হতে হবে। তাই—

- □ বসতি স্থাপনের জন্য সবুজ শস্যাঞ্চল বা বনাঞ্চলগুলোকে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ছিন্ন করে নেওয়া হচ্ছে সমপরিমাণে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।
- □ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্রজাতিসমূহের উপযুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার স্বার্থে জলা-জমিগুলোকে রক্ষা করতে হবে এবং নতুনভাবে সৃষ্টিও করতে হবে।
- □ উপকূল অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন লবণাক্ত জলাভূমিকে রক্ষা করতে হবে।
- □ জমি-উদ্ধার কর্মসূচী নিশ্চয়ই ইকোলজিভিত্তিক বোধ দ্বারা চালিত করতে হবে।
- □ আমোদ-প্রমোদের জায়গাকে ঘর-বাড়ি দিয়ে ঢেকে ফেলা উচিত নয়। সেই কারণে মিউনিসিপ্যালিটি যে সব ঘর-বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা করবে সেখানে অবশ্যই পার্ক, খেলার মাঠ, পুকুর ইত্যাদি গড়ে তোলার সুযোগ রাখতে হবে।
- □ ইকোলজিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বড় বড় বিমানবন্দর, প্রচুর জলযানের ব্যবহার এবং ব্যাপক মোটর চলাচলযোগ্য রাস্তার বিরোধিতা করতে হবে।

**জলদূষণ প্রসঙ্গে**

বর্তমানের শিল্প-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় জলের ব্যবহার প্রতি দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টিপাত প্রায় অপরিবর্তিত। নদীর জলও বিভিন্ন শিল্প থেকে নির্গত নোংরা ও বিষাক্ত বর্জ্যপদার্থের দ্বারা দূষিত হয়ে যাচ্ছে। মাটির নীচের জল-তলের সীমাও ক্রমশ নিচে থেকে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই—

- □ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্য এমন হতে হবে যাতে শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ ইকোলজির পক্ষে মানানসই হয়।
- □ শিল্প নির্গত বর্জ্যপদার্থকে দূষণমুক্ত করার প্রক্রিয়া সমস্ত কোম্পানিকেই ব্যবহার করতে হবে।
- □ যেহেতু মাটির নীচের পরিশ্রুত জল উপরিভাগের অপরিশ্রুত জলের বিকল্প হতে পারে না, সেই কারণে—

  ক. মূল্যবান পানীয় জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমিত হতে হবে।

  খ. শিল্পের কাজে ব্যবহৃত জলকে যতদূর সম্ভব সেই শিল্পেই পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে।
- □ নদী-ধারা এবং নদীর গভীরতায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিশোধনে গুরুত্ব দিতে হবে।

**বায়ুদূষণ প্রসঙ্গে**

দিনের পর দিন ধরে মানুষ প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত কার্বন-মন-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রো কার্বনের সাথে সাথে ধুলো ও ময়লা বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করছে। এইসব বিষাক্ত পদার্থের যৌথ প্রতিক্রিয়ায় এবং প্রাণী জগতের খাদ্য-

চক্রের উপর তার বিষময় প্রভাবে ক্রমশঃ সাধারণ স্বাস্থ্যমানের অবনমন ঘটছে—সময়ে অসময়ে মৃত্যুর করাল গ্রাসও নেমে আসছে। বায়ুদূষণ বন্ধের একমাত্র উপায় যেখানে বায়ু দূষিত হচ্ছে সেখানেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সেই কারণে গ্রীনস্‌রা মনে করে :

□ বিভিন্ন কল-কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, ঘরে ঘরে ব্যবহৃত জ্বালানি ইত্যাদি দূষিত পদার্থ দিয়ে বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করা বন্ধ করতে হবে।

□ জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলের বদলে মিথানল এবং অদূর ভবিষ্যতে হাইড্রোজেনের ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে।

□ বায়ুদূষণের মাত্রা পরিমাপ ও তাকে কমিয়ে আনার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ বায়ুদূষণ কোনও সীমানা মানে না।

**শব্দদূষণ প্রসঙ্গে**

ঘনবসতি অঞ্চল এবং বেশি পরিমাণে যন্ত্রনির্ভর কারখানাগুলোতে শব্দদূষণের ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী প্রায়ই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। শব্দদূষণ সমস্যাটা মোটেই কোনও কারিগরি সমস্যা নয়—ব্যাপারটা পুরোপুরি অর্থনৈতিক। এই প্রসঙ্গে গ্রীনস্‌দের মতামত :

□ অর্থনীতি নয়—মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়েই শব্দ-দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

□ যানবাহনে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, যেগুলো শব্দের উৎস—সেই সব যন্ত্রাংশ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শব্দদূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়। যেমন গাড়ি, মোটর সাইকেল, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ইঞ্জিনগুলো সম্বন্ধে নতুনভাবে ভাবা প্রয়োজন।

□ বসতি অঞ্চলে মোটরগাড়ির ব্যবহার কমাতে হবে এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

**গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ারদের প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে**

প্রকৃতির স্বাভাবিক অঙ্গনে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ও পশুপাখির প্রজাতিসমূহ ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং তার হার ক্রমশঃ বাড়ছেই ফলে ইকলজিরা ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীনস্‌রা দাবি করে :

□ ঐতিহ্যশালী ও প্রাচীন বন-সম্পদকে যে কোনও মূল্যেই রক্ষা করতে হবে এবং এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে সব এলাকার যে যে ধরনের গাছপালা ও পশুপাখি থাকার কথা অথচ তা এখন নেই—তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। একই সাথে পশুপাখি হত্যা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

□ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে কিছুতেই নষ্ট করা চলবে না বরং স্বাভাবিক পরিবেশে বিভিন্ন পশুপাখি ও গাছপালাকে রক্ষা করার প্রশ্নটাকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

□ রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

□ শহরে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও গাছকাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জমি যাতে লবণাক্ত হয়ে না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

- বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নামে দৈনিক হাজার হাজার বিভিন্ন প্রাণীর উপর ওষুধ, রাসায়নিক পদার্থ ও প্রসাধন সামগ্রীর প্রয়োগ এবং ফলত তাদের মৃত্যু—ব্যাপারটা নিশ্চয় অন্যভাবে ভাবা উচিত।
- পশুপাখিদের প্রজননের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কৃত্রিম উপায় গ্রহণ করা হচ্ছে তার নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা উচিত। এটা কি অসহায় পশু-পাখীর উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক আক্রমণের তীব্র প্রকাশ নয়?

*দ্বান্দ্বিক, সংখ্যা : ৭ জানুয়ারি '৯০*

# টানেলের মুখে বৃষ্টিপাত

**মেয়েটি তো উচ্ছল ছেলেটি ধীর।**
**তারা কি দেখেছে সেই শবদেহ স্থির?**

বেশি রাতের ট্রাম থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে চৌরাস্তা। সবুজাভ আলোয় চকচকে পিচ। যতদূর চোখ চলে কোনো ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, ট্রাফিক নেই। সারি সারি বইয়ের দোকান এখন ঘুমন্ত। লাফ দিয়ে উঠে বসি তারই একটা পাটাতনের উপর। উলটোদিকের বাড়িটার চোখ দুটো কে বুজিয়ে দিয়ে দিয়েছে! কে টেনে দিয়েছে মায়াকাজল এই হর্ম্যবিভূষিত মহানগরীর মননশীল কেন্দ্রবিন্দুতে!

এখান থেকে হাত কয়েক দূরে জল। আর জলের কিনারায় বসে উত্তাপ খুঁজতে থাকা মানুষ-মানুষীদের শেষজনও টেনে দিল জানালার পর্দা। মেঘের নকশায় ভেসে আসে হাওয়া। হাওয়া, পাতা, জল—হাওয়া, পাতা, জল। নাকি স্বেদবিন্দু! রগ চুঁইয়ে নামতে থাকে। ভিজে স্পর্শে চমকে উঠে দেখি রক্তক্ষরণ চলছে।

**রক্ত এখন পাথর**
**পাথর এখন শরীর**
**শরীর এখন রক্ত**

**সময় হে, সময়ের বীজ রেখে যাও কতটুকু?**

কিছুদিন হল আমি 'অর্থহীনতা ও সুখ' খুঁজে পাচ্ছি না। তার মলাটে ধরেছিল ছোপ, অনেকটা বিমর্ষ দিনমানের মতো। আসলে সেটা পুস্তক ছিল না নিমগ্ন কোনো উদাসীনতা তা আমার মনে পড়ে না।

এইসব দুর্বল ও জটিল শব্দের আঁকিবুঁকি যা শুরু হয়েছিল কোন এক বিশেষ সময়ে তাদের নিয়ে যুগপৎ এক দ্বিধা ও মমতা কাজ করে চলে নিয়ত লেখকের মধ্যে। এইসব অকিঞ্চিৎকর নিজস্ব শব্দরাজি মেলে ধরা হবে অন্যদের চোখের সামনে এই বোধ নিয়ে আসে এক কুণ্ঠা। কবিতা এরা হয়ত নয়। কারণ কবিতার প্রজ্ঞা এদের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। তবু কোথাও দরজা এক চিলতে খোলে কোথাওই বা গড়ে ওঠে এক ক্ষীণ যোগাযোগ। তাই এদের প্রকাশ।

কিছুদিন হল শব্দরা আমাকে ভাবাচ্ছে। ধরা যাক বিষাদ। বিষাদ—অন্তর্গত বিষাদ না কি বহিরাগত। চমৎকার সব কথার উড়ান। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পালাব কোথায়?

ম্যাজিক ট্রাম আর চৌরাস্তা। পা ফেললেই ফাঁকা। চোখ বুজে ফেলেছে সবাই। জলে ভাসে গির্জার টুকরো ছবি। সব জানালার পর্দা টানা।

শরীরে এখন ঝরাপাতার টান। অন্য মনে ফিরতে থাকি শহরে শহরে। প্রিয় শহর আমাকে ক্ষণেক ক্লান্তি দাও, দাও বিষাদ। মুখে দাও অস্ফুট আর্তনাদ, চোখে দাও মিশকালো অন্ধকার, কানে দাও নিমগ্ন বধিরতা। শুধু শুকনো পাতায় ঢেকে দাও শরীর।

রাস্তা যখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে, হাওয়াও তখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে। হাওয়া চলে, তারই সাথে চলে খড়কুটো, কার্বনের কুচি, ঝরাপাতা আরও কত কি। সময়ের লম্বা পাঁচিলের একটুকরো এই রাত। হাওয়ার রাত, ভিজে নরম নিঃশ্বাসের রাত। মহাশূন্যের শেষ মোড়ে ম্যাজিক ট্রাম বাঁক নেয় টার্মিনাসের দিকে। ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়া, নয়তো নিয়ে যায় সেখানে। কিন্তু যাওয়ার তো কথা ছিল না। তাই আঁকড়ে ধরা বন্ধ দরজার হাতল। মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে সঁপে দেওয়া শরীর। আলোর ফাঁকে ফাঁকে সারি সারি অন্ধকারের তীর। এই রাস্তায় কোনো যাদুময় শুঁড়িখানা নেই। তাই লোকেরা চলে যায় দক্ষিণের দিকে। শব্দের আগুন, বাউলের উচ্ছিষ্ট আর মননশীলতার চমৎকার টানাপোড়েন শেষে সব জানালায় এখন পর্দা টানা। কেবল বেশি রাতে কয়েকটি প্রজ্ঞাবান যুবা ব্রাশের টানে দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলে নীলাভ এক ছায়া। ছড়ের টানের ফাঁকে তার নিয়ত মনে পড়ে দু-সারি নির্মম মধুর দাঁতের কথা। ঠোঁটের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা হাড়ের পরিপাটি সজ্জা। চলে যাওয়া ছাড়া কোনো নিজস্বতা থাকতে পারে না জেনেও সে এখনও দর্শক।

এই মুহূর্তে তার জ্বরের একটুকরো সংক্রামিত হয়ে গেছে আমাদের মাঝেও। চোখেরা হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে, গালেরা তোবড়ান, ঠোঁটেরা প্রত্যাশাহীন। আর অবাধ্য কলমের হাত চেপে ধরছে বাঁকাচোরা অক্ষরকে ততোধিক অবাধ্য কাগজের ওপর, তৈরি হচ্ছে শোকগাথা—তার জন্য।

আর সেই ভয়ঙ্কর দিনে টানেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি শহর জুড়ে বৃষ্টি ঝরছে।

*অদ্রোহ*, মে, ১৯৯০

# প্রসঙ্গ : স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস

অপেক্ষা করছিলাম রেল স্টেশনে আরো অনেক মানুষের সাথে। বহুক্ষণ ট্রেন আসছে না, বাড়ছে বিরক্তি আর অস্বস্তি। অবশেষে জানা গেল শ্রীরামপুরে কোন এক ওষুধ কারখানায় 'লক-আউট' ঘোষিত হওয়ায় সেখানকার শ্রমিকরা রেল লাইনে বসে পড়েছেন। কারখানা বন্ধ হওয়ার ঘটনা আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে। ফলে সহানুভূতি মাখান আঃ উঃ-র পাশাপাশি দু-একটা বাঁকা কথাও ভেসে এল ভেঙে যাওয়া ভিড়ের মধ্য থেকে। কারখানার নামটাও বললেন কে একজন—'স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস' (এস পি)। এই নামটা বেশ চেনা। কারণটা অবশ্য এদের খুবই পরিচিত বড়ি 'স্ট্যানপেন' বা জীবনদায়ী ওষুধ পেনিসিলিন দিয়ে তৈরি ট্যাবলেট। ইস্কুলের বইতে পড়েছিলাম পেনিসিলিন আবিষ্কার কত মানুষকে নতুন জীবন এনে দিয়েছে। কি বিরাট চাহিদা এই ওষুধের। তবে কেন পূর্ব ভারতের একমাত্র পেনিসিলিন কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পেনিসিলিন তৈরি আর স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্-এর গল্পটা একটু একটু করে জানতে শুরু করলাম।

### পেনিসিলিনের গল্প

ভারতের সবথেকে উঁচু দরের চিকিৎসাকেন্দ্র দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ মোজাকোর গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী ডেভিড ওয়ার্নার ওখানকার স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত স্লাইড দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎই তিনি জিজ্ঞাসা করলে 'পেনিসিলিন কে কবে আবিষ্কার করেছিলেন'? প্রশ্নটা এত নিচুমানের যে উপস্থিত রথী-মহারথীরা উত্তর দিতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। একজন এর মধ্যেই বললেন 'আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং—১৯৩৮ সালে।' ডেভিড বললেন 'না, না'। ছবিতে দেখালেন পাথরের ওপর একটি ছত্রাক। ওই ছত্রাক 'পেনিসিলিন রস' তৈরি করে। হাজার বছরে ধরে আদিবাসীরা তা ব্যবহার করছে—বিশেষত বাচ্চা হবার পর সূতিকা জ্বরে।

তবুও বলতে হবে ফ্লেমিং বিজ্ঞানী হলেও লোভী ছিলেন না। উনি বিংশ শতাব্দীর সব থেকে দাবি ওষুধকে পেটেন্ট নেন নি। এবং যাতে কেউ এটা না দখল করতে পারে তাই ওষুধ তৈরির সমস্ত ব্যাপার খোলাখুলি প্রচার করে দিয়েছিলেন।

জানা গেছে ইউরোপ আমেরিকা থেকে বহু দূরে এই বাংলাদেশে সে যুগেই দেশীয় উপাদান থেকে পাওয়া (শোনা যায় গোবর) নিজস্ব ছত্রাক দিয়ে পেনিসিলিন তৈরি করেছিলেন এক বাঙালি বৈজ্ঞানিক ডা. হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁরই তৈরি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্

কারখানায়। এস পি-র পুরোনো কর্মীদের কাছে ডা. ঘোষের তৈরি হেমাসিলিনের নাম এখনও শোনা যায়। ডা. ঘোষ আর তাঁর স্ত্রী দুজনেরই খুব উৎসাহী ছিলেন সেই সময় প্রচলিত সব ধরণের সিরাম, ভ্যাকসিন ও অন্যান্য ওষুধ বানাতে। তাঁদের নেতৃত্বে এস পি পূর্ব ভারতের ওষুধের বাজারে ভালভাবেই জায়গা করে নিয়েছিল।

কিন্তু বিরাট নাম করা সত্ত্বেও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডা. ঘোষ বুঝতে পারছিলেন টাকা পয়সার এই জগত, প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই জগত তাঁকে ক্লান্ত করে তুলছে। কোম্পানি বিক্রি করে দিতে চাইলেন তিনি। এগিয়ে এল গুজরাটের সারাভাই গোষ্ঠী। আমেরিকার স্কুইব কোম্পানির সহযোগিতায় তাঁরা পেনিসিলিন তৈরি করছিলেন সেই সময়। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এস পি গেল সারাভাইদের হাতে। আর এর পরের ইতিহাস ক্রমশই এস পি কোম্পানির বেড়ে ওঠার ইতিহাস। কর্মীর সংখ্যা ২০০ থেকে বেড়ে ১৯৮২ সালে হয় ২০০০ জন। আর ওই সময়ই কোম্পানির বিকাশ হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে বেশি। অথচ এর পরের কয়েক বছরের মধ্যেই ছবিটা গেল বদলে। ১৯৮৭ সালের ২৮ অক্টোবর এস পি-র এক অংশকে ঘোষণা করা হল রুগ্ন। যার ফলে কোম্পানিকে যেতে হল অসুস্থ কারখানার জন্য নির্দিষ্ট আদালত বি আই এফ আরের সামনে। আর এর পর থেকেই শ্রমিকদের নানান রকম প্রাপ্য যেমন পিএফ, ই এস আই, এল আই সি, বোনাসের টাকা, ক্যান্টিনের খাবার, গ্লাভস প্রভৃতি কাজ করার জিনিসপত্র—এক এক করে সব বন্ধ হয়ে গেছে। '৯০ সালের গোড়া থেকে বেতন নিয়েও ঝামেলা শুরু হয়। আর '৯১ সালের জানুয়ারী থেকে সেটা হয়ে যায় বন্ধ। সব শেষে ১৯৯১-র ৩০ মে ভোরবেলায় ওয়ার্ক স্যাসপেনশানের নামে কারখানায় তালা পড়ে। আর সেদিনই শ্রমিকরা ট্রেন বন্ধ করে দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের বুকে।

**কেঁচো খুঁড়তে সাপ।**

শিল্প কেন অসুস্থ হয়, কেন মারা যায়—এ নিয়ে কাজ করছেন কলকাতার নাগরিক মঞ্চ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁদের একজনকে, 'বলতে পারেন এস পি কারখানার এ দুর্দশার কারণ কি? চটজলদি জবাব পেলাম পাল্টা প্রশ্নর মধ্য দিয়ে, 'আপনি কি জানেন স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ বলে কোনো কারখানার অস্তিত্বই নেই?' অবাক হলাম—তবে লক আউট হয়েছে কোন্ কারখানায়? উত্তর এল—ওপেক ইনোভেশনস্ লিমিটেডে। আরও অবাক হলাম, ওপেক—সেটা আবার কোন কোম্পানী।

## দুই দেহ এক মাথা

১৯৮২ সালের ২৯ মে এস পি-কে দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয় এক চুক্তির বলে। এই চুক্তি অনুযায়ী একটা অংশের নাম দেওয়া হল ওপেক ইনোভেশনস্ লিমিটেড (ওপেক) অন্য অংশের নাম রয়ে গেল এস পি।

ঠিক হল ওপেক পাবে এস পি-র ফর্মুলেশন (ফার্মা) ডিভিশনটি। অন্যদিকে এস পি-তে থাকবে বাল্ক পেনিসিলিন ম্যানুফ্যাকচারিং ডিভিসনটি। সোজা কথায় এস পি-তে তৈরী হবে কাঁচা মাল (অর্থাৎ ছত্রাক) থেকে শুদ্ধ পেনিসিলিন দানা (বেনজাইল পেনিসিলিন,

আর এই উৎপাদনের এক অংশ দিয়ে ওপেক তৈরী করবে পেনিসিলিন গ্রুপের নানান ওষুধ, যেমন ষ্ট্যানপেন, ষ্ট্যানমাইসিন ও ষ্ট্যানসিলিন ইতযাদি। (বলা বহুল্য আগে অন্যন্য ওষুধ সমেত উপরে লেখা সব কিছুই উৎপাদন হত শুধু এস পি-র নামে)।

**ভাগাভাগির জটিল হিসেব**

মজা হল যে এস পি ওপেকের ভাগাভাগি সত্ত্বেও বড়কর্তারা, কারখানা, হেড অফিস সব কিন্তু একসাথে রইল। যদিও অধিকাংশ শ্রমিককে ওপেকের ঘাড়ে দিয়ে দেওয়া হল। চুক্তিতে লেখা হয়েছিল যে এস পি-র ফর্মুলেশনের জন্য যত লাইসেন্স সব ওপেককে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যত তা এস পি-র হাতেই রাখা হল, ওপেককে কোন সম্পত্তি দেওয়া হল না।

**কে কার মালিক!**

এস পি-কে নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল গুজরাটের আম্বালাল সারাভাই এন্টারপ্রাইজেজ লিমিটেড (অ্যাসেল)—বলল, এস পি হচ্ছে তার একটা ডিভিসন। অন্যদিকে ঘোষণা করা হল ওপেক হচ্ছে সিমবায়োটিক্স লিমিটেড (বরোদা)-এর সহযোগী (সাবসিডিয়ারি) কোম্পানী। ওপেকের সব শেয়ার বিনামূল্যে দেওয়া হল সিমবায়োটিক্সকে। এই সিম্‌বায়োটিক্স আসলে সারাভাইদেরই কোম্পানী। এবং শেষ অবধি তা অ্যাসেলেই যুক্ত হয়েছে।

**খেলা শুরু**

এস পি-র তৈরী শুদ্ধ পেনিসিলিনের দানার একটা অংশ দেওয়া হত ওপেককে। কিন্তু বড় অংশটাই পাঠান হত বরোদায়। সেখানে আরও কিছু পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার (সেকেণ্ড প্রসেস) পর তার থেকে তৈরী হত পেণ্টিড ট্যাবলেট বা একে ব্যবহার করা হত কাঁচা মাল হিসাবে অ্যামপিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করতে। ঘটনা হল, সরকার পেনিসিলিন দানার যে দাম বেঁধে দিয়েছে সারাভাইয়া তার থেকে কম দাম দিয়ে বছরের পর বছর এস পি থেকে অ্যাসেলে, অর্থাৎ শ্রীরামপুর থেকে বরোদায় বেনজাইল পেনিসিলিন নিয়ে গেছে, আর সন্দেহ করাই যায় যে এই **সেকেন্ড প্রসেসটা** আসলে শুধু কথার কথা।

**হিসেব-নিকেশ**

**একটি আনুমানিক হিসেব দেওয়া যাক—বি আই এফ আর০কে দেওয়া ইউনিয়নগুলি আবেদনপত্র অনুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালের ৯ মাসে এস পি থেকে অ্যাসেলে পেনিসিলিন গেছে ৪৬,৭৮২ বি ইউ। সরকারের বেঁধে দেওয়া প্রকৃত দাম—৯৩৫ টাকা প্রতি বি. ইউ—সারাভাই দিয়েছে—৬৫০ টাকা প্রতি বি ইউ। পার্থক্য—যেটা অ্যাসেল এস পি-কে ঠকিয়েছে—৪৬,৭৮২ × (৯৩৫ - ৬৫০) = ১,৩৩,৩২,৮৭০ (অর্থাৎ এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশ সত্তর টাকা)। এই হিসেবে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ অবধি এস পি-র থেকে অ্যাসেল লাভ করেছে প্রায় ৭ কোটির মত টাকা। এই হিসেবকে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ধরলে সারাভাইদের মুনাফার অঙ্কটা কত দাঁড়ায়?**

**অ্যাসেলের লাভ—ওপেকের লোকসান**

সরকারি দামের থেকে কম দামে প্রচুর পেনিসিলিন বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুজরাটে চালান করে দিয়ে সারাভাইরা এস পি-র প্রাপ্য টাকা মেরে দিচ্ছে। কিন্তু এই দায় কিভাবে ওপেকের উপর বর্তায় তার জন্যও কল বসান আছে। পেনিসিলিন গ্রুপের যে ওষুধ ওপেক বানায় (ষ্ট্যানপেন ইত্যাদি) তার লাইসেন্স কিন্তু রয়েছে এস পি-র হাতে। ওষুধ তৈরী করে ওপেক, বাজারে যায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নামে। বিক্রী করে ওপেক, লাভ হয় এস পি-র। ওপেক পায় ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ। আর অন্যান্য যে সব ওষুধ ওপেক তৈরী করে তার থেকে লাভ হতেও পারে, কিন্তু ঠিক করে রাখা আছে যে ওপেকের উৎপাদন ক্ষমতার ৭০ ভাগ থাকবে ওই পেনিসিলিন গ্রুপের ওষুধ তৈরী করার জন্যই। তাতেও চলছে না, ওপেকের কারখানা চালান হচ্ছে ক্ষমতার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা তার কিছু বেশী মাপে, ফলে ওপেকের শ্রমিক (সংখ্যায় ৭০০-র ও বেশি) বসে থাকছে, পাশাপাশি মাথাভারী প্রশাসনে প্রতি ৯ জন শ্রমিক পিছু একজন উপরওয়ালা রয়েছে। সব মিলিয়ে জোর করে ওপেকের দম বন্ধ করে মারা হচ্ছে।

**কম দামের রহস্য**

শ্রীরামপুর বটতলায় 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওপেক বাঁচাও কমিটি'র সভা একটু পরে শুরু হবে। বেঞ্চিতে বসে কথা হচ্ছিল বন্ধ কারখানার এক শ্রমিকের সাথে। বেশ গর্ব করে বলছিলেন তিনি—আমাদের মাল প্রোডাকশন হয়ে একদম ধবধবে সাদা। প্রশ্ন করলাম—অন্য রকমও হয় নাকি? উত্তর পেলাম—আই ডি পি এলের মাল মাঝে মাঝে হল লালচে কালচে ছোপ সহ। ওটা হল নীচু মানের পেনিসিলিন। কিন্তু যেহেতু এদের জীবাণু মারার ক্ষমতা (পোটেন্সি) একই তাই ফার্মাকোপিয়ায় কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু শোনা গেল যে দিল্লীর ওষুধের দাম ঠিক করার সরকারী সংস্থা (ড্রাগ প্রাইস কনট্রোল অথরিটি) '৬৫ সাল নাগাদ পেনিসিলিন দানার দুরকম দাম করে। ছোপ লাগা দানার নাম হল ফার্ষ্ট কৃষ্টাল গ্রেড ও সাদা দানার নাম হল ট্যাবলেট গ্রেড বা সেকেণ্ড কৃষ্টাল গ্রেড। ১৯০৯০ সালের দাম অনুযায়ী ফার্ষ্ট কৃষ্টালের দাম ৬৩৫ টাকা প্রতি বি ইউ (বিলিয়ন ইউনিট বা ১০° ইউনিট) ও সাদাটির দাম ৯৫৩ টাকা প্রতি বি ইউ। অনুমান করা যায় এইখানে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে সারাভাইদের ধাপ্পাবাজির আসল রহস্যটা। শ্রমিকরা বলছিলেন যে শ্রীরামপুরের কারখানায় সরাসরি তৈরী হয় সাদা সেকেণ্ড কৃষ্টালটা। অথচ সারাভাইরা এটাকে দেখাচ্ছে ছোপ ধরা ফার্ষ্ট কৃষ্টাল হিসাবে। দাম দিচ্ছে সেই মাপে। এবং বরোদায় নিয়ে গিয়ে 'সেকেণ্ড প্রসেসে'র নামে ওটাই সরাসরি ব্যবহার করছে।

**তৈরি হল পেনিসিলিন**

ছোপ লাগা বা ধবধবে সাদা ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে উৎপাদন কি ভাবে হয় সেটা একটু দেখা দরকার। কর্মীরাই বোঝালেন যে পেনিসিলিন তৈরীর তিনটে ধাপ আছে।

১. বিরাট ট্যাঙ্কে ছত্রাকদের বাড়ান হয় আর তারা পেনিসিলিন তৈরী (সিক্রিট) করে। পেনিসিলিন ও জলের মিশ্রণ যেটা একটু অ্যাসিড ভিত্তিক তার মধ্যে ক্ষার (এক্ষেত্রে পটাসিয়াম হাইড্রাক্সাইড) দেওয়া হয়। যার ফলে পেনিসিলিন পটাসিয়ামের লবন হিসাবে থাকে।

২. এটাকে পরিশোধন করা হয়।

৩. এক্সট্র্যাকশন ডিপার্টমেন্টে এর থেকে সাদা দানা বের করা হয়।

এই তৃতীয় ধাপে চাপ কমিয়ে ২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি তাপ মাত্রায় জলকে বাষ্প করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে 'বুটানল' নামে একধরণের অ্যালকোহল পেনিসিলিন মেশান জলে ঢালা হল। জল করতে থাকে। বুটানলও ক্রমাগত মেশান হতে থাকে, লক্ষ্য রাখা হয় যে তাপমাত্রা না ওপরে উঠে যায়, কারণ সেক্ষেত্রে পেনিসিলিনের রাসায়নিক গঠন ভেঙে যাবে। এই পদ্ধতির শেষে অল্প একটু জল থাকে (ঘনত্ব ০.৮২৩ হবে)। এটাকে ছাঁকলে এবং বার বার বুটানল ধোয়া হলে একদম পরিষ্কার সাদা দানার (কৃষ্টাল) পটাশিয়াম পেনিসিলিন লবন তৈরী হয়।

ওষুধ শিল্পে উৎপাদনে কড়া নজর রাখা হয়। কারণ ওষুধ খারাপ হলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। এস পি-র শ্রমিকদের ভাষায় 'যখনই আমরা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করি বা কিছু করতে যাই তখনই আমরা লগ সীটে সেটা লিখে সই করে দি। প্রতিটি ধাপে কোয়ালিটি কনট্রোল বিভাগ চেক্ করে, এটা খুব খুঁটিয়ে করতে হয়। নীচে পাউডার হ্যান্ডলিং সেক্শানে মাল তৈরি হলেই তার রং পরীক্ষা করা হয়, লালচে ছোপ এলে আমরা সবাই ধমক খাবো, জবাব দিতে হবে, তাই প্রচুর ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে প্রায় একশ ভাগ সাদা মালই তৈরী হয়।

দেখা যাচ্ছে পুরো প্রযুক্তির নকশাটিই সাদা দানা বের করার জন্য। মাষ্টার প্ল্যান ও ধাপগুলিতে সেই ভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং প্রতি পদে রেকর্ড রাখা হয়, দিনে অনেকবার। তবুও এ মালকে ছোপ ধরা দেখান হয় হয়ত।

আবার এটাই ওপেকে যাচ্ছে। সেখানে এটাকে সাদা, ট্যাবলেট মানের বল হচ্ছে। অর্থাৎ সারাভাই যদি বলে যে ছোপ ধরা মালটাই এস পি-তে হচ্ছে—যা সে বরোদার জন্য কিনছে, তাহলে ওপেকে সাদা মাল কি করে যাচ্ছে?

### রুগ্ন হল কারখানা

যতদূর বোঝা যাচ্ছে সারাভাইরা এস পি থেকে সম্পদ গুজরাটে সরিয়ে তাকে ছিবড়ে করে দিয়েছে। ওপেকের ওপরও এর বিরাট চাপ পড়েছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ওপেককে দিয়ে উৎপাদন না করিয়ে, লাইসেন্স না দিয়ে, বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারি ম্যানেজারের বোঝা তার ওপর চাপিয়ে ওপেককে রুগ্ন শিল্প বানান হয়েছে। এর ফলে সারাভাইরা সরকার ও ব্যাঙ্কের কোনো ধরণের পাওনা, সুদ কিছুই ফেরত দিচ্ছে না, এমন কি ইলেকট্রিক বিল শুনেছি প্রায় 60 লক্ষ টাকা বাকি ফেলে রেখেছে। মানে যত কোটি টাকা ক্ষতি দেখাচ্ছে তার বেশীর ভাগই হল যে টাকা তারা মেরে দিয়েছে।

রুগ্ন অবস্থায় বি আই এফ আরের নির্দেশ অনুযায়ী ওয়েবকন সংস্থাকে দিয়ে পরিকল্পনা করান হয়েছে কিভাবে কারখানাকে দাঁড় করান যায়। সেখানে সাড়ে তিনশ লোকের স্বেচ্ছা অবসরের কথা বলা হয়েছে। এর টাকা সারাভাই দিতে রাজী নয়। তারা এখন ব্যাঙ্ক দেখাচ্ছে। কারখানায় তালা লাগিয়ে দিয়ে বলছে পাঁচ কোটি টাকা দাও তবে কারখানা খুলব। নয়ত মরুক 1000 পরিবারের লোকেরা আমাদের কি? এই হল আজকের অবস্থা।

বি আই এফ আরের চেয়ারম্যান গণপতি সম্প্রতি বলেছেন 'শিল্প রুগ্ন করা হচ্ছে একটা লাভজনক ব্যবসা', সারাভাইরা এটা করে দেখাচ্ছে।

## গণবিজ্ঞান, গণস্বাস্থ্য ও পেনিসিলিন

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পরম্পরায় এক বড় দিক হল পরিবেশ দূষণ, অলৌকিকতার বিরোধিতা ইত্যাদি। এস পি—ওপেক আর পেনিসিলিনের রয়েছেই। একজন ওঝা মানুষকে রোগ সম্বন্ধে ধাপ্পা দিয়ে ঠকায়, তাই সে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য। তাহলে সারাভাই হাউস যে ওষুধ দিয়ে কোটির অংকে টাকা চুরি করছে, ধাপ্পা দিচ্ছে তাকে আমরা কি চোখে দেখব? সাপ নিয়ে প্রচার করার পাশাপাশি সিরামের যোগানের ব্যাপারটাও কি আমরা দেখব না? যদি সিরাম উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় আমরা কি কিছু করব না? পেনিসিলিন তো খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ। তবে কেন জনবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলন পূর্ব ভারতের একমাত্র পেনিসিলিন কারখানা বন্ধ করার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না?

পাশাপাশি আমরা দেখছি যে শিল্পকে যেভাবে রুগ্ন করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তির ব্যাপারটা সামনে রেখে গণ্ডগোল করা হচ্ছে, সেটার ওপর সাধারণ নারী-পুরুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিশেষজ্ঞ-ভিত্তির ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বলা হয় সাধারণরা নয় বিশেষজ্ঞরাই সব বুঝবে, অন্য দিকে কলেজ ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞদের ছোট ছোট খুপরির মধ্যে রেখে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পেনিসিলিন শিল্পে কাজ করেন এরকম একজন কর্মী এর রুগ্ন হওয়ার পিছনের নকশাটা ধরতে পারেন না। অথচ তিনি নিজের অংশটুকু বোঝেন। তিনি ভাবছেন বিশেষজ্ঞরাই সব বুঝবেন। এই দুর্বলতার জন্য তাঁকে নিঃস্ব করে দেওয়া হচ্ছে, তাঁর প্রাপ্য সম্মানও তিনি পাচ্ছেন না। অথচ শ্রীরামপুর কারখানার এক শ্রমিক বলছিলেন কিভাবে কারখানার সবার যৌথ উদ্যোগে তাঁরা সরাসরি সোডিয়াম পেনিসিলিন তৈরী করেছেন।

তাই জনবিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের বন্ধুদের আজ সব ধরণের তথ্য জানা এবং জানান আর বিশেষজ্ঞ নির্ভরতার উৎস খুঁজে বার করার ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে। রিষড়া বিজ্ঞান মেলায় পোস্টার প্রদর্শনী হোক কি ছোট গণবিজ্ঞান পত্রিকার লেখা—আমাদের আজ বলতেই হবে যে সারাভাইদের তাড়িয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-এ পেনিসিলিন উৎপাদন শুরু করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বাঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের স্বার্থেই।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,* নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯৪

বাঙ্গালোরের পরমাণু বিরোধী কনভেনশনে লেখা। ইন্ডিয়ান সোস্যাল ইনস্টিটিউটে তিনদিনের অনুষ্ঠান ছিল। বাঙ্গালোরের সংগঠন CANE—Citizen against Nuclear Encrgy, সংগঠিত করেছিল

DEAR FRIENDS,

WE ARE SORRY THAT WE ARE WRITING THIS COMMUNIQUE IN ENGLISH.

WE HAVE MANY FRIENDS, BOTH YOUNG AND OLD, IN WEST BENGAL ACTIVE IN CO-OPERATION BUILDING FOCUSING AROUND ISSUES LIKE ENVIRONMENTAL DISASTER CREATED BY CORPORATE INTERESTS, SOCIAL POLLUTION, POWER CRISIS & ENERGY PROBLEMS, ANTI-SUPERSTITION CAMPAIGN, REGIONAL DEVELOPMENT & MANY SUCH SIMILAR ISSUES.

WHEATHER IT IS ANTI-NUCLEAR CAMPAIGN OR PUBLISHING MODESTLY CIRCULATED. VERNACULAR MAGAZINES (BENGALI) THESE PEOPLE ALWAYS DEPEND ON FRIENDSHIP BASED NETWORKS.

FOR THE LAST TEN YEARS THESE ACTIVITIES HAS MANY UPS & DOWNS, AND HARDLY TOUCHED ALL PARTS OF SOCIETY ALTHOUGH THE EFFORTS ARE STILL THERE.

ON BEHALF OF THESE FRIENDS WE HAVE COME HERE MAINLY TO LEARN ABOUT ALL THE CONSTRUCTIVE & CRITICAL CAMPAIGNS/PROJECTS/MOVEMENTS/IN DIFFERENT REGIONS WITH A SPECIAL EMPHASIS ON PEOPLE CONTROLLED SMALL SCALE CREATIVE PROJECTS.

THIS IS OUR APPEAL TO ALL OF YOU, PLEASE COMMUNICATE WITH US ON ANYTHING YOU FEEL IMPORTANT. ON A RECIPROCAL BASIS. IT IS GOING TO BE VERY USEFUL FOR OUR FRIENDS IN & AROUND PEOPLE'S SCIENCE INITIATIVES IN WEST BENGAL. WE FEEL THAT THIS EXERCISE IS REALLY IMPORTAT IN CONTEXT OF INFORMATION IDEA EXCHANGE BETWEEN DIFFERENT REGIONS

WE ARE REALLY HAPPY TO SHARE THE WARMTH ALL OF YOU HAVE GENERATED AND WE WILL CARRY IT BACK WITH US TO CALCUTTA

LOVE

28.04.1991

## একটি প্রচারপত্র

### আপনি কি খুব ব্যস্ত? একটু শুনুন ..........

লিফলেট লেখার কাজটায় সত্যর ছিলো অনায়াস দক্ষতা। অনেক বিষয়ে অনেক আন্দোলনের প্রয়োজনেও লিফলেট লিখেছে। এরকমই একটা লিফলেট ছাপা হলো।

আপনি যে মিছিল দেখছেন তা শুরু হয়েছে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী থেকে। শেষ হবে শ্রীরামপুর স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ কারখানার গেটে। বলুন তো আজ এই উৎসবের সকালে আমাদের কেন রাস্তায় নামতে হয়েছে? আপনি কি জানেন যে গোটা পূর্ব ভারতে একমাত্র যে কারখানা জীবনদায়ী ওষুধ 'পেনিসিলিন' তৈরি করত সেই স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালসের এক বড় অংশে গত ৩০ মে '৯১ থেকে 'লক-আউট' ঘোষণা করে গোটা কারখানাটাই বন্ধ করে দিয়েছে মালিব সারাভাইরা। জানেন কি জানুয়ারী '৯১ থেকে শ্রমিকরা কোন পয়সাই পাচ্ছেন না। আর আগের কয়েক বছরে তাঁদের প্রাপ্য টাকা-পয়সার অনেকটাই তাঁরা পান নি। আজ এই পুজোর দিনে আপনি হয়ত পেরেছেন আপনার প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটাতে।

একবার ভাবুন তো পেনিসিলিন কারখানার সেই ১২০০ শ্রমিকের কথা। আপনার বিপদে তো এঁদের মেহনতে তৈরি ওষুধ 'স্ট্যানপেন' কত সাহায্য করেছে। আজ আপনি কি একবার ভাববেন না শ্রমিক পরিবারের ছোট ছোট বাচ্চাদের কথা? অনাহার আর আত্মহত্যার দিকে পা বাড়ানটাই কি এদের নিয়তি?

আর এসবের জন্য দায়ী মালিক সারাভাইদের উন্মত্ত লোভ, আর বেপরোয়া চুরি। স্পষ্ট করে বললে যার পরিমাণ আনুমানিক পাঁচ বছরে প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি টাকা।

নানান জটিল কায়দায় এঁরা শ্রীরামপুরের সম্পদ গুজরাটে সরিয়েছেন একথা আজ ওয়াকিবহাল মহলে অনেকেই বলছেন।

আজকের এই পথচলা তাই শুধুই এক নিছক মিছিল নয়, এর পিছনে রয়েছে অনেক মানুষের যন্ত্রণা।

আপনার কাছে আমাদের চাওয়া এইটুকুই, অন্তত একটু জানুন। খোলামনে সাহায্য করুন আপনার বন্ধু পেনিসিলিন কারখানার শ্রমিকদের। আওয়াজ তুলুন, সারাভাইকে তাড়িয়ে স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস দ্রুত খুলতে হবে।

# প্রযুক্তির টুকরো ছবি — একটি কাল্পনিক বক্তৃতা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে অনেক দিন ধরেই। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রযুক্তির ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান নিয়ে নতুন নতুন ভাবনায় আলোড়িত হচ্ছিলাম আমরা। সব কিছুকেই অন্য দিক থেকে দেখার চেষ্টার ফলশ্রুতি সত্যব্রত-র 'প্রযুক্তির টুকরো ছবি— একটি কাল্পনিক বক্তৃতা'। লেখাটি সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ তে তৈরী।

প্রিয় বন্ধুরা, আজ সন্ধ্যায় আপনাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার পথে আমি কলকাতা শহরের একটি অতি পরিচিত অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। গত কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা কি রকম দাঁড়িয়েছে সেটা আপনারা সকলেই জানেন। ভয়ঙ্কর উপচে পড়া ভীড় সমেত আমাদের বাসটা যখন বড় বড় গর্তর ওপর দিয়ে চলছিল তখন বাসের মধ্যে আমরা একে অন্যের উপর পড়ছিলাম, গুঁতোগুতি করছিলাম আর আর্দ্রতার জাঁতাকলে পড়ে কেবলই ঘামছিলাম আমরা। কিন্তু এসব ছাপিয়ে অবস্থাটা একেবারে নারকীয় হয়ে উঠল যখন আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল একটা লম্বা গাড়ির সারির পেছনে। সময়টা এগোতেই চাইছিল না। বাসের জানালার পাশেই ফুটপাথের ওপর একটা জেনারেটার একটানা বিকট শব্দ করে যাচ্ছিল। জেনারেটারের ধোঁয়া, তেলের গন্ধ ......... আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল। মনে হচ্ছিল আমি এক্ষুণি বমি করে ফেলব।

একেবারেই ব্যক্তিগত অনুভূতির কিছু কথা দিয়ে শুরু করার জন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমাকে বলা হয়েছিল চারপাশের জীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে কিছু বলতে। কিন্তু আমার তিক্ততা আমাকে বাধ্য করছে আমরা প্রতিদিন কেমনভাবে জীবন কাটাচ্ছি সেইখান থেকেই শুরু করতে।

আমাদের এই মস্ত বড় শহরে দেখবেন অনেকেই বলেন যে সমস্যাগুলো দ্রুত পাহাড়ের মত হয়ে উঠছে। শহরের গরীব এলাকাগুলোর দিকে তাকান, স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে জঞ্জালের স্তূপ থেকে ভাঙাচোরা, ভীড়ে ঠাসাঠাসি বস্তিবাড়ী পর্যন্ত কেমন দগদগে ঘা হয়ে আছে। পানীয় জল, নর্দমা ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রাস্তা-ঘাট এরকম হাজারটা বিষয়ে যন্ত্রণা আজ প্রবল।

এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল একজন দক্ষ প্রযুক্তিবিদের সাথে। রাস্তা-ঘাট সংক্রান্ত কথাবার্তায় তিনি বললেন যে এরকম প্রযুক্তি আমাদের আছে যা ব্যবহার করলে বছর বছর রাস্তা সারাতে হবে না। প্রশ্ন করলাম — ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার হচ্ছে না কেন? উত্তরে হাসলেন তিনি। বললেন, আপনি কি জানেন তাতে কন্ট্রাক্টরদের আয় কি পরিমাণ মার খাবে? প্রতি কিলোমিটার

রাস্তা পিছু ৫০ হাজার বা আরও বেশী টাকা বছরে খরচা করা হয়। আজ যদি 'রাস্তা ভেঙে যাওয়া—সারান—আবার ভাঙা' এই খেলা চলতে না থাকে তো এরা যাবে কোথায়?'

মজা হল যে ভারত উপমহাদেশের যে কোন অঞ্চলেই হাসপাতাল তৈরী হোক কি ব্রীজ, এই 'কন্ট্রাক্টর অর্থনীতি'ই সেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আপনারা বলতে পারেন যে কথা তো হচ্ছিল 'বিজ্ঞান-প্রযুক্তি' নিয়ে, সেখানে আপনি 'অর্থনীতি' ঢোকাচ্ছেন কেন? সমস্যা হল বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়ন যেভাবে বাস্তব চেহারা নেয়, গড়ে ওঠে তাকে বুঝতে গেলে ক্যালিডোস্কোপে ঝাঁকুনি দেওয়ার মত একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে হয়ত সুবিধা হতে পারে। ধরা যাক, একটা খুব প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করা হবে (এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)। এর প্রযুক্তি বাজারে তৈরী আছে। এক্ষেত্রে একে যদি প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়ন বলা হয়, তবে সাধারণত টাকার মাপে একে পাঁচ কোটি বা পঞ্চাশ কোটি টাকার উন্নয়ন বলা হয়। পুরো টাকাটা কর্তৃপক্ষ আলাদা আলাদা খাতে ভাগ করে সমস্ত কাজ কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে দেন। কন্ট্রাক্টররা আবার সময় সময় নিজেদের কাজ সাব-কন্ট্রাক্টরদের দিয়ে করান, প্রত্যেকটা স্তরের কাজ ঠিক ঠিক হয়েছে কি না, পরীক্ষা করে নেন কর্তৃপক্ষ। এবং প্রত্যেকটা স্তরেই টাকা সরান হয়— তা সে কমিশন দিয়েই হোক বা জিনিষ কিনেই হোক। এখন জল-সরবরাহ ব্যবস্থাটা শেষমেষ কি দাঁড়াবে তার সাথে আপনারা দুধ-পুকুরের গল্পর মিল খুঁজে পেতে পারেন। নোংরা ব্যাপার হল যে সর্বত্র এটা ঘটছে এবং সর্বস্তরে চরম ভাবেই।

কিন্তু এ তো হল সবচেয়ে মোটা দাগের প্রসঙ্গ। আমি অন্যদিক থেকেও বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। সেটা হল আমাদের এই বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী ও পুরুষ কর্তৃত্ব ভিত্তিক সমাজে ইউরোপ থেকে আসা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেশার ফলে যে জটিলতা তৈরী হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি। আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে দোতলা বাসের একতলার ভিতরটা এত চাপা লাগে কেন? তিনি বলেছিলেন যে বাসের ডিজাইন নাকি ঠাণ্ডার দেশ ইংল্যাণ্ডের মাপে করা তাই এরকম। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না কিন্তু এই নকশাটা আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। অথচ আমি জানি না আধুনিক পশ্চিমি গবেষণার জগতে আমাদের উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপযুক্ত পোশাক-আশাক বা খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে ভাবনা চিন্তার গণস্তরে কোন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে কিনা।

এ প্রসঙ্গে অনেকে বলতেই পারেন যে যাতে আমাদের লাভ তাই-ই আমরা করব। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আমাদের যে বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে তা আমরা গ্রহণ করেছি। না হলে তো আমরা টিকতে পারতাম না। এই বক্তব্য খুব বড় মাপের। আর এর মধ্যে অনেক স্তর, অনেক জটিলতা আছে। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুফল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেই অনেকে তেড়ে এসে বলেন তোমরা কি 'দাও ফিরে সে অরণ্য .........' চাও? এটা একটা বাধা গতের রি-অ্যাকশন। এমন কে আছে যে টিবি হলে 'রিফ্যামপিসিন' ওষুধের উপকারকে অস্বীকার করবে। কিন্তু প্রশ্ন আছেই। সেটা অন্য অনেক স্তরে। আমরা 'পেনিসিলিন' তৈরীর প্রযুক্তি যেমন পেয়েছি, তেমনিই 'এ কে ৮৭' বন্দুকের প্রযুক্তিও পেয়েছি। দুটোর আরও উন্নতিকেই কি আমরা এক চোখে দেখব? তথাকথিত প্রযুক্তি- নির্ভর উন্নত দেশগুলোতে যে বিরাট মাপের পরিবেশ-দূষণ বা নিউক্লিয়ার অস্ত্রর সমস্যা হচ্ছে তার দিকে কি আমরা তাকাব না?

তাছাড়া আমাদের উপমহাদেশে তো ব্যাপক মানুষ খুবই গরীব। তাদের জীবন-যাপন খুবই সমস্যা আক্রান্ত। তারই মধ্যে যদি আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক কোন বিপদ নেমে আসে তবে তার ফল 'খুব বেশী মারাত্মক' হতে বাধ্য। আমার এই কথা ভাষার দুর্বলতার জন্য ভালভাবে নাও বোঝা যেতে পারে। তাই আমি দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। একটি যা বাস্তবে ঘটেছে। অন্যটি একটি অনুমান।

ভূপাল দুর্ঘটনার কথা ভাবুন। গরীবদের বস্তি ঘেরা একটা কারখানা, যার আদত মালিক আমেরিকানরা। বিপর্যয় ঘটল। কয়েক লক্ষ নারী-পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। কয়েক হাজার মারা গেলেন। এঁদের বাচ্চা, তাদের বংশধর— এঁদের ওপর কি কু-প্রভাব পড়বে আমরা জানি না! আমার অনুমান ধনী, সাদা চামড়ার আমেরিকানদের এলাকায় ঘটনাটা ঘটলে 'ইউনিয়ন কার্বাইড' উঠে যেত। জেলে যেতে হত বা আত্মহত্যা করতে হত মালিকদের। পাশাপাশি চিকিৎসাও হাত গ্যাস-আক্রান্তদের ভালভাবেই। এখানে কি হয়েছে আপনারা জানুন। খোঁজ নিন। পাশাপাশি আপনারা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে 'চেরনোবিলের' দুর্ঘটনার কথা শুনেছেন। কি প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হয়েছে সেখানে, বিপর্যয়কে একটু কমাতে। কত সম্পদ খরচা করতে হয়েছে দু' এক জনকে বাঁচাতে। এই জিনিষ যদি আমাদের দেশের আদিবাসী এলাকার মাঝখানে 'কাইগা' বা 'কাকরাপাড়' নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হয়, পারবে আমাদের কর্তারা ২৪ ঘন্টার মধ্যে কয়েক লক্ষ লোককে বহু দূরে নিয়ে যেতে? পারবে জরুরী ভিত্তিতে 'বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যানটেশনের' মত দুরূহ অপারেশন করাতে?

প্রশ্নকে আর একটু অন্য ভাবে গোছান। বলুন তো আমাদের কি ভূপালে তৈরী কীটনাশক বা তারাপুরে তৈরি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎশক্তি খুবই প্রয়োজনীয়? তারজন্য কি এত বড় মাপের দাম দিতে আমরা রাজী আছি?

এখানেই আসে মানসিকতার প্রশ্ন। দেশের ৫০ ভাগ লোকের কথা বাদ দিন। যাঁরা তলায় আছেন তাঁদের ইচ্ছার কোন দাম নেই— এটা কঠিন বাস্তব। কিন্তু, যাঁরা সুইচ টিপে আলো জ্বালান বা যাঁরা মোটর-চালিত যানবাহন ব্যবহার করেন তাঁরাও কি 'সচেতন'? সুইচ টিপলে আলো জ্বলে ঠিকই কিন্তু তার পিছনে কি কি ঘটে সে ব্যাপারে কতজন ওয়াকিবহাল? লোকাল ট্রেনে নিজের কানে শুনেছি 'ওরে, এখন লোডশেডিং করে বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখছে, পুজোর সময় লাগবে তো।' কি ভয়ঙ্কর উদাসীনতা। বিদ্যুৎ পাওয়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন অথচ একটুও ইচ্ছে নেই প্রকৃত অবস্থাটা একটু বুঝে বিকল্প খোঁজার চেষ্টার ওপর দাঁড়িয়ে লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলার। বলতে পারেন এসব তো 'বিশেষজ্ঞ'দের ব্যাপার। হ্যাঁ, তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশী! কারণ তাঁরা আপনার-আমার পয়সায় উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কি করবেন? পেনিসিলিন শিল্পে মালিক চুরি করে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে—এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞদের কাছে গেলেন এক বন্ধু। জানতে চাইলেন পেনিসিলিনের নানান খবর। কেউ বললেন ওটা আমার বিষয় নয়— ওমুকের কাছে যান। কেউ বললেন— আমি শুধু এইটুকু জানি, এর বাইরে কিছু জানি না। এসবেরও ওপর দিয়ে গেলেন আর একজন, তিনি বললেন—পেনিসিলিন! সে তো আর কাজে লাগে না।' তিনি জানেন না যে আজও আমাদের দেশের সরকারী ক্ষেত্রে পেনিসিলিন হলো প্রধান অ্যান্টি-বায়োটিক,

যাকে বলা হয় 'গরীব লোকের ওষুধ'। ভূপাল-দুর্ঘটনার পরে গ্যাস-পীড়িতদের সাহায্য করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের একজন বলছিলেন যে অনেক বিজ্ঞানীই তাঁদের এমনকি ছোট-খাট পরীক্ষাও নিজেদের গবেষণাগারে করে দিতে চাইছেন না, পাছে তাঁদের 'কেরিয়ার' খারাপ হয়ে যায়। এই 'বিশেষজ্ঞরা' কেন তবে গ্রাম্য দক্ষ কারিগরদের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা-সম্মান পান?

আমার মনে হয় আমাদের প্রাচীন সমাজে আধুনিকতা ঢুকেছে বটে তবে তা বিকৃত সব অবস্থা ও মানসিকতা তৈরী করেছে। ধরুন অডিও বা ভিডিও ক্যাসেট গানকে গ্রামের প্রান্ত অবধি সস্তায় নিয়ে গেছে, আবার উত্তর ভারতে এর মধ্য দিয়েই প্রচার হচ্ছে কুৎসিত সব সাম্প্রদায়িক ছড়া বা বক্তৃতা (উদাহরণ, বেদ প্রকাশের ছড়া বা ঋতাম্ভরা দেবীর বক্তৃতা), কম্পিউটার গ্রাফিক্সে কেউ হয়ত এঁকে ফেললেন রামভক্ত হনুমানের ছবি।

আমার মনে হয় এই প্রসঙ্গটি খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। আমি শুধু বলতে চাইছি যে প্রশাসকরা আমাদের এখানে ইউরোপ-আমেরিকা বসাতে চাইছেন, তাঁরা সুপার কম্পিউটার, আধুনিক অস্ত্র ব্যবস্থা, সুপার মার্কেট আনতে চাইছেন। প্রশ্ন হল যে এক তো তাঁরা এটা পারবেন কি না সে ব্যাপারে গভীর সন্দেহ আছে। পৃথিবীতে এত সম্পদ নেই যাতে গরীব দেশগুলোতে ব্যাপক ফ্রিজ, গাড়ী, টিভি-ভিত্তিক সভ্যতা বজায় রাখা যায়। কিন্তু আরও বড় প্রশ্ন হল এটা কাম্য কিনা। নির্বিচারে আমাদের প্রশাসকরা যা আনছেন তা কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বতেই বিরাট প্রশ্নর মুখোমুখি হচ্ছে। আমার বক্তব্য আমাদের এখানে বিপদটা হবে আরও অনেক বেশী। গোটা নর্মদা নদীটাকে বড় বড় বাঁধ দিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। মধ্য ভারতের ম্যাপ নতুন করে আঁকতে হবে এত বিশাল মাপের প্রকৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে। ওখানকার মানুষ দেখছেন কত বিরাট বিরাট জঙ্গল জলের তলায় চলে যাবে। এটা কি এতই প্রয়োজনীয় ছিল? প্রযুক্তির ফর্মুলাটা তো স্থানীয় আদিবাসী মানুষ, (যাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে) গভীর সুন্দর জঙ্গল— এসবকে ধরেই করা যেত। এক তো কন্ট্রাক্টর, প্রশাসক, রাজনীতিবিদদের টাকা চুরি, পাশাপাশি একটু দুর অবধি না দেখতে পাওয়া, সব মিলিয়ে মিশিয়ে অবস্থাটা এরকম হচ্ছে।

আমাদের পরম্পরা-ভিত্তিক জ্ঞান (যেমন ট্রাইবাল জীবন থেকে পাওয়া নানান উপাদান) খুবই প্রয়োজনীয়। এক বন্ধু বলছিলেন বাংলাদেশের প্রচুর জল জমে থাকা অঞ্চলের কথা। সেখানে কিভাবে জলের মধ্যে একরকম কলসীর ওপর বসে ধান কাটা হয়। কি ভাবে ধান গাছকে ব্যবহার করে জলের ওপর প্ল্যাটফর্ম (নাম মনে হয় 'গাতোয়া') তৈরী করে তার ওপর শসা, ঢ্যাঁড়স বা চিচিঙ্গা ফলানো হয়। এখন যদি এই জলকে অভিশাপ মনে না করে এর ওপরেই সহায়ক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তবে সুফল পাওয়া যেতেই পারে। অথচ তার বদলে ব্যাপক পোকা মারার ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফল হল 'মাঠের মাছ' নামক বস্তুটি লুপ্ত হতে চলেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যেহেতু এই মাছের সুনির্দিষ্ট মালিক হয় না তাই গরীবরাও এই মাছ পেত।

এসব ব্যাপারে কিছু বলার নেই। যদি প্রায় ৮০,০০০ কারখানা বন্ধ থাকে তবে 'বিকল্প প্রযুক্তি'র কথা কি বলব? মন হতাশায় ভরে যায়। পরিবেশ-দূষণ হোক কি কারখানা বন্ধ,

আগে মার খান গরীবরা, বিশেষতঃ গরীব পরিবারের নারীরা। একই পরিবারে থেকেও আলাদা করে তাঁরা কম পুষ্টি পান। মধ্যবিত্ত মহিলাদের রান্নাঘরের খাটনি কমাবার ছিঁটেফোটা ব্যবস্থা হলেও নীচের দিকে উন্নতি কিছুই ঘটেনি। সন্তানধারণ, ঘরে-বাইরে পরিশ্রম— এঁদের অবদানের বেশীর ভাগটাই হল অদৃশ্য।

তবে দু একটি উজ্জ্বল উদাহরণের কথা শোনা যায়। মহারাষ্ট্রে সাংলি জেলায় মানুষজন নিজেদের বাঁধ নিজেরা তৈরী করে (বলিরাজা বাঁধ) জলকষ্ট কমাবার দিকে এক পা এগিয়েছেন। বোম্বের ' কামানি টিউবস' কারখানা শ্রমিকরা চালাচ্ছেন বন্ধু বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। আমাদের এখানেও নিম-মার্গোর কারখানা ক্যালকাটা কেমিক্যালস এই পথে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। স্বাভাবিক কৃষি, সৌরশক্তি বা ইকোলজি এসব নানান ধারণার কথাও শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু এখানেও বড় প্রশ্ন হল মালিক, বিশেষজ্ঞ না জনসাধারণ— কার হাতে থাকবে নিয়ন্ত্রণ। এ প্রসঙ্গে ছোট একটি উদাহরণ দিয়েই আমার কথা বলা শেষ করছি। আপনারা জানেন কলকাতা শহর প্রতিনিয়ত এক বিরাট পরিমাণ ময়লা আবর্জনা তৈরী করে। আমরা অনেকেই জানি না পূর্ব কলকাতার 'ধাপা' অঞ্চলের কিছু মানুষ এই ময়লা জল ও আবর্জনাকে ব্যবহার করে মাছ ও শাক-সবজি ফলায়। নীরবে সবার চোখের আড়ালে এঁরা বাঁচাচ্ছেন কলকাতার জীবনকে। যদি সম্মানই দেখাতে হয় তবে ডক্টরেট পাওয়া বিশেষজ্ঞদের বদলে এঁদের মত মানুষদেরই শ্রদ্ধা জানাব আমি।

*পটভূমি*, অক্টোবর, ১৯৯১

# অন্য চোখে রিও মহাসম্মেলন

খবরের কাগজে রিও সম্মেলন নিয়ে নানান লেখালেখির ওপর চোখ বোলাতে গেলেই প্রথম যে ব্যাপারটা চোখে পড়ে তা হলো আজকের দুনিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি বা জোট বাঁধাটা কেমন পাল্টে গেছে। ধরুন 'নর্থ' এবং 'সাউথের' লড়াইয়ের কথা। বা 'জি সেভেন' এবং 'জি সেভেন্টিসেভেন' এর মধ্যে মতবিরোধ। জি সেভেন্টিসেভেন-গরীব দেশের সরকারগুলোর জোট। এখন নেতৃত্বে আছে পাকিস্থান সরকার। আবার শুধু যদি দেশ ধরে ধরে হিসেব করা যায় তবে জি সেভেনের মধ্যে তিন পক্ষের স্বার্থের লড়াই আছে। আমেরিকা এক পক্ষ। জাপান আর এক। রইল বাকি ইউরোপের দামী দেশগুলো যথা ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড আর ইতালি। তারা ই সি (ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি) ভুক্ত দেশ হিসেবে এক ছাতার তলায় দাঁড়িয়েছে। এরা যেমন আলাদা আলাদা, আবার গরীব দেশগুলো কিন্তু এদেরকে এক সাথেও দেখছে। যেমন বড়লোক দেশ মানে 'নর্থ' আর গরীব দেশ মানে 'সাউথ'। 'সাউথ' অভিযোগ আনছে 'নর্থের' বিরুদ্ধে যে পৃথিবীতে প্রতি ১০০ জনে তোমাদের লোক ১৬ জন। অথচ তোমরা মোট খাবারের ৬০ ভাগ খেয়ে ফেলছ। মোট শক্তির ৭০ ভাগ তোমরা খরচা করছ। মোট শিল্পে ব্যবহারের কাঠ ৪০ ভাগ নিয়ে নিচ্ছ। কাজেই তোমরা পরিবেশ ধংসের জন্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী দায়ী। এই সব কথা তো পরিবেশ আন্দোলনেরই কথা। খাঁটি কথা। গরীবদেশের শহর কোলকাতায় বসে খবরের কাগজে পড়তে ভালই লাগে। এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সেটা হল একটা দেশ, তার সাধারণ মানুষ এবং দেশের সরকারের মধ্যে তফাতটা। পরিষ্কার করে বলতে পারলাম না। হয়ত তাই আর একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ধরুন 'আর্থ' সামিট বা পৃথিবী নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন, যার একটা পোশাকি নাম আছে-'ইউনাইটেড নেশনস্ কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্টাল ডেভলপমেন্ট। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ডাকে পরিবেশ আর উন্নয়নের ওপর জরুরী এই মহাসম্মেলন হয়ে গেল জুন মাসের শুরুতে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল দেশের মস্ত শহর রিও ডি জেনিরোতে। এই সম্মেলন সরকারি সম্মেলন। অর্থাৎ ১৮৫ টি দেশের মন্ত্রীও আমলারা এক জায়গায় এলেন (প্রায় ১৬০ টি দেশের সরকারের প্রধানরা যোগ দিয়েছিলেন এখানে)। বুঝতেই পারছেন কি বিশাল ব্যাপার। শোনা গেছে যে এর প্রস্তুতিতেই নাকি আড়াই কোটি কাগজের পৃষ্ঠা খরচা হয়েছে। শুধু ভারত থেকেই প্রায় এক টন সরকারি নথিপত্র গেছে রিওতে (এছাড়া গেছেন বড়-মেজো-সেজো নানান দপ্তরের কর্তারা। কংগ্রেস সাংসদ মণিশংকর আয়ার-ও এ নিয়ে ঠাট্টা করে তাঁর লেখার শিরোনাম দিয়েছেন 'বাবুক্রেসি')। এই মহাভারত নিয়ে চর্চা করে শেষ পর্যন্ত তিনটি অংশে বিষয়গুলিকে ভাগ করা হয়। একটি হল গ্রীন হাউস

গ্যাস বেরোন এবং অন্যান্য নানান কারনে পৃথিবীর গরম হয়ে ওঠা ও তার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তনকে আটকাবার প্রস্তাব (ক্লাইমেট চেঞ্জ কনভেনশন)। দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীতে যে নানান ধরনের গাছ, পোকা-মাকড়, জীবজন্তু (জানা গেছে প্রায় ১৪ লক্ষ প্রজাতির পরিচয়। আরও ৮০ লক্ষ থেকে ৮ কোটি প্রজাপতি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ভবিষ্যতে) প্রভৃতি আছে তাদেরকে বাঁচান সংক্রান্ত চুক্তি (বায়োডাইভার্সিটি ট্রিটি)। তৃতীয় বা শেষ বিষয় ছিল স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে জঙ্গল বাঁচানো অবধি ১১৫৫ টা প্রোগ্রামের একটা মোটা দলিল (গোড়ায় আটশ পাতা থেকে সেটাকে কমিয়ে আনা হয় পাঁচশয়—'অ্যাজেন্ডা টুয়েন্টি-ওয়ান' নাম দেওয়া হয়।

স্বাভাবিক নিয়মেই ইরাক যুদ্ধ বিজয়ী আমেরিকাও এই সম্মেলনে প্রচন্ড ঔদ্ধত্য দেখায়। তারা বায়োডাইভার্সিটি চুক্তিতে সই করতে রাজি হয় না। 'ক্লাইমেটচেঞ্জ' প্রশ্নে প্রস্তাব বদলে দিতে চায় এবং অবস্থাটা এমনই দাঁড়ায় যে অন্যান্য বড়লোক দেশগুলোর সরকাররাও আলাদা অবস্থানে চলে যেতে থাকে।

*কিন্তু এসবই তো বহুল প্রচারিত খবর। যেমন খবর মালয়েশিয়ার পরিবেশপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদের চড়া সুরের বক্তৃতা— যে বক্তৃতা গরীব দেশের ওপর ধনী দেশের চেপে বসার বিরুদ্ধে এক জ্বালাময়ী ধিক্কার।* আসল প্রশ্ন হল লড়াইটা কি নিয়ে? এক কথায় যার উত্তর হল টাকা-পয়সা, ইংরেজিতে যাকে বলব 'ফান্ড'।

প্রশ্নটা একটু বড় করে দেখা যাক। আমি শুরু করছি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বুত্রোস ঘালির কথা দিয়ে। রিও সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন যে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ধ্বংসের ক্ষেত্রে 'যে দায়ী তাকেই পয়সা দিতে হবে।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে কোথাও প্রয়োজনের বেশী উন্নয়ন হয়েছে, কোথাও বা কম এবং দুটোই ক্ষতিকারক। তিনি আরও বলেন সামরিক খাত থেকে টাকা পয়সা সরিয়ে আমাদের গ্রহের উন্নতি আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে উন্নত দেশগুলোকে প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে গরীব দেশগুলোকে।

কথাগুলোর যুক্তি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না সাধারণ ভাবে। এই প্রশ্নেই তাই চেপে ধরা হয়েছে বড়লোক দেশের সরকারগুলোকে। এমনকি বিশ্বব্যাঙ্কও বলছে যে পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন করতে হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক এও বলছে আমাদের গ্রহ যে ভয়ঙ্কর পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যায় ডুবতে বসেছে তার খরচা 'উন্নত' দেশগুলোরই দেওয়া উচিত, টাকার অঙ্কে যা বছরে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার দাঁড়াবে। পরিবেশ রক্ষায় বিনিয়োগও করতে বলেছে ব্যাঙ্ক। ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯২ অনুযায়ী বিনিয়োগের আনুমানিক হিসেব হল যে তা ৭৫ বিলিয়ন ডলারে উঠতে পারে। আমেরিকার গণমাধ্যম বলছে যে তৃতীয় বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার জন্য চাইছে ১২৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু বড়লোক উন্নত দেশগুলোর পকেট থেকে ৬ বিলিয়ন ডলার বের করাই ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলত আর্থ সামিটে গরীব দেশের সরকারগুলো প্রায় আন্দোলনে নেমে পড়ে। তাদের ভাষাও হয়ে ওঠে আন্দোলনের ভাষা। আর এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট চেহারা নেয়। সরকারে সরকারে লড়াই হচ্ছে। গরীব দেশের সরকার গরীব আদিবাসী, কৃষক, নানান নিপীড়িত মানুষের ভাষা, তাদের সংগ্রামের আওয়াজ নিজেদের গলায় তুলে নিচ্ছে। তারা টাকা পেলে পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বের পথে উন্নয়ন করবে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবসা

জমে উঠবে। দেশী কোম্পানী, আর তার বড় দাদা বিদেশী কোম্পানী 'পরিবেশ যন্ত্রপাতি' বেচবে। যেমন মোটরগাড়ি বা কারখানার চিমনীতে কালো ধোঁয়া বন্ধ করার মত দামী যন্ত্র, 'নিরাপদ' পারমানবিক চুল্লী। আমাদের প্রশ্ন—সব থাকবে আর আমরা ইউরোপ আমেরিকা হয়ে উঠবো শুধু কিছু কিছু নতুন টেকনোলজি বসিয়ে? আমাদের দেশের কোনো প্রকল্প কিভাবে হচ্ছে আজকাল সে তো অনেকেই জানেন। ধরুন জল দূষণ মুক্ত করার বড় কোনো দশ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু হল। জনে জনে কমিশন দিয়ে আসল কাজ কতটুকু হবে? কন্ট্রাক্টর কত নেবে? — এ তো একটা দিক। অন্য খুব জরুরী দিক হল কে ঠিক করবে প্রকল্পটা কেমন হবে? অল্প কিছু আমলা — বিশেষজ্ঞ আর যে নারী পুরুষ জলদূষণের শিকার, তাদের মতামত কে নেবে? তারা কি ভাবে অংশ নেবে, নিয়ন্ত্রণে রাখবে এইসব কর্মোদ্যোগ?

এই পথে এগোনোর কোন চেষ্টা কি রিও সম্মেলনের মঞ্চ থেকে করা সম্ভব ছিল? আর এইখানেই তৈরী হয়ে ওঠে একটি প্রশ্ন। সেটি উন্নয়নকে ঘিরে। উন্নয়নের একটি ছবি এখানে আসছে। সেটি হল ইউরোপ আমেরিকা হয়ে উঠতে চেষ্টা করা। গরীব দেশের হয়ে গরীব দেশের সরকার বলছে 'আমাকে টাকা দাও। আমি ফাইল-লাল ফিতে -টেন্ডার-কন্ট্রাক্ট এই পথে উন্নয়ন করবো। তুমি যা হয়েছো তা হয়ে ওঠা থেকে তুমি আমায় আটকাতে পারনা'। অন্য দিকে আকাশের ওজন স্তরে ফুটো, পৃথিবীর গরম বেড়েসমুদ্রের ধারের জনপদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিষাক্ত তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়া এসবই তো ইউরোপ আমেরিকার উপহার।

তবে এইখানেই আবার সরকারও তার কাজকর্মের সাথে দেশ ও দেশের মানুষকে এক করে দেখায় প্রশ্নটি ফিরে আসছে। আসলে আমার মনে হয় প্রশ্নটা নানান স্তরে আছে। ধরা যাক স্বেচ্ছা সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের কথা। তাঁরা বলছেন আমেরিকানরা বছরে ১৮০০ কোটি বাচ্চার 'ডায়াপার' আর যে পরিমাণ অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো ফেলে দেন তা দিয়ে ৬০০০ জেট প্লেন তৈরী হয়ে যেতে পারে। বড়লোক দেশের একজন লোক নাকি গরীব দেশের একজনের তুলনায় ১৫ গুণ বেশি কাগজ, ১০ গুণ ইস্পাত আর ১২ গুণ বেশি জ্বালানি ব্যবহার করে। তাঁরা বলছেন গরীব দেশ গুলোতে নীচের তলার ৬৩ কোটি নারী-পুরুষের খাওয়া দাওয়া প্রায় 'না' এর ঘরে এসে ঠেকেছে। এর ওপরে ৩৪০ কোটি মানুষ, যাঁদের মধ্যে মধ্যবিত্তরাও পড়েন তাদেরও শাক পাতার ওপরই টিকে থাকতে হয়। পাশাপাশি আমেরিকানদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট লাল মাংস-যার এক পাউন্ড পেতে পাঁচ পাউন্ড শস্য খাওয়াতে হয় পশুটিকে।

তাঁরা আরও বলেছেন নতুন আমেরিকান গাড়িগুলোর ১০টার মধ্যে নটাই এয়ার কন্ডিশনড্। এরাও পৃথিবীকে আরও গরম করে তুলছে। প্রশ্ন তুলেছেন এমনকি 'পটেটো চিপস' খাওয়া নিয়েও। কারণ আলু থেকে 'পটেটো চিপস' বানাতে অপচয় হয় এক বিশাল শক্তি।

এইসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থারা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন রিওতে। ফ্ল্যামেঙ্গো পার্কে 'আর্থ সামিট'এর পাশাপাশি তাঁরা তৈরী করেছিলেন তাঁদের নিজস্ব মঞ্চ নাম — 'গ্লোবাল ফোরাম'। এঁরা অনেক সুন্দর তথ্য তুলে ধরেছেন। বিক্ষোভ দেখিয়েছে জর্জ বুশের বিরুদ্ধে। ওয়ার্ল্ড ওয়াচ তো বলেছেনই যে 'এক সহজ সরল জীবন যাত্রা চাই'। এসবই তো সঠিক কথা। যারা কিনছে এঁরা তাদের দিকটা দেখছেন। তাদের বদলাতে বলছেন। কিন্তু যদি বিক্রেতাদের

দিকটা দেখা যায় যারা বেচছে! টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন একদিকে। অন্যদিকে নানান অস্ত্র, কীটনাশক থেকে শুরু করে অজস্র পেট্রোকেমিকলেস প্রোডাক্ট। আরও কতকি ? সরকারের মুখ দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ব্যবসাই কথা বলে ওঠে না কি ? আগে পরিবেশ বিপদ ততটা ছিল না। পৃথিবীকে নিঃশেষ করে কাঁচামাল থেকে অবিরত জিনিষ পত্র তৈরী করতে করতে যখন সর্বনাশের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সবাই তখনই আওয়াজ করে উঠলো 'পরিবেশ বাঁচিয়ে উন্নয়ন কর'। এই ব্যবসা তখন কি চাইবে না এই নতুন দিকও তার কুক্ষিগত হোক? সে কি চাইবে না যে পরিবেশের সমস্ত কন্ট্রাক্ট বিশেষ করে গরীব সরকারগুলোর কাছ থেকে সেই-ই পাক ! আর তা যদি সম্ভব করতে হয় তবে উন্নয়নটা হবে একই রকম, শুধু তারই তৈরী সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় সেই বসাবে নতুন দূষণবিরোধী যন্ত্র। তৈরী করবে নতুন শক্তি বাঁচানো চকচকে গাড়ির মডেল। আর এইসব লুটের অধিকার টিকিয়ে রাখতে গেলে টাকার যাতায়াত, সরকারি পদ্ধতি এইসব ব্যাপারে হাত দেওয়া চলবে না। পরিবেশের প্রশ্নটাকে মানুষের জীবনের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে বলতে হবে 'এ সবই টেকনিক্যাল প্রশ্ন'।

অথচ শুধু টেকনিক্যাল দিকগুলো বলেও আমেরিকান সরকারকে রাজি করানো যায় নি রিওতে কোনো ছাড় দিতে। কারণ ছাড় দিতে হলে হয়তো ব্যবসার গায়ে লাগবে। ব্যবসা— যার হাত উত্তর পার হয়ে দক্ষিণের কোণে কোণে প্রসারিত। এই সুতো ধরেই হয়তো ভারতীয় ব্যবসার মুখপাত্র 'ফিকি' ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজও রিও সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলোর সবুজ হয়ে ওঠার কথা বলেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলেছে নতুন 'সবুজ ব্যবসা' নিয়ে পৃথিবীর বাজারে ঢোকার কথা।

অর্থাৎ ব্যবসা, বাজার এসব ঠিক থাকবে— শুধু জুড়বে পরিবেশের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার কথা। একটা স্তরে রয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ইউ.এন.ও., বড় রাষ্ট্রের সরকার, অন্য স্তরে রয়েছে ফিকি, ছোট রাষ্ট্রের সরকার, এরা। সতর্ক হয়ে দেখা দরকার কে কি বলছে, কে কি করছে।

শুরু করার জন্য এইটুকুই বলা যায় যে, পরিবেশ বাঁচানো, পৃথিবীকে বাঁচানোর প্রশ্নটা অনেক বড় মাপের। পরিবেশ দূষণ, সামাজিক দূষণ সবই একসাথে বোনা রয়েছে নানান সুতোয়। দূষণের সবচেয়ে বড় শিকারই হল গরীব নারী-পুরুষ। সেদিক থেকে ব্রাজিল দেশকে বাছাটা খুবই শিক্ষাপ্রদ, কেননা সে দেশেই রয়েছে বিলাসবহুল চকচকে শহরের মধ্যেই গরীবদের নোংরা, গাদাগাদি করে, থাকা বস্তিনগর। কংগ্রেস সাংসদ আয়ার দেখেছেন রিওর রাস্তায় সন্ধের পর মেয়েদের নেমে আসতে দুটো ডলারের আশায়। গুজব শুনেছেন যে রাস্তার বাচ্চাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুপরির অন্ধগলিতে যাতে তারা পৃথিবী বাঁচাতে আসা বড় কর্তাদের চোখের সামনে পড়ে বিব্রত না করে দেয়। আয়ার এও শুনেছেন, যারা যেতে চায় নি তাদের নাকি গুলি করে মারা হয়েছে।

হ্যাঁ, আয়ার, আপনি ঠিকই শুনেছেন। ব্রাজিলের শহরগুলোর রাস্তায় থাকতে বাধ্য হয় অসংখ্য বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। আর তাদের যে গুলি খেয়ে বা অত্যাচারিত হয়ে মরতে হয় তাও ঠিক কথাই।

আর এইখানে এসেই আমাদের মনে তৈরি হয় এক গভীর অস্বস্তি। 'শিশুদের জন্য পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর' পোস্টারের তলায় দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হতে থাকে অনেক অনেক প্রশ্ন।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, জানুয়ারী ১৯৯২

# খারোসি না হারাকিরি

জাপানের কথা উঠলেই আমরা প্রশংসার ভাষা খুঁজে পাই না। বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ না কি জাপানের কাছে ঘোল খেয়ে যাচ্ছে। ওদের কর্মক্ষমতা, দক্ষতার পাশে আমাদের কারখানা, আমাদের রেলওয়েজ, যোগাযোগ বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি—আরে ছোঃ। এসব কথা তুলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন। এইতো সেদিন আমাদের মেজকর্তা বলছিলেন জাপানি ম্যানেজমেন্টের কোনো তুলনাই হয় না। আর মজদুররা? মোটেই আমাদের মতো ঢিলেঢালা দেশী মাল নয়। তারা রীতিমত কাজ শুরুর খানিকটা আগে আসে আর ছুটির সময় পার করে বাড়ী যায়। হবে না এদের উন্নতি?

উনি যেটা বললেন না সেটা হল শুধু লম্বা সময় নয়, জাপানি মজদুর ছুটিও নেয় কম। একটা হিসেব অনুযায়ী জাপানে গাড়ী তৈরীর শিল্পে একজন আট ঘণ্টা খেটে গড়ে কাজ করে বছরে তিনশ দিন অর্থাৎ ২৪০০ ঘণ্টা। এই তিনশ দিনের কাজ যদি সে আড়াইশ দিনে সেরে ফেলতে চায় তবে যা হবার তাই অর্থাৎ দিনেরাতে কোন ছন্দ ছাড়াই খাটতে হবে তাকে।

অদ্ভুত এক প্রথা চালু রয়েছে আজকের জাপানে, যাকে বলে 'সার্ভিস ওভারটাইম'। এই প্রথায় মজদুর খানিকটা সময় কোম্পানীকে দান করে দেবে। অর্থাৎ সেই সময়টা সে খাটবে তার রোজকার কাজের পাশাপাশি কিন্তু খাতায় পত্রে সেটা দেখান হবে না।

সত্যি কথাটা হল ভয়ঙ্কর খাটুনির ফলে জাপানে মজদুর মৃত্যুর হার বাড়ছে। এদের বেশীর ভাগের বয়সই ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর। ১৯৯১ সালের জুন মাসে জাপানি ডাক্তার আর উকিলরা তথ্য জোগাড় করেছে—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি চারজনে একজন জাপানি মজদুর ভয় পাচ্ছে যে চল্লিশের কোটা সে আর পার হতে পারবে না। বাস্তবত যদি কেউ কাজের চাপে মারা যায় তবে তার শোকগ্রস্ত পরিবার বা তাদের উকিলকে প্রচণ্ড লড়তে হচ্ছে শুধু এইটুকু প্রমাণ করার জন্য যে মজদুরটি অত্যধিক খাটা-খাটনির ফলেই মারা গেছে। কোম্পানি বা সরকারি শ্রম দপ্তর কেউই এটা মানতে চাইছে না। ফলে তারা কোন ক্ষতিপূরণও দিচ্ছে না।

জাপানি সরকারের ঠিক করে দেওয়া নিয়ম বলছে যে—বেশী খাটা-খাটনির ফলে মৃত্যু তখনই বলা যাবে যদি হতভাগ্য শ্রমিকটি মৃত্যুর ঠিক আগে ২৪ ঘণ্টা একটানা কাজ করে থাকে, অথবা প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা হিসেবে পর পর ৭ দিন কাজ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

'৯১ সালে মে মাসে টোকিও হাইকোর্ট '৭৭ সালে মৃত 'দাই নিপ্পন' কোম্পানীর এক মজদুরের ব্যাপারে রায় দেয়। হাইকোর্ট বলে ২৪ ঘণ্টার শিফটে কাজ করার ফলে সে মারা গেছে। ফলে 'দাই নিপ্পন' কোম্পানীই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী।

এক নিষ্ঠুর মজার ব্যাপার হল যে বাড়তি কাজের চাপের ফলে 'নিকোটিন' মেশান পানীয়র বিক্রি বেড়ে গেছে। মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর নিকোটিনের ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিক্রি বেড়ে যাওয়ার কারণ—বিক্রেতারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে 'এই সরবত খেলে কোন ক্লান্তির ছাপ ছাড়াই আপনি একটানা ২৪ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন।' অন্যদিকে এই পানীয়র আসল ফল হল যে মাথার মধ্যে রক্তপাতে মৃত্যু বেড়ে গেছে।

কিছুদিন হল টোকিও থেকে ছাপা খবরের কাগজ 'আসাহি'তে একটা প্রবন্ধ বার হয়েছে। এই প্রবন্ধ বলছে যে একজন জাপানি মজদুর গড়ে খাটতে পারে মাত্র ১৫ বছর। মজা হল যে তার ওই ১৫ বছরের কাজের জীবনে সে কাজ করছে এক লাখ নয় হাজার ঘন্টা। এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ফ্রান্সের তুলনায় অনেক বেশী। 'আসাহি' লিখছে ওপরে বলা দুটো দেশে গড় হিসেব ছিয়াত্তর হাজার ঘণ্টা। একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিন্তু গড়ে একজন শ্রমিক কাজ করে ১৫ বছরের বেশী। তাহলে একজন জাপানি শ্রমিককে প্রত্যেকদিন কি ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আসলে এটাই হল নির্মম সত্য।

জাপানের রিসো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী হেদিও ফ্রাইইতর ব্যক্তিগত কথাবার্তায় জানিয়েছেন যে ১৯৯২ সালে যদিও কাজের ঘন্টার মান সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব জায়গায়ই অনেক বেশী সময় কাজ করার জন্য প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। মজদুর নিরূপায়, জাপানে আজ পেট চালানর খরচা হু হু করে বেড়ে গেছে। লেখাপড়া আর থাকার জায়গার খরচা তো আকাশ ছোঁয়া। দুটো পয়সা (ইয়েন) বেশী রোজগার করার চেষ্টায় জাপানি মজদুর আজ দেহে মনে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছে। আর এর ফল? চকচকে জাপানের কথা বলা বাবুরা শুনুন—চাঁদের উল্টো পিঠ হল প্রত্যেক বছর ২০ থেকে ২৫ হাজার জাপানি শ্রমিক হঠাৎই অচেতন হয়ে পড়ছে কারখানার মাটিতে। জাপানি ভাষায় একে বলা হয় 'খারোসি' (Kharoshi)। এই শব্দটা জাপানে ব্যবহার করা হয় বাড়তি কাজ আর চাপের ফলে মৃত্যুকে বোঝাতে।

জাপানি শ্রমিকের সামনে আজ তাই এই বিরাট সমস্যা। তার দুর্বল হয়ে পড়া ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেও ভাবতে হচ্ছে এসব নিয়ে।

আওয়াজ উঠছে রোবটের মত, যন্ত্রের মত, আর খাটব না। চাই মানুষের মত কাজ করতে।

** এই লেখাটি 'দি আদার সাইড অফ জাপানিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধর ভাবানুবাদ। মূল লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বুলেটিন—অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি'র অক্টোবর ডিসেম্বর '৯১ সংখ্যায়। এটি একটি PRIA প্রকাশনা।

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী,* নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯১ ; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২

# সবুজ আন্দোলন : উৎস ও বিস্তার

দ্বান্দ্বিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হত দুর্গাপুর থেকে। বিজ্ঞান আন্দোলনের নানান কাজে, এবং সত্যর দাদা ও দিদির থাকার সুবাদে দুর্গাপুরে প্রায়ই সত্যর যেতে হত। এরকম যেতে আসতে আলাপ হয় ও পরে বন্ধুত্ব হয় দ্বান্দ্বিক পত্রিকার সম্পাদক কামারুজ্জামানের সাথে। দ্বান্দ্বিক পত্রিকা তখন মার্ক্সবাদ, চলচিত্র, নন্দন তত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর আগ্রহী হয়ে উঠেছিল পরিবেশ আন্দোলনের ওপর। সত্যর আগ্রহ আর দ্বান্দ্বিকের আগ্রহের মেল বন্ধন ঘটল। দ্বান্দ্বিকের পরপর দুটো সংখ্যাই প্রকাশিত হল পরিবেশ আন্দোলন ভাবনার ওপর, সত্য দুটো সংখ্যাতেই লেখা লিখেছিল।

যুদ্ধ পরবর্তী যুগের আধুনিক জার্মান সমাজে উৎপাদন-নির্ভর এক যন্ত্রবাদী শিল্পসমাজের আবহাওয়া গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। বাজার-নির্ভর অর্থনীতি ও আমেরিকান সাহায্য হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তিশালী উপাদান ও উপকরণ। কিন্তু পাশাপাশি সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে ও আরো বেশী গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে জনগণের মধ্যে। জার্মান সৈন্যবাহিনী তৈরী করার সময়, ৫০-এর দশকে 'ওহনে মিখ' (আমাকে বাদ দিয়ে) আন্দোলন যথেষ্ট গণভিত্তি অর্জন করেছিল তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়। প্রায় গোটা ৫০-৬০ -এর দশক ধরে যুদ্ধ-বিরোধী (মূলতঃ নিউক্লিয়ার) আন্দোলন চললেও জার্মান রাষ্ট্র ও সমাজ সবচেয়ে বেশী নাড়া খায় ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি শুরু হওয়া ছাত্র-যুব আন্দোলনে। শিক্ষা-জগতের আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ক্রমশঃ জার্মান সমাজের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন ৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

### নাগরিক আন্দোলন

ছাত্র-যুব আন্দোলনের বিফলতায় তৈরী হওয়া শূন্যস্থানে জায়গা করে নিতে এগিয়ে চলো 'নাগরিক উদ্যোগ'। ৫০-এর দশক থেকে এ'জাতীয় উদ্যোগ শুরু হলেও ৭০-এর দশকেই প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবেশ-ধ্বংস বা নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিরোধিতায় নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। ছাত্র-যুব বিক্ষোভে থেকে এই আন্দোলন 'আদর্শ জার্মানীর ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করার উপাদান খুঁজে পায়। এই প্রথম বহু সৎ জার্মান যাঁদের অনুগত ও বাধ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, তারা প্রশ্ন শুরু করেন। প্রশ্ন উঠল প্রশস্ত রাজপথ, আকাশ-

ছোঁয়া বাড়ি, এয়ারপোর্ট বা সুপার মার্কেট-ভিত্তিক উন্নয়নর প্রসঙ্গে, প্লুটোনিয়াম সহ অন্যান্য ধ্বংসাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদনকারী নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র প্রসঙ্গে, জনবহুল এলাকার অসংখ্য কল-কারখানা তৈরীর ফলে ক্রমবর্ধমান জনপদ,নদী ও বায়ুদূষণের প্রসঙ্গে। কেননা সরকারী পরিকল্পনার ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের অন্ধকারে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না কর্তৃপক্ষের পক্ষে। এতদিন ধরে রাষ্ট্রনায়করা তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ববলে সব কিছুই জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে এসেছিল।

এই অবস্থায় ১৯৭২ সালের জুন মাসে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট শহরের কাছে মরফেল্ডে ষোলটি 'নাগরিক উদ্যোগ' গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে জাতীয় স্তরে পরিবেশ রক্ষার জন্য গড়ে তোলে 'নাগরিক উদ্যোগ ইউনিয়ন' (Federal Association of Citizen Initiatives for the Protection of the Environment—B.B.U.) ৭২-৭৩ সালেই তৈরী হল পরিবেশ দূষণ ও নিউক্লিয়ার শক্তি-বিরোধী 'আপার রাইন (নদী) অ্যাকশান কমিটি। উত্তর জার্মানীর সমস্ত গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়ে 'টিকে থাকার জন্য নাগরিক উদ্যোগ' (বি ইউ) এবং 'উপকূল অঞ্চলের নাগরিক অ্যাকশান' (বি কে) গড়ে তুলল।

উল্ফগাগং রুডিগের মতে ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি স্থানীয় 'নাগরিক উদ্যোগ'-গুলির সংখ্যা ছিল পনের থেকে কুড়ি হাজারের মত। ১৯৭৭ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে জাতীয় স্তরে বি.বি. ইউ-এর অন্তর্ভুক্ত সংগঠনের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে (সদস্য সংখ্যা আনুমানিক তিন লাখ)। এদের মধ্যে কেউ কেউ যদিও রাজপথ তৈরী বন্ধ করার মত স্থানীয় সমস্যাতেই আবদ্ধ থেকে ছিল, তবুও এই আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সারা দেশ জুড়েই (সারণী—১)।

## নিউক্লিয়ার শক্তি-বিরোধী আন্দোলন

এই আন্দোলন শুরু হয় বাডেন উওর্টেমবার্গ রাজ্যের উইহ্লে (Wyhl) নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণকে ঘিরে। স্থানীয় আঙ্গুর-মদ উৎপাদক, নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধীদের এবং বিশেষতঃ ফ্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সংগঠিত এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে জাতীয় গণ্ডী ছাড়িয়ে জার্মান, ফরাসী ও সুইসদের মিলিত মৈত্রী প্রয়াস হয়ে দাঁড়ায়। ৭৫ সালে পুলিশ অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থেকে হটিয়ে দেয়। পরের বার প্রায় ২০,০০০ নারী-পুরুষ আবার সে জায়গার দখল নেয়। অন্যান্য শক্তিকেন্দ্র অবরোধের তালিকায় রয়েছেব্রকডর্ফ I ৩০,০০০ বিক্ষোভকারী, অক্টোবর, ১৯৭৬; ব্রকডর্ফ II—৭০,০০০ বিক্ষোভকারী, ১৯৭৭; গোর্‌লেবেনে নির্মাণ-এলাকা দখল করে ২০,০০০ মানুষ, মার্চ ১৯৭৭; গ্রোহ্‌ণ্ডেতে একই মাসে ২০,০০০ জন। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ডাচ সহযোগিতায় স্নেলার ব্রুটারে ৭০,০০০ জনের বিক্ষোভ প্রদর্শন।

আন্দোলন এগোতেই থাকে, ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হ্যারিস্‌বার্গ দুর্ঘটনার তিনদিন পর গোর্‌লেবেনের নিউক্লিয়ার বর্জ্য পদার্থের রিপ্রেসেসিং প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে হ্যানোভার শহরে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার লোকের এক অভূতপূর্ব মিছিল বার হয়। ঐ বছরেরই শরৎকালে

রাজধানী বন্-এর রাস্তায় নামেন দেড় লাখ নারী-পুরুষ আর ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারী মাসে মিছিল অবরোধ নিষিদ্ধ করার পর অবিশ্বাস্যভাবে ব্রকডর্ফে জড়ো হন এক লক্ষ মানুষ—জার্মান রেলওয়েজ তাঁদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত নিউক্লিয়ার-বিরোধী যোগাযোগ গাইডে ৫০০০ সংগঠনের ঠিকানা পাওয়া যায়। 'নাগরিক উদ্যোগ'-এর ব্যাপ্তির এ' এক অনবদ্য উদাহরণ (সারণী—২)।

## ইকোলজি ও পরিবেশ আন্দোলন

জার্মানির মত পুঁজিবাদী, শিল্পভিত্তিক দেশে গোটা ৭০-এর দশক জুড়েই পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে গণ-সচেতনতা বেড়েছে (সারণী—৩)। মেয়ার টাসচ্-রে ৭২-৭৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ দূষণ বন্ধ করার জন্য উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী করছেন। এমন কি, এর ফলে তাঁদের চাকুরী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ আশংকা সত্ত্বেও। পরবর্তী আর এক সমীক্ষায় জানা যায় যে 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধি' কমিয়ে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন আশি শতাংশ মানুষ। ইকলজি আন্দোলনকে পরিষ্কারভাবে সাজালে দেখা যায় যে প্রথমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের অঞ্চলের সেইসব প্রকল্পের বিরোধিতা করছেন যা তাঁদের জীবনের ওপর আঘাত হানতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো মূল্যে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ভোগ্য পণ্যের পিছনে ছোটা—এই মানসিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন বহু মানুষ. এবং তৃতীয়তঃ যেভাবে বিভিন্ন মুনাফাখোর মালিকপক্ষ সাধারণ মানুষের সমস্ত আবেদন উপরোধকে উপেক্ষা করে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে চলেছে—তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, জনমত সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এইভাবে ইকলজি-ভিত্তিক সচেতনতা গোটা জার্মান সমাজকেই যথেষ্ট প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে চলেছিল। জার্মান ইকলজিক্যাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল পঁয়ত্রিশটা বিশেষ ধাঁচের গবেষণা মূলক সংগঠনের। বিভিন্ন খাবারের উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থের ওপর লেখা একটা বই তিন লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে দু'বছরেরও কম সময়ে। শুধু নানান রকম বই প্রকাশ করাই নয় — বিকল্প শক্তির জায়গাতে হাতেকলমে কাজও প্রচুর হয়েছে। জার্মান ইকলজিস্টরা তৃতীয় বিশ্বের নিকারাগুয়ার মত দেশের কাজ করেছন তাদের সঙ্গে সংহতি মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

সরাসরি আন্দোলনের কথা বলতে গেলে অবশ্য ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টের মত ঘটনা বলাই যায়। জঙ্গল কেটে নতুন রানওয়ে তৈরী করার এক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই 'রানওয়ে' তৈরী করার প্রস্তাব এক প্রতীকি চেহারা পেয়ে যায়। 'রঙীন টি-ভি-র সভ্যতা', 'আমেরিকান প্রভাব', 'প্রকৃতি ধ্বংস'-নানান দিক থেকে এই আন্দোলন সাড়া ফেলে দেয়। ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮১ স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে এক লক্ষেরও বেশী মানুষ রানওয়ে তৈরীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। গণভোটের দাবীতে বিক্ষোভকারীরা ঐ বছরই ১ লক্ষ ২০ হাজার সই সংগ্রহ করেন। কিন্তু টেকনিক্যাল অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ কিছুতেই গণভোটে রাজী হয় না। বিক্ষোভকারীরা প্রস্তাবিত এলাকা একটা বিকল্প গ্রাম তৈরী করেন. নারী ও শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত এই

'প্রতিরোধ-গ্রাম' ইকলজি-ভিত্তিক সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য ঐক্যের এক সুন্দর প্রকাশ ও সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে থাকে। এই গ্রাম ঐ অঞ্চলের মানুষকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে ও প্রেরণা যোগায় যে কর্তৃপক্ষ এটি জোর করে ভেঙ্গে দিলে তাঁরা ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আবার নতুন দশটি কুটীর তৈরী করে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

**শান্তি আন্দোলন**

১৯৭৬-৭৭ সালের নিউক্লিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনও আসলে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনেরই একটা অংশ। জার্মানীর মানুষেরা এটা অনুভব করছিল যে গোটা পশ্চিম ইউরোপ একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর বসে আছে যার নিয়ন্ত্রণ করছে বাইরে থেকে অন্য কেউ। দৃষ্টান্তমূলক কোনো যুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুরু করবে জার্মানীর বুকে—এমন একটা আশংকা জার্মানবাসীরা প্রথম থেকেই করে আসছিল। 'প্রথম আক্রমণ, ইউরোপের বুকে সীমিত নিউক্লিয়ার যুদ্ধ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে গভীর আক্রমণ'—এই সব শব্দ হোয়াইট হাউস যেভাবে ব্যবহার করেছে তা অনিশ্চয়তা আর আতঙ্ককে শুধু বাড়িয়েই তুলেছে। পশ্চিম জার্মানীর বুকে ৭০০০ নিউক্লিয়ার অস্ত্র জার্মান জনগোষ্ঠীকে বারুদের স্তূপের ওপর বসিয়ে রেখেছে। ইকলজি আন্দোলন মানুষকে প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে ও সতর্ক হতে শিখিয়েছে। সেখান থেকে এক পা বাড়িয়েই জার্মান শান্তি-আন্দোলন 'শান্তির জনে' আরো বেশী অস্ত্র তৈরী করার অর্থহীনতা ও বিপদের দিকে মানুষকে সচেতন করতে প্রয়াস চালায়। প্রচুর অস্ত্র উৎপাদনের সাথে আবার তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র ও অনাচার-বঞ্চনার ব্যাপারটাও সম্পর্কিত। তাই জার্মান শান্তি-বাদীদের আলোচনা সভায় নিকারাগুয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষদেরও কথা শোনা গেছে। আর তাই ১৯৮১ সালের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে সামিল হন আড়াই লক্ষ মানুষ। এক বছর পরে বন্-এ অনুষ্ঠিত ন্যাটো শীর্ষ বৈঠকের সময়ে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন লক্ষ। ৮৩ সালের শরৎকালের জার্মানী জুড়ে যুদ্ধের রাস্তায় নামেন দশ লক্ষেরও বেশী মানুষ। টিকে থাকার এই আন্দোলন (শান্তি আন্দোলন) অনুপ্রেরণা পেয়েছিল জীবনের জন্য আন্দোলন (ইকোলজি আন্দোলন) থেকে। ১৯৮২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে জার্মানীতে প্রতি দশ জনে চারজন শান্তি আন্দোলনের সমর্থক। এঁরা সবাই আলাদা আলাদা মতাদর্শের লোক, কেউ বা এসেছেন নিও-লেফ্‌ট থেকে, কেউ বা ক্রিশ্চিয়ান, আবার কেউ বা শান্তিবাদী। নতুন এই শান্তি আন্দোলন অনেক বেশী নির্ভর করেছে অপেক্ষাকৃত তরুণদের ওপর। প্রচলিত নেতৃত্বের ছকের বাইরে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক তরুণদের ওপর। প্রচলিত নেতৃত্বের ছকের বাইরে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ভাবনায় সম্পৃক্ত। তাই তৃতীয় বিশ্বর সাথে বিশেষভাবে নিজেকে সম্পর্কিত করা সহজ হয়েছে এর পক্ষে। রাশিয়ার আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপকেও পরিষ্কারভাবে সমালোচনা করেছে এই আন্দোলন। যোগাযোগ গড়ে তুলেছে পূর্ব ইউরোপের সরকারী আওতার বাইরে থাকা স্বাধীন শান্তি আন্দোলনের সাথে।

এক কথায় শান্তি আন্দোলন জার্মানিতে ন্যাটোর বাইরে নিয়ে আসা, আমেরিকার ওপর নির্ভরতা কমান এবং এককভাবে নিউক্লিয়ার নিরস্ত্রীকরণের জোরালো দাবি তুলেছে।

## বিকল্প আন্দোলন

সারণী—৪ ও সারণী—৫ দেখলেই বোঝা যাবে যে মূল্যবোধের পরিবর্তন জার্মান সমাজকে কেমন নাড়া দিয়েছে ৭০-এর দশক জুড়ে। যৌন নৈতিকতারও এক পরিবর্তন চোখে পড়ে এই সময়ে। কিন্তু মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের সবচেয়ে চমৎকার সূচক হল 'বিকল্প গড়ে তোলার আন্দোলন'। ১৯৭৭ সালের শরৎকালে বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত হয় টিউনিক্স কংগ্রেস। এখন থেকে ঘোষণা করা হয় প্রথানুগ জার্মানি মডেলের বাইরে যাবার কথা। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে পশ্চিম বার্লিনে একটি বিকল্প গোষ্ঠীর এক পরিত্যক্ত কারখানা দখল করে নেয়। মিউনিসিপ্যালিটিকে ভাড়া দিয়ে স্বত্ব পাবার পর তারা এর নাম দেয় 'সংস্কৃতি, খেলাধূলা ও হস্ত-শিল্পের কারখানা'। সমর্থকদের সাহায্যে এখানে শুরু হয় কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, কাচ ও কাপ-প্লেট তৈরির ওয়ার্কশপ। রুটি তৈরির জন্যে খোলা হয় বেকারী. বিক্রি শুরু হয় খাবার ও হস্তশিল্পজাত জিনিসপত্র। বিকল্প প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া হয় এখানে। বহু লোক সাইকেল সারানো বা অন্যান্য ধরনের হাতের কাজ শেখেন। শুরু হয় অবসর সময়ে নাটক, মূকাভিনয়, সঙ্গীত শিক্ষা ও খেলাধূলা। একসাথে বাঁচার এই সুরটি ধ্বনিত হয় আন্দোলনের বহু কেন্দ্রে।

১৯৮০ সালের হিসেবে ফেডারেল রিপাবলিক (পশ্চিম বার্লিন সমেত) জুড়ে এই ধরণের ১১৫০০ প্রকল্পের খোঁজ পাওয়া যায় যাতে কাজ করছিলেন (সারণী—৬) প্রায় ৮০,০০০ নারী-পুরুষ। পরবর্তীতে বেকারীর চাপে, গৃহহীনদের আন্দোলনের ফলে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। বিকল্প উদ্যোগের আর একটি প্রমাণ হল দৈনিক খবরের কাগজ ট্যাজ্ (ট্যাজেস্ জাইটুং)। ট্যাজের টিঁকে থাকাই জার্মান বিকল্প আন্দোলনের শক্তিকে প্রমাণ করে। ট্যাজের পাশাপাশি ছোটখাটো সব মিলিয়ে আরও ৭০০ স্থানীয় কাগজ, পত্রিকা, গাইড ইত্যাদির প্রকাশনা লক্ষ্য করা গেছে। এদের মিলিত প্রচার সাড়ে পাঁচ লক্ষের মত হবে। ৮৩-৮৪ সালের এক হিসাব অনুযায়ী স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও বিকল্প গড়ে তোলার গোষ্ঠীতে কাজ করছেন প্রায় তিন থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষ।

## নারী আন্দোলন

নাগরিক উদ্যোগ ও বিভিন্ন ধরণে নতুন আন্দোলনে মধ্যে দিয়ে যে নারী আন্দোলন জার্মান মুক্তিবাদী রাজনীতিতে জায়গা করে নিয়েছে তা শুরু হয়েছিল ৬০-এর দশকে ছাত্র আন্দোলনে পুরুষ নেতৃত্বের চাপিয়ে দেওয়া প্রচলিত নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে। যদিও এই আন্দোলনকে 'নতুন' বলা হচ্ছে তবু বলা যায় যে সমানাধিকারের মত বিষয়ের প্রশ্নে জার্মান নারী আন্দোলনের গত একশ বছরের ইতিহাসের পরম্পরা থেকেই এই আন্দোলন উঠে এসেছে। গর্ভপাতের মত বিষয়ে যেখানে বাচ্চা হবে কি হবে না এই ধরনে প্রশ্নের সাতে নারী অধিকারের প্রশ্ন, নারীর নিজের শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সব মিলিয়ে নারী আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে।

'নাগরিক উদ্যোগ' থেকে 'গ্রীনপার্টি' অবধি সংগঠনের প্রচলিত পুরুষকেন্দ্রিক কাঠামোটি নারী আন্দোলনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ক্ষমতার স্তর ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে এই ধরনের সংগঠনে। ঘরোয়াভাবে মেলামেশা, মিটিং-সর্বস্ব ভড়ং নয় বরং

বন্ধুত্ব-ভিত্তিক রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, সহযোগিতা ও কমনীয়তার মতো মানবিক অনুভূতিকে সংগঠনে নিয়ে আসা এরকম অনেক কিছুই নারী আন্দোলন জোরালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

**গ্রীন পার্টির জন্ম**

জার্ড ল্যান্‌গুথ্ গ্রীন পার্টি গড়ে ওঠার ইতিহাসকে পাঁচটি ধাপে পরপর সাজিয়েছেন। সেগুলি হল : ১. নাগরিক উদ্যোগ, ২. রাজ্য স্তরের সংগঠন, ৩. প্রথম জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক সংগঠন, ৪. জানুয়ারি, '৮০ সালে ফেডারেল স্তরে গ্রীন পার্টিপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, ৫. জার্মান পার্লামেন্ট বন্ডুস্ট্যাগে গ্রীন পার্টির জায়গা করে নেওয়া (১৯৮৩-তে)। এক্ষেত্র এই ব্যাপরটা খেয়াল রাখতে হবে যে, নাগরিক উদ্যোগ কিন্তু গ্রীন পার্টির মধ্য বিলীন হয়ে যায়নি। বরং নাগরিক উদ্যোগ এক মস্ত ছাতার কাজ করেছে যেখানে গ্রীন পার্টি জার্মান পার্লামেন্টে ও তার বাইরে সংগঠিতভাবে নাগরিক আন্দোলনে দাবিগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

ক্যালিডোস্কোপে ঝাঁকুনি দিয়ে যদি নক্‌শাটা একটু বদলে ফেলা যায় তবে আবার এই গ্রীন পার্টি গড়ে ওঠার অনারকম একটা আদলও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে যে ল্যান্‌গুথ্, বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরে গ্রীন সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীরা এই সব সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও বহু ধরনের মতবাদের বিকাশ ঘটছিল। একদম গোঁড়া পন্থীরা ছাড়া অনেকেই (এমন কি যাঁদের এস পি ও বা এক্সট্রা পার্লামেন্টারি অপোজিশন বলা হয় তাঁরাও) নতুন অনেক কিছু গ্রহণ করছিলেন। এঁদের অনেকেই এই পর্যায়ে গ্রীন সংগঠনে যোগ না দিলেও কাছাকাছি থাকছিলেন। ফলত পরিবেশ ও ইকলজি ধ্বংসের প্রশ্নে একমত হলেও গোটা আন্দোলনের মধ্যে ডান-বাম প্যারাডাইমের (মতাদর্শগত অর্থে) প্রশ্নটা চলে আসছিল। একটা কথা গ্রীন পার্টির গোড়ার দিকে শোনা যেত—'ডান নয়, বাম নয়, আমরা আছি সামনে'। এর অর্থহল. গ্রীন পার্টি ডান-বাম দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে এক নতুন স্তরে উঠবে এবং পুরোন দুটি মতবাদের ফিউশানের বা সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নতুন কিছু ধারণা গড়ে উঠবে। নতুন দিকে গ্রীনরা নিশ্চয়ই পা বাড়িয়েছেন বিকল্প উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই, পরে আমরা একটাও দেখবো যে অনেক ধরনের উপাদান থেকেই গ্রীন পার্টি রসদ সংগ্রহ করেছে কিন্তু গ্রীন পার্টি গড়ে ওঠার প্রাথমিক স্তরে এই বিভাজনটা (ডান-বাম) গভীর ভাবেই কাজ করেছে এবং রাজ্যে রাজ্যে এটা বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখা গেছে।

**রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কয়েকটি সংগঠনের পরিচয়**

১. এনভায়রনমেন্টালিস্ট গ্রীন স্লেট (জি এল ইউ)—ডানপন্থী রক্ষণশীল এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান পার্টি (ইউ এস পি) ও পুরোন ইকোলজি-ভিত্তিক জিল এল ইউ-র যৌথ সংগঠন (লোয়ার স্যাক্সনি)।
২. ইলেক্‌টোরাল গ্রুপ এগেইন্‌স্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার (ডবলিউ জি এ)—নিউক্লিয়ার বিরোধী,

সমাজতান্ত্রিক মতামত, বিক্ষুব্ধ ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠী অ্যাকশন কমিটি লাইফের সহযোগী (লোয়ার স্যাক্সনি)।

৩. রেনবো স্লেট (বি এল ডব্লিউ)—প্রায় ২০০ গোষ্ঠীর এক মিলিত প্রয়াস। এদের মধ্য আছে ভাড়াটিয়া, নারী, স্কুলছাত্র, অ্যাপ্রেন্টিস, পরিবেশবাদী, নিউক্লিয়ার বিরোধী, সমকামী, শহরসমস্যায় আক্রান্ত, বিদেশী, কয়েদী সৈনিক না-হতে চাওয়া মানুষ, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষাকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, উদার ও মুক্তিবাদী বামপন্থী (হামবুর্গ)।

৪. গ্রীন স্লেট স্লেসউইগ—হলস্টেইন (জি এল এস এইচ)—রক্ষণশীল, চরম ডানপন্থী যোগাযোগ, দুই জায়গার দুটি সংগঠনের মিলিত রূপ (স্লেসউইগ—হলস্টেইন)।

৫. ইলেকটোরাল ইনিসিয়েটিভ ফর এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাণ্ড ডেমোক্রাসি (জি এল ডব্লিউ)—বামপন্থী, স্বতঃস্ফূর্তবাদী (ফ্র্যাঙ্কফুর্ট)।

৬. গ্রীন অ্যাকশন ফিউচার (গ্যাজ)—বুর্জোয়া রক্ষণশীল, পরিবেশ রক্ষার জন্য একনায়কত্বের প্রবক্তা। (জাতীয় দল)

৭. অ্যাকশন কমিউনিটি অফ ইনডিপেন্ডেন্ট জার্মানস (আউড)—বাম জাতীয়তাবাদী, নিরপেক্ষ বিদেশ নীতির প্রবক্তা। কিছু সদস্যের নাজি যোগাযোগ ছিল। (জাতীয় দল)

৮. অল্‌টারনেটিভ স্লেঠ (এ এল)—বহু রকম বামপন্থী মতামত। এলাকা ভিত্তিক সংগঠন এবং বিষয়-ভিত্তিক সংগঠন। যেমন নারী অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ট্রেড ইউনিয়ন, বিদেশী শ্রমিক,ইত্যাদি (বার্লিন)।

### জাতীয় সংগঠন

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ আউড, গ্যাজ, জি এ ইউ, জি এল এইচ এবং থার্ডওয়ে নামক এক গোষ্ঠী, এরা সবাই মিলে তৈরী করে অল্‌টারনেটিভ পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স (এস পি ভি)—'দ্য গ্রীনস'। প্রাথমিকভাবে গ্রীন পার্টি ডান ও মধ্যপন্ধীদের দখলে চলে যায়। ব্রেমেনের এক পরীক্ষামূলক ডান ও বামপন্ধীদের মিলিত প্রচেষ্টার মডেলকে এই সময়ে চেষ্টা করা হয়েছিল তুলে ধরার। রক্ষণশীল হার্বার্ট গ্রাহ্বল থেকে নিও-লেফ্‌ট মুক্তিবাদী রুডি ডয়েট্‌সকে অবদি এক যৌথ নেতৃত্ব সম্ভব মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু কার্লশ্রুহেতে ৮০ সালের জানুয়ারীতে ফেডারেল গ্রীন পার্টি তৈরির প্রথম সম্মেলনে রক্ষণশীলরা কিছুতেই বামপন্থীদের জায়গা দিতে চাইলেন না। অন্য দিকে ধীরে ধীরে নানান মতের বামপন্থীরা 'ডী গ্রূনেন' বা জার্মান গ্রীন পার্টিতে চলে আসছিলেন। হামবুর্গে বামপন্থী নেতৃত্বের এক বড় অংশ (জেড ফ্র্যাকশন) গ্রীন পার্টিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে জুন ৮০-তে ডার্টমুন্ড সম্মেলনে ডানপন্থী রক্ষণশীলদের এক অংশ গ্রীন পার্টি থেকে বেরিয়ে যান এবং রাজনৈতিকভাবে মুছে যান।

### গ্রীনের উৎস সন্ধানে

সারণী—৭ দেখলে বোঝা যাবে গ্রীন পার্টির সাথে বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারার যোগাযোগ সম্বন্ধে লোকের মনে কী ধরনের ধারণা তৈরী হয়েছে। সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টার কাজ, স্ট্রাইক করার অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নে সাধারণ শ্রমিকদের বেশী ক্ষমতা—এই ধারণাগুলি কোথা

থেকে এল, তা যথেষ্টই স্পষ্ট। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে গ্রীন পার্টি নিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করতে গেলে একটা ব্যাপার প্রথমেই চোখে পড়ে যে এই গ্রীন পার্টি তার প্রাণরস সংগ্রহ করেছে আশপাশের বিভিন্ন উপাদান থেকে। 'ইকলজি' যেমনটা বলে, কোনো ঘটনার পেছনে নানা সূতোয় জোড়া বিভিন্ন উপাদানের মেলামেশা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ রয়েছে তেমনটাই ঘটেছে গ্রীন পার্টির ক্ষেত্রে। সবকিছুই যে মাপজোক মত বা আগাম পরিকল্পনা মত ঘটেছে এমনটা নয় কিন্তু মুক্তির আলাদা আলাদা পথের সংগ্রাম বা মুক্তিবাদী বিভিন্ন আত্মিক ও দার্শনিক পথ যে গভীর ছাপ ফেলেছে এর ওপর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সারণী—৮-এ বিভিন্ন লেখক গ্রীনদের যে দর্শনভিত্তিক ও রাজনীতিভিত্তিক ভাগ দেখিয়েছেন, তা স্পষ্টভাবেই গ্রীনদের 'বহুত্ব' (Plurality)-র পরিচায়ক।

এ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই যা উল্লেখ করতে হবে তা হল গ্রীন পার্টির প্রসঙ্গে 'বামপন্থী' বা 'সমাজতান্ত্রিক' বলতে কখনোই চালু পার্টি ভিত্তিক বা রাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তাভাবনার কথা বলা যায় না। বরং গ্রীন পার্টির চেষ্টা এই মডেলকে অতিক্রম করার। গোঁড়া এবং কর্তৃত্ববাদী বামপন্থী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এরকম বহু মানুষ আছেন গ্রীন পার্টিতে (জেড্ ফ্র্যাকশন ও বেসিস ডেমোক্রাটিক আনডগমাটিক সোসালিস্টস)। পুঁজির 'জীবন ধ্বংসকারী' ভূমিকার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে যে সংগ্রাম হয়েছে তা এক অর্থে আজকের আন্দোলনকে সমৃদ্ধই করছে। কিন্তু একই সাথে মেলামেশার পাশাপাশি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও রয়েছে। প্রকৃতিকে জয় করার মতবাদ, প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অপরিমিত উৎপাদনের মতবাদ নিয়ে আজ পৃথিবী কি এক পা-ও এগোতে পারবে? মার্কসবাদ পুঁজির স্বরূপ খুলে দেখানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আধুনিক 'পুঁজি'-র যে নানান রূপ তা এমন কি সমাজতন্ত্রের নামে তৈরি হওয়া রাষ্ট্রতেও আজ প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে না কি? এ নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মতাদর্শের টানাপোড়েন গ্রীনদের মধ্যেও তা চোখে পড়ে।

গ্রীন পার্টিকে চিন্তা-চেতনায় শক্তি জুগিয়েছে যে দর্শন তার মধ্যে বিভিন্ন অ্যানার্কিস্ট ধারাগুলিও আছে। 'অ্যানার্কিজম' শব্দটি আমাদের কাজে অনেক সময়েই ভুল অর্থ বহন করে। কারণ অ্যানার্কিজমের ইতিহাস অনেকটাই রয়ে গেছে অজানা। ঐতিহাসিকভাবে অ্যানার্কিস্ট মতবাদগুলি মানব-ইতিহাসের পথ চলায় সহযোগিতার (ক্রপোটকিন মিউচ্যুয়ল এইড—ক্রপোটকিন) ভূমিকা যে কত ব্যাপক তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নেতৃত্ববাদ, আমলাতন্ত্র, ক্ষমতার কাঠামো এরকম বহু বিষয়ে অ্যানার্কিস্ট, চিন্তাভাবনা আজকের বহু সমস্যার দিকে অনেক আগেই আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করিয়েছে।

আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্যাসিফিস্ট (শান্তিবাদী), বিক্ষুব্ধ মার্কসবাদী অ্যানার্কিস্ট চিন্তাভাবনার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ৬০-এর দশকে মাঝামাঝি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের আন্দোলনে—আমেরিকায়, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালীতে, জাপানে এবং সর্বোপরি ফ্রান্সে। নতুন ধারা এই আন্দোলন আজকের গ্রীন আন্দোলন পূর্বসূরী এ কথা অনেকেই বলেন। জার্মানীতে 'সোসালিস্ট স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ জার্মানী (এস ডি এস)-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ ব্যাপারে এক শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু এই ছাত্র আন্দোলন বৃহত্তর সমাজের সাথে, বিশেষতঃ শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সাথে কোনো বড় সম্পর্ক গড়ে

তুলতে পরেনি। আর এখানেই এগিয়ে ছিল ফ্রান্সের ছাত্র-যুব আন্দোলন যেখানে তারা শ্রমিক-ছাত্র মোর্চা তৈরি করে আধুনিক ইউরোপের বুকে সূচনা করে এক নতুন অধ্যায়ের। কর্তৃত্ব-বিরোধী '২২ মার্চ আন্দোলন'—সৃষ্ট এই ছাত্র-উদ্যোগ অন্যান্য বহু গোষ্ঠীর সাথে যৌথভবে ৬৮ সালের মে মাসে কার্যতঃ ফ্রান্সকে এক রাষ্ট্রহীন অবস্থায় এনে ফেলে। এই আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় এক ধারণা—'অটোজেশন' বা স্ব-শাসন। পার্টি-ভিত্তিক রাজনীতির যে সমালোচনা সে সময়ে শুরু হয়েছিল সেটাই আজকের গ্রীন পার্টিকে 'দল-বিরোধী দল' এ পরিণত করেছে এমনটা অনুমান করা যেতেই পারে। 'বেসিস ডেমোক্রাসি'-র (সাধারণ সদস্যাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা থাকবে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তৃণমূলস্তর অবধি বিস্তৃত প্রত্যক্ষ ও অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের) ধারণাও ওপরে উঠে আসে এই সময়ে। ৬০-এর দশকের শুরু থেকেই আমেরিকার বিভিন্ন আন্দোলনের উল্লেখও এ প্রশ্নে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কালো মানুষদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নারী আন্দোলন, যুব-ছাত্র আন্দোলন, এবং সর্বোপরি এদের ঘিরে ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন (জার্মানী ও ফ্রান্সেও এ আন্দোলন প্রবল ছিল) ৬০-এর দশককে একে অস্থির দশকে পরিণত করে। বাহারো বলেছেন যে ৬৮ সাল থেকে এক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এর শুরু হিসেবে আমরা আমেরিকার 'কাউন্টার কালচার' আন্দোলনকে ধরতে পারি। পাপাডাকিস গ্রীন আন্দোলনের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বীটনিকদের কথা বলেছেন। রাগী কবিতা ও গান, হিপি আন্দোলন এবং কমিউন তৈরির চেষ্টা যে আন্দোলনে দৃশ্যমান উপাদান। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির চাপ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় এই ধরণের সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রেরণা খুঁজছে আধুনিক মতবাদের পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রাইবাল জীবনযাত্রার প্রাচীন দর্শনে (যেমন জেন্ বৌদ্ধ মতবাদ)। অন্যদিকে 'বিকল্প জীবন ধারা' সামনে এনেছে জিপসি থেকে প্রতিবন্ধীদের মতন বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। গ্রীন পার্টির বিকল্প সাংস্কৃতিক চিন্তার এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল মধ্য-সত্তরের শুরু হওয়া 'স্পন্টি আন্দোলন'। অনুভূতি ও আবেগকে বাস্তব জীবনে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে এক বর্ণময় উজ্জ্বল জীবন, আধুনিক শিল্প- সমাজের ধূসরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কৌতুককে করতে হবে হাতিয়ার—এই ধরণের বহু প্রয়াসকে সামনে এনেছেন এঁরা। প্রকৃতিভিত্তিক 'আমেরিকান ইণ্ডিয়ান'-দের জীবন যে যন্ত্র-সভ্যতার চাপে যন্ত্রণা-কাতর, তার সহমর্মিতার এই ধরণের মানুষরা গড়ে তুলেছেন 'সিটি ইণ্ডিয়ান' গোষ্ঠী।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কথা বলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল যে গ্রীন পার্টির এক প্রধান উপাদান ইকলজির সাথে অনেকেই 'রেড ইণ্ডিয়ান' জীবন দর্শনের মিল খুঁজে পান। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের যে পরিচয় ইকলজি দিয়েছে গ্রীন রাজনীতির নতুন পথে তা এক দিশারীর কাজ করছে। পরিবেশ-দূষণ নিয়ে গ্রীনদের উদ্যোগের পেছনে ইকলজি ধারণার অবদান যথেষ্টই। বস্তুত শুধু পরিবেশদূষণ নয়, আত্মিক ও সামাজিক দূষণের প্রশ্নে গ্রীনদের এক অংশ ইকোলজি দর্শনের মধ্যেও এক নৈতিকতা ও জীবনের স্রোত আবিষ্কার করেছেন। ফাণ্ডামেণ্টালিস্ট বা ইকো-ফাণ্ডামেণ্টালিস্টদের বাস্তব রাজনীতির কূট-কচালের মধ্যে না ঢুকতে চাওয়ার পেছনে এই দর্শনের প্রভাব আছে। প্রাচীন চীনা দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে শুরু করে 'ইকলজি বিজ্ঞান' অবধি ব্যাপ্তি এই রাজনৈতিক মতাদর্শের। এই প্রসঙ্গ নারীবাদের (ফেমিনিজ্ম)

সাথে যোগসূত্রও খুঁজে পেয়েছেন গ্রীনরা। পেট্রা কেলীর মতে—'ইকলজি হল নারীবাদ এবং নারীবাদই হল ইকলজি'। এই মন্তব্যকে চরম বলে মনে করতে পারেন অনেকেই। কিন্তু গ্রীনরা বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাভাবনাকে গ্রহণ করেছেন যথেষ্ট সতর্কতা প্রসঙ্গেই। সংগঠনের প্রশ্নে নারীদের সমালোচনা গ্রীন সংগঠনকে নতুন দিকে নিয়ে গেছে। তৈরী হয়েছে 'কোটা ব্যবস্থা'। যার ফলে সংগঠনের সমস্ত ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ জায়গা রাখা হয়েছে নারীদের জন্য। এপ্রিল '৮৪ -তে ছ'জন মহিলার পার্লামেন্টে গ্রীন পার্টির কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ (গ্রীন ফেমিনাট) এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

গ্রীনদের উৎস সম্বন্ধে বলতে গেলে অন্য কিছু কিছু প্রভাবের কথাও বলতে হবে। মনে রাখতে হবে জার্মানীর সীমার মধ্যে প্রকৃতি যে পবিত্র এ কথা নাজিরাও বলত। গ্রীন পার্টির মধ্যে জার্মান জাতীয় উপাদানও আছে। নীট্‌শের যুক্তিবাদের সমালোচনা, আধুনিক জীবনের সমালোচনা থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়া বা প্রাচীন জার্মানীর প্রতি রোমান্টিক অনুভূতিও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে এক অংশের মধ্যে। গ্রীন পার্টিতে থাকার সময়ে গ্যাজ সংগঠনের মধ্যে ইকলজিকে অবিকৃত রাখার জন্য ডিক্টেটরশিপের কথাও বলা হয়েছে।

আর একটা দিকে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠিত বড় দলগুলির প্রভাবও গ্রীন পার্টিতে কমবেশীভাবে কাজ করছে। রিয়ালিস্ট অংশের মধ্য এই প্রভাব 'হেস কোয়ালিশন'-এ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেখানে একজন গ্রীন পরিবেশ-মন্ত্রী হয়েছিলেন সোসাল ডেমোক্র্যাট-গ্রীন মন্ত্রিসভায়। '৮৫-'৮৬ সালের মধ্যেই হেসের এই প্রাদেশিক সরকার এই বিতর্কিত প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী কারখানাকে (নিউকেম অ্যালকেম, হ্যানাট) ছাড়পত্র মঞ্জুর করল গ্রীন পার্টি সরকারে থাকা সত্ত্বেও। অথচ গ্রীন পার্টির সরকারী মহল ভালভাবে প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না। এই ঘটনা এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্টের মিছিলে পুলিশী আক্রমণে গুন্টার সারে নামক এক যুবকের মৃত্যুতেও 'হেস কোয়ালিশন' নীরব থাকায় গ্রীন পার্টিতে 'প্রতিষ্ঠিত কৌশলবাদী' রাজনীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

এইসব সমস্যা থাকা সত্ত্বেও গ্রীন রাজনীতির ব্যাপকতা যথেষ্ট। বিশ্বজোড়া পরিবেশ-সমস্যার ভয়াবহতা ও তাদের আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁরা. বাহারো-র ভাষায় "ইকলজির সঙ্কট সমাধান করা যাবে না পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়, যদি না উত্তর (ধনী দেশ) ও দক্ষিণের (গরীব দেশ) মধ্যে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক (Order) তৈরী হয়। সামাজিক সুবিচার ও মানুষের বিকাশ ছাড়া এ সঙ্কট দূর হবে না।"

গৃহহীনদের থাকার জায়গা হোক কি শিল্পের জগতে স্টার সিস্টেমের বিরোধিতা, গ্রীনরা এক জায়গায় আনতে পেরেছেন বিভিন্ন মতামতকে। নামের সাথে 'সবুজ' রং যুক্ত থাকলেও উৎসের দিকে তাকিয়ে বলাই যায় যে ইকলজির 'সবুজ', নারী আন্দোলনে 'লাইলাক', অ্যানার্কিস্ট-স্পন্টিদের 'কালো' আর সমাজতান্ত্রিক বামদের 'লাল'-এর সাথে আরো বহু প্রতীক রং মিশে তাঁদের পতাকা আজ বর্ণময়, যা আজকের সর্বব্যাপী সংকটের যুগে সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনাকাশে রামধনু সৃষ্টির সম্ভাবনা অবকাশে অপেক্ষমান হয়ে আছে।

## সারণী —১

| | |
|---|---|
| ১. ইকলজি ও পরিবেশ আন্দোলন। | ২. নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী আন্দোলন। |
| ৩. শান্তি আন্দোলন। | ৪. নারী আন্দোলন |
| ৫. বিকল্প গড়ে তোলার আন্দোলন। | ৬. নাগরিক অধিকার ও গৃহহীনদের আন্দোলন। |

জাতীয় পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা ১৯৮০ সালে জানাচ্ছে যে এইসব আন্দোলনে ১১,৩২৮টি আঞ্চলিক সংগঠন ও ১৩-টি 'একাধিক অঞ্চল' ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নাগরিক কাজ করছেন।

## সারণী—২

নিউক্লিয়ার শক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী (১৯৭৩-৭৬)
শতকরা হিসাব (%)

প্রশ্ন ১ *আপনি কি মনে করেন মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করেও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ তৈরি করা সম্ভব? অথবা আপনার কি মনে হয় এতে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে?*

| | জুন, ১৯৭৩ | ডিসেম্বর, ১৯৭৬ |
|---|---|---|
| ঝুঁকি আছে বলে মনে করেন | ৪৮ | ৭০ |
| বিপদ নেই বলে মনে করেন | ৪০ | ১৯ |
| ঠিক জানি না | ১২ | ১১ |

প্রশ্ন ২ *আপনার বাসস্থানের আশেপাশে কোথাও নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে যদি ভোট নেওয়া হয়, তবে আপনি কোন পক্ষে ভোট দেবেন?*

| | মে, ১৯৭৫ | ডিসেম্বর, ১৯৭৬ |
|---|---|---|
| পক্ষে | ৪০ | ৩৫ |
| বিপক্ষে | ২৮ | ৪৭ |
| ঠিক নেই | ৩২ | ১৮ |

## সারণী—৩

১৯৮১-'৮৫ পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিষয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধির হার শতকরা হিসাবে (%)

| বিষয় | উত্তরদাতাদের মতে গুরুত্বপূর্ণ | |
|---|---|---|
| | ১৯৮১ | ১৯৮৫ |
| **পরিষ্কার জল** | **৫৯** | **৭৩** |
| **ধোঁয়া নির্গমন** | **৪৫** | **৬৪** |
| **খাবার ও ওষুধের ওপর নিয়ন্ত্রণ** | **৪৭** | **৫৯** |
| **বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহার** | **৪৫** | **৬১** |
| **পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা** | **৩৩** | **৪৭** |

## সারণী—৪

শিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাচ্চাদের কী কী গুণ বিকশিত হওয়া উচিত তা নিয়ে সমীক্ষার ফলাফল
শতকরা হিসাব (%)

| | ১৯৫৪ | ১৯৭৬ |
|---|---|---|
| বাধ্যতা এবং নিয়ম মেনে চলা | ২৮ | ১০ |
| স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মনির্ভরশীলতা | ২৮ | ৫১ |

## সারণী—৫

যৌনতা-সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিবোধের পরিবর্তন
শতকরা হিসাব (%)

প্রশ্ন : *বিয়ে না করেও যদি কোন যুবক-যুবতী একসঙ্গে থাকেন, তবে এ বিষয়ে আপনার মত কী?*

| | | ১৯৬৭ | ১৯৭৩ |
|---|---|---|---|
| বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে | (পুরুষ) | ৪৩ | ৫ |
| | (মহিলা) | ৬৫ | ২ |
| কিছু যায় আসে না | (পুরুষ) | ৪৮ | ৮৪ |
| | (মহিলা) | ২৪ | ৯২ |

## সারণী—৬

বিকল্প গড়ে তোলার আন্দোলনে কাজের জগতের চেহারা

| | |
|---|---|
| কৃষি সংক্রান্ত | কৃষিকাজ, বাগানকরা ও পশুপালন ইত্যাদি। |
| ম্যানুফ্যাকচারিং ও অন্যান্য ব্যবসা | ছাপাখানা, হস্তশিল্প, রুটি-কারখানা। |
| যানবাহন ও দোকানপাট | ট্যাক্সি, ধ্বংসস্তূপ সরানো, খাবারের দোকান, কফি হাউস, বইয়ের দোকান। |
| শিল্প,তথ্য ও জনসংযোগ | আর্ট গ্যালারি ও সিনেমা হল চালানো, ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি। |
| সামাজিক সাহায্য | শিশুকেন্দ্র চালান, মেডিক্যাল ক্লিনিক (ফিজিওথেরাপিসহ), বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি। |
| সাংস্কৃতিক | নাটক করা, খেলাধুলা। |

## সারণী—৭

জনগণ গ্রীনদের সম্পর্কে কী ভাবেন
শতকরা হিসাব (%)

| গ্রীনরা হল | ১৯৮১ | ১৯৮২ | ১৯৮৬ |
|---|---|---|---|
| বামপন্থী | ৬০ | ৭৪ | ৮১ |
| মধ্য বা ডানপন্থী | ৩৪ | ২১ | ১৮ |
| কোন উত্তর নেই | ৬ | ৫ | ১ |

## সারণী—৮

গ্রীনদের মধ্যে বিভাজন

| ল্যান্গুথ | স্প্রেত্নাক এ্যাণ্ড কাপ্রা | হালস্বার্গ |
|---|---|---|
| রেড গ্রীনস্ (ইকোসোসালিস্ট) | ভিসনারি / হোলিস্টিক গ্রীনস | পলিটিক্যাল রিয়ালিস্ট |
| গ্রীন-রেড রিয়ালিস্ট (থার্ডওয়ে, ইকো-লিবারেটেরিয়ান) | ইকো গ্রীনস / গ্রীন গ্রীনস্ | ফান্ডামেন্টালিস্ট |
| রিফর্ম ইকলজিস্ট | পিস মুভমেন্ট গ্রীনস্ | ইকো-লিবারেটেরিয়ানস্ |
| ফাণ্ডামেন্টাল অপোজিশনিস্ট | র‍্যাডিক্যাল লেফট্ গ্রীনস্ | ইকো-সোসালিস্ট |

**লেখা ও সারণী তৈরিতে যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :**

১. *দ্য জার্মান গ্রীনস, আ সোস্যাল আন্ড পলিটিক্যাল প্রোফাইল,* ওয়ার্নার হালস্বার্গ।
২. *দ্য গ্রীনস্ ইন ওয়েস্ট জার্মানি, অরগানাইজেশন আন্ড পলিসি মেকিং,* সম্পাদনা—এভা কোলিন্স্কি।
৩. *দ্য গ্রীন ফ্যাক্টর ইন জার্মানি পলিটিকস্,* জার্ড ল্যান্গুথ।
৪. *নিউ পলিটিকস্ ইন ওয়েস্টার্ন ইউরোপ,* সম্পাদনা—ফার্ডিনাণ্ড মুলার রোমেল।
৫. *দ্য গ্রীন মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট জার্মানি,* এলিম পাপাজকিস।
৬. *গ্রীন পলিটিক্স, দ্য গ্লোবাল প্রমিস,* শার্লেন, স্প্রেত্ন্যাক অ্যান্ড ফ্রিত্জফ কাপ্রা।
৭. *দ্যা গ্রীন অলটারনেটিভ,* ব্রায়ান টোকার।
৮. *ফ্রম রেড টু গ্রীন,* রুডল্‌প বাহারো।

# রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানা সম্বন্ধে একটি কাল্পনিক বক্তৃতা

রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানা — নব্বই দশকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের এক ভয়াবহ সমস্যা। বড় বড় সব কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পরে এক। তৈরী হয়েছে 'নাগরিক মঞ্চ'। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ নিয়ে অনুসন্ধান, রুগ্ন কারখানার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন অনেক সংবেদনশীল মানুষ। সেই সময় 'একটি কাল্পনিক বক্তৃতা'র মধ্য দিয়ে সুরঞ্জন কর (আমাদের সত্যব্রত) তার কথা বলেছিলো *পটভূমি*-র দশম বর্ষ পূর্তি সংখ্যায়, অক্টোবর ১৯৯২।

প্রিয় বন্ধুরা,

আজ বিকেলে আপনারা এখানে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে 'রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানা' নিয়ে দুচার কথা শুনবেন বলে। হয়ত কাল বিকেলে আপনাদের মধ্যে অনেকে যাবেন কলেজ ফুটবল মাঠে, কেননা স্থানীয় টিম ফাইনাল খেলছে কলকাতা থেকে আসা দলের সাথে। আর এই আজ বিকেল থেকে কাল বিকেল এইটুকু সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে ষাট থেকে সত্তরটা কারখানা অন্তত গড় হিসেব সেই রকমই বলছে। বিষয়টাকে নাটকীয় করে তোলার চেষ্টা করছি বলে মনে হলে মার্জনা করবেন। কিন্তু অবস্থাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। অগুনতি ছোট কারখানার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। শুধু বড় আর মাঝারি মিলিয়ে এখানে ২৫০০০ কারখানা বন্ধ। ওইসব কারখানার সাত লক্ষ মজদুর আর তাঁদের পরিবারের মানুষরা, নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই পথে বসে রয়েছেন। রুগ্ন এবং বন্ধ হওয়ার অসুখ আজ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। কাল যদি শোনেন যে ওয়েবেল বন্ধ হল তবে আজ শুনবেন ত্রিবেণী টিস্যু বন্ধ হয়েছে। আজ যদি শোনেন ফোর্ট উইলিয়ম জুটমিল বন্ধ হল তো আগামীকাল শুনবেন নতুন কোন অপ্রত্যাশিত কারখানার নাম যেখানে হয়ত আপনারই কোন বন্ধু বা আত্মীয় কাজ করেন। আপনাদের ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্ঠুর।

একটা হিসেব দিই। ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবাংলায় রেজিস্টার্ড শিল্পে কাজ করেন এমন শ্রমিকের সংখ্যা ছিল আট লক্ষ আশি হাজার। বলুনতো ১৯৯১ সালে সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়াতে পারে? আপনি নিশ্চয় পনের-কুড়ি লক্ষ ভাবতেই পারেন। না ছাব্বিশ বছরে সংখ্যাটা বাড়ে নি। বরং দু'হাজার কমে দাঁড়িয়েছে আট লক্ষ আটাত্তর হাজার। নিজেরাই ভাবুন, ছবিটা কেমন তৈরী হচ্ছে।

কথা বলছিলাম হাওড়ার এক বন্ধ কারখানার শ্রমিকের সাথে। "জানেন গ্রেড ওয়ান টার্নার ছিলাম। ভার্নিয়ার ধরে জব করতাম। চার বছর হল কোম্পানী লক-আউট। এখন এয়ার কণ্ডিশনিং-এ কন্ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করি। ছ'শ টাকা মাইনে। ডবল শিফ্‌টে আট-আট মোট ষোল ঘন্টা কাজ করলে বারো'শ টাকা পাই। কোন মতে ফ্যামিলির পেটটা চলে যায়। তবে কি জানেন নিজের কাজটা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি। হাতটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

আমি কিন্তু বলব এই মানুষটি অনেকের থেকে ভাল অবস্থায় আছেন। যেমন ডানবার কটন মিলের শ্রমিকদের তুলনায়। '৮৭ সালে বন্ধ হওয়া এই কারখানায় আত্মহত্যা করেছেন আট জন। আর নানান যন্ত্রণায় মারা গেছেন একশ ষাট জন। '৮৬ সালে বন্ধ শ্রীদুর্গা কটন অ্যাণ্ড উইভিং মিলে আত্মহত্যা করেছেন ছ'জন। মারা গেছেন সত্তরজন। মাত্র সতেরটা বন্ধ কারখানায় আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেছে ষাটটি। মাত্র ঊনত্রিশটি কারখানায় না খেয়ে রোগে ভুগে মৃত্যুর খবর আছে মোট এক হাজার পাঁচশ বত্রিশ জনের, আর মানুষের মৃত্যুতে শুধু কতগুলো সংখ্যাই নয়, এর পেছনে যে আরও কত অগণিত মানুষের লাঞ্ছনার কাহিনী আছে তা কে বলবে!

প্রশ্ন উঠতে পারে অবস্থাটা কেন এমন দাঁড়াল? এ প্রশ্নর সামগ্রিক উত্তর দেওয়া দু'পাঁচ মিনিটে সম্ভব নয় এবং এটা স্বীকার করাই ভাল যে এরকম প্রশ্নের উত্তর কারো পকেটে থাকেও না। উত্তরটা হোল এক নানান রঙে আঁকা জটিল ছবির মতো। যা রয়েছে আধো-অন্ধকারে। আমরা শুধু ছবির কয়েকটা দিককে উজ্জ্বল করে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

ধরুন আমাদের এখানে একটা কথা খুব চালু আছে। যাকে বলে 'লেবার আনরেষ্ট'। শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন প্রশ্ন করুন। উত্তর পাবেন—লেবার আনরেষ্ট, অর্থাৎ শ্রমিকরাই অশান্তির মূল। মজা হোল যে একটা মিথ্যে কথা কিন্তু শুনতে শুনতে মনে সত্যি হিসেবে গেঁথে যায়। অথচ এই সেদিনই স্পষ্ট ভাবে বিধানসভায় মন্ত্রী বলেছেন যে এখানে দশদিন কাজ নষ্ট হলে তার মধ্যে ন'দিন নষ্ট হয় মালিকদের লক-আউটের ফলে। এটা হোল সরকারি তথ্য।

মালিকরা কেন লক-আউট করে? সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী তো কারখানা খোলা রাখলেই লাভ বাড়ান সম্ভব! আমরা কি জানিনা কি ভাবে শ্রমিককে দিয়ে তার মজুরীর মূল্যের থেকে অনেক বেশী উৎপাদন করিয়ে সেই বাড়তি দামটাই লাভের খাতায় সরিয়ে দেওয়া হয়। 'সারপ্লাস ভ্যালু'র গল্প তো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। কিন্তু না, আজকের যুগে বেশী উৎপাদন করিয়ে বেশী লাভ করাটা তত লাভের হচ্ছে না। তাই পন্থাটা যাচ্ছে বদলে।

কি রকম? ধরা যাক শ্রীরামপুরের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস-র কথা।

এদের ওষুধ পেনিসিলিন দিয়ে তৈরী বড়ি 'ষ্ট্যানপেন' পূর্ব ভারতের বাজারে দুর্দান্ত বিক্রি হত। সাধারণভাবেই মালিক গুজরাটের সারাভাই গোষ্ঠীর যথেষ্ট লাভ হওয়ার জায়গা তৈরী ছিল। কিন্তু অল্পদিনে কারখানাকে নিংড়ে প্রচুর টাকা বের করে নেওয়ার চাহিদায় তারা নানারকম কায়দা করলো। এক কারখানার ভিতরে দ্বিতীয় একটি কাগুজে কোম্পানী ওপেক ইনোভেশনস খুললো। এবং সেই কোম্পানীকে দিল বেশীর ভাগ কর্মীর দায়িত্ব। অথচ দিল না কোন সম্পদ। এবারে আসল কোম্পানী ষ্ট্যাণ্ডার্ড থেকে তৈরী বিশুদ্ধ পেনিসিলিনের দানা (কৃষ্ট্যাল) সরিয়ে নিয়ে গেল গুজরাটে, নিজেদেরই অন্য কারখানায় মারাত্মক কম দামে, ন'শ টাকার মাল ছ'শ টাকায় 'আণ্ডার প্রাইসিং' করে শ্রীরামপুর থেকে বরোদায় নিজেদেরই অন্য কারখানায়

পাচার করে সাত বছরে তুলে নিল সাত কোটির মত টাকা। হিসেবটা ১৯৮২ থেকে '৮৮র। এই হিসেবটা ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ধরলে সারাভাইদের মুনাফার অঙ্কটা কত দাঁড়ায়? এতো গেল একদিক। অন্যদিকে এই লাভটা লোকসান হয়ে চেপে বসল ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ওপেকের ঘাড়ে। এবং যেহেতু কাগুজে কোম্পানী ওপেককে এর জন্য তৈরীই রাখা ছিল, সে হয়ে পড়ল রুগ্ন। এবং রুগ্নতা দেখিয়ে শ্রমিকদের পি-এফ, ই এস আই থেকে বেতন অবধি সবই তারা আটকে দিল। মানে যত টাকা ক্ষতি দেখাচ্ছে তার বেশীর ভাগই হল, যে টাকা তারা মেরে দিয়েছে। আর সব কিছুর নীট ফল? ১৯৯১-র ৩০ মে ভোরবেলায় ওয়ার্ক সাসপেনশানের নামে কারখানায় তালা পড়ে। এবং সে তালা কোনদিনও খুলবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশই জোরদার হচ্ছে।

এটা কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নয়। ধরুন নিম-মার্গোর কারখানা একদা বিখ্যাত ক্যালকাটা কেমিক্যালসের কথা। অনাবাসী ভারতীয় মনু ছাবাড়িয়ার হাতে যাওয়ার পর এই কোম্পানীর লোকসান তিন বছরে মোট প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা দাঁড়ায়। অথচ কে না জানে এঁদের সাবান, টুথপেষ্টের বিক্রি কত ভাল। জানা দরকার যে ছাবাড়িরা নিজেরাই আলাদা অফিস খুলে তার মাধ্যমে ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর মাল বেচছে অস্বাভাবিক বেশী হারে কমিশন নিয়ে। বাজার চলতি আট-দশ পার্সেন্টের জায়গায় তারা নিচ্ছে তেইশ পার্সেন্ট।

সন্দেহ করাই যায় যে, ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্নী সংস্থাগুলো থেকে কারখানায় বিনিয়োগের জন্য কোটির অঙ্কে পাওয়া টাকা তারা অন্য পথে চালান করে দিয়েছে। আর লোকসানের নাম করে নিজের কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রেখে ছাবাড়িয়া ছোট জায়গা থেকে সাবান তৈরী করে বেচছে। কারখানা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই জমিতে ফ্ল্যাট, সুপার মার্কেট এইসব প্রোমোটারি ব্যবসা করে দুদিনে কোটি কোটি টাকা কামাবার চেষ্টা করছে। পরিণতিতে কারখানা হয়েছে রুগ্ন, আর সেই রুগ্নতা দেখিয়ে ছাবাড়িয়ারা চেয়েছে রিলিফ, পাওনা মকুব, ট্যাক্স ছাড় অর্থাৎ আরও কয়েক কোটি টাকা। আর শেষ অঙ্কে লক-আউট তো আছেই, সেটাও হয়ে গেছে ২১ মে ১৯৯১।

না, আর উদাহরণ দেবনা। কিন্তু এ জিনিস ঘটেছে এবং ঘটছেই। কয়েকদিন আগেই কাগজে দেখলাম অকল্যাণ্ড জুটমিল লক-আউটের কাহিনী। শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন মালিক হায়দ্রাবাদে টাকা সরাচ্ছে। কিন্তু এতো গেল এক ধরণের প্যাটার্ণ, এক ধরণের ডিজাইনের কথা। কিন্তু ছবির যে রঙটা সবচেয়ে স্পষ্ট, প্রায় সরলরেখার মত লাগছে আপাত দৃষ্টিতে সে প্রসঙ্গে তো কিছু বলতেই হচ্ছে।

আর এখানে এসে আমাদের এক অস্বস্তিতে পড়তে হয়। কারণ আমরা কথা বলছি রুগ্ন ও বন্ধ-কলকারখানা নিয়ে সরকারি উদ্যোগের প্রশ্নে। স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে সরকার তো চাইবেনই যে এ রাজ্যে একটি কারখানাও যেন বন্ধ না থাকে। না, আমি মতাদর্শ-দর্শন এসব দিক থেকে কিছু বলছি না। স্রেফ পয়সা কড়ি লাভ, একটা বেশ ঝরঝরে সুস্থ অবস্থা এসব দিক থেকেই বলছি। মেনেও নেয়া যায়যে হাজার হাজার কারখানাকে শুধু সরকারই সুস্থ করে তুলতে বা খুলে দিতে অপারগ।

কিন্তু সত্যিই রাজ্য সরকার যেখানে উদ্যোগ নিতে পারেন, সেখানে তাঁরা কি করছেন? ধরা

যাক ন্যাশনাল ট্যানারীর কথা। এ কারখানার পরিচালন ক্ষমতা শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক গোষ্ঠীরই হাতে পড়েছিল। চামড়ার তৈরী জিনিসের বাজার যথেষ্ট তেজি থাকা সত্ত্বেও বহু বিচিত্র কারণে ন্যাশনাল ট্যানারী হয়েছিল রুগ্ন এবং মে, ১৯৯১ থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ। ভূখা শ্রমিকদের চাপে হাইকোর্ট মারফত এ কারখানা সরকারের হাতে আসে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

কোর্টের শর্ত অনুযায়ী পঞ্চাশ লক্ষের মধ্যে সরকারকে প্রথমে জমা দিতে হবে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা। বাদবাকী টাকা ছত্রিশটা কিস্তিতে দেওয়ার কথা। কারখানা চালু হলে শ্রমিকদের প্রাপ্য মেটানোর ব্যাপারেও সরকার সময় নিতে পারতেন। অর্থাৎ কার্যতঃ অল্প কিছু টাকা লাগিয়ে উৎপাদন শুরু করে দেওয়া যেত। বিশেষত যেখানে শ্রমিকরা কাজ শুরুতে আগ্রহী। বন্ধ হবার আগে রুগ্ন অবস্থাতেই তাঁরা মাসে আট লক্ষ টাকার মত 'জব' কাজ করছিলেন। কাজ শুরু হলে সরকার বছরে শুধু পঁচাত্তর হাজার টাকা বৃত্তিকর হিসেবে পেতেন।

উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয় কর বাবদ পেতেন বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাছের তেলে মাছ ভাজার মতই তাঁরা কারখানার টাকায় কারখানা চালাতে পারতেন। এবং আশা করতে দোষ ছিলনা যে শুধু 'জব' কাজের ভরসায় না থেকে উৎপাদনকে গুছিয়ে আনতে পারলে ন্যাশনাল ট্যানারী হৈ হৈ করে চলতে পারত। অথচ আদালতের নির্দেশ বারে বারে অমান্য করে রাজ্য সরকার কারখানা খোলার প্রথম পদক্ষেপটাই নিলেন না। যদিও তাতে সরকারী কোষাগারেরই ক্ষতি হচ্ছে।

পাশাপাশি দেখা যাক ইণ্ডিয়া মেশিনারীর কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগ্রহণ করা এই কারখানা তৈরী করত চটকল- কাপড়কলের যন্ত্রচালিত তাঁত, চিনি শিল্পর জন্য ওজন করার যন্ত্র ইত্যাদি। অথচ একে ঠিকভাবে জাতীয়করণ করা হয়নি। এবং অদ্ভুত ভাবে ইণ্ডিয়া মেশিনারী মালিক বিহীন অবস্থাতেও কুড়ি মাস ধরে উৎপাদন চালিয়ে যায়। এ ব্যপারে ওখানকার শ্রমিক কর্মচারীদের ভূমিকা সত্যিই চমৎকার। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মাইনের ব্যবস্থা করেন কারখানা চালিয়ে, এমন কি বাজার থেকে পাওনা দশ লক্ষ টাকা সাত মাসে আদায় করেন। কিন্তু নানান সমস্যায় বিশেষত পুরানো মালিকদের উৎপাতে এবং ব্যাংকের অসহযোগিতায় মে, ১৯৯১ থেকে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই কারখানার লাভ করবার ক্ষমতা বিশাল। কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিচালনায় থাকার সময় কারখানা শুধু উৎপাদন শুল্ক বাবদই দু কোটি টাকার বেশী কর দিয়েছে, যার পঁচাশি শতাংশ গেছে রাজ্য সরকারের কোষাগারে, অথচ আজ কেন সরকার ইণ্ডিয়া মেশিনারী খোলার চেষ্টা করছেন না—যেখানে এই মুহূর্তেই কোম্পানীর কাছে এক বছরের জন্য এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার অর্ডার আছে। অবাক হবার মতো ব্যাপার হল যে কাজ শুরুর করার জন্য লাগবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। আর এই মূলধন পাবার ব্যাপারে ব্যাংকের কাছে গ্যারান্টর হলে রাজ্য সরকার লাভ করতে পারতেন শুধু বিক্রয় শুল্ক বাবদই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। শুধু বৃত্তিকরই তাঁরা পেতেন বছরে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। অথচ রাজ্য সরকার হাত লাগাচ্ছে না। চাকাও ঘুরছে না!

না, কাহিনী আর দীর্ঘ করব না, যদিও উদাহরণ অনেক অনেক আছে। যেটা না বলে পারছি না, সেটা হল টিটাগড় পেপার মিলের কথা। ২৮ শে জুলাই ১৯৯০ মুখ্যমন্ত্রী এই কারখানা যে খুলতে চলেছে তা স্পষ্ট করেই জানান, এবং মাঝে মাঝেই মনে হয় এবার

বোধহয় টিটাগড় পেপার মিল খুলে গেল। অথচ ২০০০ সালে কাগজের যে চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে শুধু সেইটুকু দাঁড়াচ্ছে প্রায় একুশ লক্ষ টন। এবং সেক্ষেত্রে টিটাগড় পেপার মিল থেকে সরকারের যথেষ্ট আয় হবার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। এখন ৪.৬৫ কোটি টাকা ধার দিলে ১০ বছরে শুধু উৎপাদন শুল্কই আসবে ১৪০ কোটি টাকা, অন্যান্য আয় তো বাদই দিচ্ছি।

শুধু রাজ্য সরকার নয়, রুগ্ন শিল্পের ভবিষ্যৎ ঠিক করার দায়িত্ব যার ওপর সেই বোর্ড ফর ফাইনান্সিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন বা বি আই এফ আরই বা কি করছে? বি আই এফ আরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী গণপতি বলেছেন যে শিল্পকে রুগ্ন করা একটা ভাল ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি একথা বলেছেন বটে কিন্তু আদতে বি আই এফ আর এ রাজ্যের রুগ্ন শিল্পগুলি নিয়ে এমন কি স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে?

সে যদি রুগ্ন কারখানাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে টাকা নামক টনিক আরও ঢালার পরামর্শ দেয় তবে মালিকের পোয়া বারো। আর যদি 'ওয়াইণ্ডিং আপ' বা তুলে দেওয়ার হুকুম দেয় তাহলে তো হয়েই গেল। এ রাজ্যের অনেক কেসের মধ্যে একমাত্র ক্যালকাটা কেমিক্যালস-এর ক্ষেত্রেই বি আই এফ আর এক বিকল্প পথ অর্থাৎ শ্রমিক সমবায়ের হাতে কারখানা তুলে দেবার কথা ভেবেছিল। কিন্তু সেখানেও অদ্ভুত উপায়ে বি আই এফ আরের কাজ কর্মের ওপরে হাইকোর্টের 'স্টে অর্ডার' চাপিয়ে তার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।। যদিও বি আই এফ আর নিজেই এক উচ্চ আদালতের মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

আসলে এই সব আইনী মারপ্যাঁচ, কোন ছোট্ট উদ্যোগও না নেওয়া এসবের আড়াল থেকে যার হিমালয়ের মত চেহারা চোখে পড়ে তা হোল দুর্নীতি, আমি এটাকে একটা আলাদা ক্যাটাগরি, একটা মোটিভ ফোর্স হিসেবে দেখতে চাই। ধরা যাক 'আধুনিকীকরণ' করা হবে টেক্সটাইল শিল্পে। কেন্দ্রীয় সরকার সাত'শ পঞ্চাশ কোটি টাকা মঞ্জুর করল। মাত্র বারো জন বড় মালিকই ছয়'শ ছেষট্টি কোটি টাকা পেল, অথচ তারা সেই টাকার বেশীর ভাগটাই শিল্পে লগ্নী করল না অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে 'শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয়' এই কারণ দেখান হচ্ছে, পেছনে রয়েছে লোভের কারসাজি। আর এসবের সাথে যে বিরাট 'চেন' থাকে তাও আজ আর অজানা নেই। মালিক, অর্থলগ্নী সংস্থা, রাজনৈতিক দাদা, বড় অফিসার ধরণের লোকেদের পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বর মধ্যেও যে অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দিন হল, কারখানা চত্বর ভাল করে ঘুরলেই তা চোখে পড়ে।

আপনারা বলতেই পারেন যে, আপনি যা বলছেন এ তো আমাদের জানা কথাই। কিন্তু করার কি আছে? আমরা নিজেরাই যেখানে অসৎ, সেখানে এমনটাই চলবে। আসলে এই যুক্তিটাই আমরা বাসে, লোকাল ট্রেনে সর্বত্র শুনতে অভ্যস্ত। আমার মনে হয় আমরা এক জটিল অবস্থার ফাঁদে পড়ে গেছি। একটা উদাহরণ দেবার চেষ্টা করছি। ধরুন শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের কথা। এখানে চাপ খুব বেশী। ছেলেমেয়েকে ইংরাজি স্কুলে পড়াতে হবে, বাড়ীতে নিত্য নতুন টিভি, ভি সি আরের মত পণ্য কিনতে হবে, ফ্ল্যাটের টাকা জমাতে হবে, একটা টু-হুইলার চাই, এমন কি 'ফান মাঞ্চ' বা 'লেহর পেপসি'র খরচাও আছে। ফলে চিন্তা করার সময় নেই, টাকা রোজগার করতে হবে। সানন্দার পাতা বা টিভির পর্দায় পৃথিবীকে জানছি, চিনছি।

সেই মাপে, সেই চোখে পৃথিবীকে দেখছি। ঘুষ নেওয়া বা দেওয়া যে খারাপ, এই জায়গায় দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। এই দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আজ কি করে ভাববো হোসিয়ারী শিল্পের সেই শ্রমিকদের কথা যাঁরা ফুসফুসের রোগে ভোগেন? কারণ তাঁদের কাজ করতে হয় ভয়ংকর রকম নোংরা, ঘিঞ্জী, ভিজে আবহাওয়ার মধ্যে। এই পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক, যার মধ্যে এক অংশ মহিলা তাঁদের মাস চালাতে হয় মাত্র সাত'শ টাকায়।

কারখানা জগতের ওপরের দিকেও আজ এই মধ্যবিত্ত মানসিকতারই জোর বেশি। শ্রমিককরা আজ টুকরো টুকরো, পাঁচ হাড়ি, পাঁচ ইউনিয়নে ভাগ হয়ে রয়েছেন। আর এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের জমা দেওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মালিকরা সরাচ্ছে দু হাতে। যার পরিমান ছাড়িয়ে গেছে এক'শ কোটির অঙ্ক। ই এস আইর টাকা জমা পড়েনি চল্লিশ কোটি টাকারও বেশী। অলিম্পিক, শেয়ার বাজার, ইত্যাদি হরেকরকম উত্তেজনার পেছনেই রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। রয়েছেন বেনী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রমিকরা, যাঁরা, মালিক টাকা মেরে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে মাটি কামড়ে পরে আছেন কারখানা চত্বরে। গরু পুষে, এলাকায় চেয়েচিন্তে নিজেদের পেট চালাচ্ছেন। রয়েছেন ন্যাশনাল ট্যানারীর শ্রমিকরা যাঁরা 'বাঁচাও কমিটি' বানিয়ে, চেষ্টা করছেন কারখানা খুলতে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দাবীতে ই, এস, আই-র ঠিকমত কাজকর্মের দাবীতে তিরিশটা ছোট ছোট শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে আন্দোলন শুরু করেছে।

কিন্তু পথ খুব আঁকা বাঁকা, আর পিছলও বটে। তা নইলে ক্যালকাটা কেমিক্যালসের শ্রমিক সমবায়ের চেষ্টা যাঁরা করছিলেন, যাঁরা এক ভারতজোড়া বিশাল ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্য, তাঁদের হঠাৎ গ্রেফতার হতে হবে কেন মালিকের ওপর আক্রমণের অভিযোগে। অথচ তাঁরা তো চোর ডাকাত ছিলেন না। তাঁরা জানতেন যে তাঁদের ওপর সমবায় প্রচেষ্টা গড়ে তোলার দায়িত্ব। মিথ্যে মারামারি তাঁরা করবেন কেন?

আমি আর বেশী সময় নেব না। এটা ঘটনা যে মানুষ কি ভাবে তার মতামত গড়ে তোলে সেটা আমরা ভাল জানি না। এটুকু বলাই যায় যে সেক্ষেত্রে একজন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন আর আপনি মেনে নিলেন এটা আশা করা মূর্খতা। আমি শুধু এইটুকু বলব যে পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানার জগতের অসুখ যথেষ্ট গভীর। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প থেকে আপনার পাড়ার ছোট্ট বিস্কুট তৈরীর মেশিন বানানর কারখানা অবধি আজ এক অন্ধকার নেমে এসেছে। এর বহু দিক আছে, বহু স্তর আছে। হয়ত এর সত্যিকারের অসুখকে বুঝতে গেলে 'কল-কারখানার' গঠনের ইতিহাসকে বুঝতে হতে পারে। যেভাবে আমরা দেখে এসেছি যেন কারখানার চেহারাটা বদলায় না, সমাজটা কারখানার আদলে বা কারখানাটা সমাজের আদলে গড়ে উঠছে— এর জরিপ করা, একে বদলান, এমন কি কারখানা সিস্টেমের বাইরে যাওয়া —এসব নানান স্বপ্ন নানান ইউটোপিয়া। না, এসব আমি আজ কিছুই বলব না— বলার যোগ্যও নই। আমি শুধু বলব যে দিনের আলোর মত স্পষ্ট যেটুকু দেখা যাচ্ছে— পশ্চিমবঙ্গে একটু সদিচ্ছা থাকলে, একটু সংস্কার করতে চাইলে অন্তত কয়েকটা জায়গার আগাছা কাটা যায়, জঞ্জাল সাফ করা যায়, কিছু নারী-পুরুষ-শিশুর মুখে এক চিলতে হাসি ফোটে— অথচ তাও হচ্ছে না, এ এক বিরাট অসহায়তা এবং ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে।

# বিদেশী প্রযুক্তি-সাহায্য-উন্নয়ন

**এ ক**

গল্পটা বলেছিলেন জোহান গালটুং। গালটুং নরওয়ের মানুষ—সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, পাশাপাশি প্রচুর লেখালিখিও করে থাকেন। তা তাঁর দেশ নরওয়ের সরকার একবার ঠিক করল যে তারা সাহায্য করবে অনেক দূরের দেশ কেরালাকে।

কি ভাবে? কেন, কেরালা আর নরওয়ে দুটোই তো সমুদ্রের ধারের জায়গা। দু জায়গাতেই মাছ ধরা হয় প্রচুর পরিমাণে। বিশেষ করে নরওয়ে তো যথেষ্টই বিখ্যাত তার মাছের ব্যবসার জন্য। আর কে না জানে কেরালার জেলেরা কতো গরীব। তারা মাছ ধরে আদ্যিকালের সব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে। অতএব নরওয়ে সরকার ঠিক করল যে মাছ ধরার আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই গরীব জেলেদের ভাল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে। (অবশ্যই গোটা কেরালায় নয়, শুধু এক অঞ্চলে)। আধুনিক প্রযুক্তিতে বেশি মাছ ধরা পড়বে। আর তার ফলে দূর দূর অবধি গরিব লোকেদের অল্প পয়সায় মাছের যোগান দেওয়া যাবে। সত্যিই তো নীচের তলার মানুষেরা চাহিদা মতো প্রোটিন আর ক্যালোরি পায় না মোটেই।

নরওয়ে সরকারের এইসব প্ল্যান-প্রোগ্রামের আগে কেরালার জেলেরা যে খুব বেশি পরিমাণে মাছ ধরতে পারত না এটা সত্যি কথা। কিন্তু নিজেদের ধরা মাছের একটা অংশ তাদের পাতেও পড়ত। ঠিক এই অবস্থায় নরওয়ে মাছের জগতের কর্তা ব্যক্তিরা কেরালার ওই জেলেদের জীবনে ঢুকে পড়লেন তাঁদের দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে। ধারণাটা ছিল অনেকটা এইরকম যে যা নরওয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো তা কেরালার জন্যও সবচেয়ে ভালো। তাই এল আকর্ষণীয় সব ফাইবার গ্লাস আর আধুনিক ইস্পাত দিয়ে তৈরি ট্রলার, এল মাছ খোঁজার ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, এল ট্রলারের জন্য ডীপ ফ্রিজ।

গালটুং বলছেন যে এর ফলে জেলেদের জগতটাই বদলে যেতে শুরু করল। সেই পুরনো যুগের সব মেছুয়ারা যারা ছোট বয়স থেকে সমুদ্রে যেতে শুরু করত, মাছ ধরা শিখত বুড়োদের থেকে, তাদের জায়গা নিল অনেকটা কারখানায় মাল উৎপাদনের মতো মাছ উৎপাদন। জেলে হয়ে দাঁড়াল ফ্যাক্টরির লেবার। পাশাপাশি খরিদ্দারদের চেহারাটাও বদলে যেতে শুরু করল। গালটুং-এর মতে এটাই হল সেই জায়গা যেখান থেকে গল্পটা মোড় নিতে শুরু করল। প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নয়নের এই আখ্যানকে তিনি ভাগ করেছেন তিনটি ধাপে।

প্রথম ধাপে মাছ ধরার গোটা ব্যাপারটা থেকে মানুষের দেহের শক্তি ব্যবহার কমল,

বাড়ল যন্ত্রপাতি (মানে টাকা পয়সা), 'গবেষণা' (মানে টাকা পয়সা)। নরওয়ে সরকার চেষ্টা করল দূর দূর অবধি বাজারকে ছড়িয়ে দিতে, চেষ্টা করল মধ্যিখানের ফড়েদের এড়িয়ে মাছকে বাজারে আনতে। ফলে মাছকে নষ্ট না হতে দেওয়াটা একটা মূল জায়গা হয়ে দাঁড়াল। বরফ চাপা দেওয়ার জায়গায় বেছে নেওয়া হল ডীপ-ফ্রিজে রাখার ব্যবস্থা। সাইকেলে ঝুড়ি চাপিয়ে মাছ চালান্ দেওয়ার জায়গায় বিশাল মাপের তাপ-নিরোধক ভ্যান ব্যবহার শুরু হল। এইসব কাণ্ড-কারখানার নীট্ ফল হল যে, মাছ ক্রমশই দামী হয়ে উঠতে শুরু করল। দামী মাছ কে কিনবে? প্রোটিনের দরকার ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু চাহিদা কোথায়? অর্থাৎ এক কথায় বললে টাকার হিসেবে আগে প্রযুক্তি ছিল নিচু কিন্তু লোকেরা মাছ খেত। এখন উঁচু মানের প্রযুক্তি এল কিন্তু মানুষের খাদ্য হিসেবে মাছের ব্যবহার চলে এল খুবই নিচু জায়গায়।

দ্বিতীয় স্তরে এই অবস্থাটার উন্নতি ঘটানোর একটা চেষ্টা চালানো হল। পথটা ছিল হয় সস্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সস্তা মাছ উৎপাদন, নয় প্রযুক্তি দামীই থাকুক, খোঁজো নতুন খরিদ্দার—পরের রাস্তাটাই বেছে নেওয়া হল। কিন্তু প্রযুক্তির জন্য দাম চুকিয়ে, লাভ রেখে মাছের যে মূল্য দাঁড়ায় তা দিতে রাজি কে হবে। এটা তো জানা কথা যে, যাদের হাতে বেশি পয়সা সেই উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে অনেক জায়গাতেই আমিষ খাওয়া নিষিদ্ধ।

পথটা বেরোল গালটুং বর্ণিত তৃতীয় স্তরে। যখন জোর দেওয়া হল নানান জাতের চিংড়িমাছ ধরার ওপর। সত্যিই, অপূর্ব সব খাবার বানানোর উপাদান বটে। তবে এটা বলতেই হবে, যে দাম দাঁড়াল তা স্থানীয় নীচের তলার মানুষদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু যে কোনো প্রকল্পেই তো কয়েক বছর কেটে গেলে গরীব মানুষদের কথা প্রত্যেকেই বেমালুম ভুলে যায়, গরিবকে গলদা চিংড়ি খেতে দিতে হবে, এমন প্রতিজ্ঞা কে করেছে? অর্থাৎ দামী প্রযুক্তি তৈরি করল দামী পণ্য। আর এই দামী পণ্যর জন্য পয়সা খরচ করতে পারে এমন ক্রেতা কোথায়? কেন ধনী দেশগুলোতে। এই হল আধুনিক হয়ে ওঠার—দুনিয়াজোড়া বাজারের এক টুকরো হয়ে যাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সবকিছুই আধুনিক। যা ধরা হল, তা ধরা হল আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে, ধরল আধুনিক জেলেরা। আর আধুনিক খরিদ্দারদের কাছে আধুনিক কায়দায় বেচা হল।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এত সব কর্মকাণ্ডের ফলে স্থানীয় এলাকায় কিছু কি বদলাল? হ্যাঁ, কিছু তো বদলালই। স্থানীয় যে উদ্যোগপতি সবচেয়ে আগে এই প্রকল্পে এগিয়ে এসেছিল সে এর মধ্যে বানিয়ে ফেলল তার বরফ তৈরির কারখানা, মালিক হয়ে উঠল কম করেও পনেরোটা তাপ-নিরোধক ভ্যানের। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে তার লাভ গিয়ে দাঁড়াল অন্তত চল্লিশ লক্ষ টাকায়। এই টাকার কিছুটা সে গ্রামকে ফেরত দিল একটা পাঁচ তলা নীল-সাদা রঙের মন্দির বানিয়ে। তবে বেশিরভাগটাই লেগে গেল তার নিজস্ব প্রাসাদ বানাতে আর বন্দুকধারী রক্ষী পুষতে।

আর এসবেরই মধ্যে স্থানীয় মানুষরা একইভাবে কাটিয়ে চলল তাদের জীবন। চিংড়ি কারখানায় যারা কাজ পেল তারাও যে বেশি রোজগার করতে পারল তাও নয়। এক তো মাইনে অত্যন্ত কম, অন্যদিকে কোনো নিশ্চিত আয়ের ব্যাপারও নেই, কারণ আয় নির্ভর

করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কত মাছ ধরা পড়ছে তার ওপর। গোটা প্রকল্পটার এই হল নীট ফল।

## দু ই

অন্ধকার, কালো মলাটে ঢাকা ৩৫২ পৃষ্ঠার এক বই। বিষয়বস্তু : ক্ষুধা। নাম : 'কি করে অন্য অর্ধেক মরে'। লেখিকা সুশান জর্জের মতে এই অন্য অর্ধেক হল গরিব দেশের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আর এই ক্ষুধার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি ব্যবসা, বাজার, সাহায্য এসবের মধ্য দিয়ে প্রযুক্তিকে ছুঁয়েছেন। এটা স্বাভাবিক। কেননা পৃথিবীর গরিব অংশগুলোতে আমরা প্রযুক্তির পরিবেশে ক্ষুধাকেও পাই।

কেরালার জেলেদের গল্পটা সুশান জর্জই লিখেছেন উপরে বর্ণিত বইয়ের বিশেষ এক অধ্যায়ে, ওই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন তিনি 'প্রযুক্তি : কি করতে, কে দাম দেয়, এবং কার জন্য।' আমার মনে হয় প্রযুক্তির আওতায় যাঁরা এসেছেন—যাঁদের জগতের মধ্যে বহু দিক থেকে প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে এবং প্রযুক্তিকে নিয়েই যাঁদের বাঁচতে হচ্ছে এবং হবে, তাঁদের জন্য ওই শিরোনামটি যথেষ্ট জরুরি। এই প্রসঙ্গে সুশান জর্জের দেওয়া আর একটি উদাহরণের কথাই বলা যেতে পারে।

জনৈক ইউনিসেফ কর্মীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেড় লক্ষ টিউবওয়েল বসানোর এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল ভারত উপ-মহাদেশেই। যার প্রতি একশটার মধ্যে ষাটটাই খারাপ হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। ওই কর্মীর বক্তব্য হচ্ছে যে ভারতে একটা ট্রাডিশনাল সমাজ রয়েছে যার শিকড় অনেক গভীর অবধি গেছে। এখানে যদি ভাল করে চিন্তা-ভাবনা না করে ওপর থেকে কোনো নতুন টেকনোলজি চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে সেটাই প্রধান কারণ হবে এই ধরণের বিপর্যয়ের।

এছাড়া প্রচুর প্র্যাক্‌টিক্যাল কারণও থাকে। যেমন ডীপ টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে 'পাম্প' টাকে এখানকার মাপে মজবুত করে ডিজাইন করাই যেত, কিন্তু কেউ এসব দিকে মাথা ঘামায় নি। বড় সমস্যাটা হল যে গ্রামের লোকেদের সাথে এই কর্মকাণ্ডর যোগাযোগটা কি? তাঁদের চোখের তো ব্যাপারটা এইরকম যে 'একটা ট্রাক এল, মাটি খোঁড়া হল, একটা পাম্প বসল, ক্যামেরায় ছবি উঠল, বক্তৃতা দেওয়া হল, তারপর ট্রাকটা পরের গ্রামে চলে গেল।'

গ্রামের একজন সাধারণ মানুষকে কেউই কিছু জানায় না যে—'রিগ্'টা কেমনভাবে কাজ করে, জল থেকে কিভাবে ছোঁয়াচে রোগ হয়, কি সুবিধা এই টিউবওয়েলের। এমন কি, অনেকে এটাও জানেন না যে, কে বসাচ্ছে এই জল পাওয়ার যন্ত্র! এই পরিকল্পনায় গ্রামবাসীদের পরামর্শ কেউই চায়নি! অথচ ধরে নেওয়া হয় তাঁরা এটার দায়িত্ব নেবেন!

আর একটু ভাল করে দেখলে এটাও মনে হতে পারে যে এই টিউবওয়েলের সাথে 'জল' নামক দামী পদার্থটা কে পাচ্ছে, কে পাচ্ছে না—সে প্রশ্নটাও যুক্ত। অর্থাৎ জল কোন্‌দিক থেকে কোন্‌দিকে গড়ায়? (আমার এক বন্ধু ঈশপের বিখ্যাত গল্পটির উল্লেখ করে বলেছিলেন যে আমাদের সমাজে জল নীচের থেকে উপরের দিকে গড়ায়)।

প্রশ্নটা হল কে জল পাচ্ছে, কোথা থেকে পাচ্ছে, কি ভাবে পাচ্ছে? এবং শেষ অবধি কে লাভবান হবে এইসব প্রশ্নই গ্রামের টিউবওয়েল থেকে নর্মদা বাঁধ অবধি সব জায়গাতেই

ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রশ্নটা শুধু ভূতত্ত্ববিদ বা ইঞ্জিনিয়ারের নয় বিষয়টা ডাক্তার, সমাজতত্ত্ববিদ, রাজনীতিক এমন কি ধর্মীয় কর্তা ব্যক্তিদেরও। আর সব সময়ই যেটা ভুলে যাওয়া হয় সেই ভুক্তভোগী স্থানীয় মানুষজনেরও—যাঁরা যন্ত্র চালান, যাঁরা ব্যবহার করেন এবং সর্বোপরি বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত, আক্রান্ত হন তাঁদেরও। তাই সুশান জর্জ স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে—'কোনো সমস্যার শুধু টেকনোলজি দিয়ে উত্তর খুঁজে বের করলে সেটা পাঁচ মিনিটও নিরপেক্ষ উত্তর থাকবে না।' ঝুঁকে পড়বে ক্ষমতাশালীদের দিকে।

## তি ন

চারপাশে, আমাদের 'শিক্ষিত' পরিবেশে তাকালে যে ছবিটা অনেক সময়ই চোখে পড়ে সেটা হল যে অনেকেই 'টেকনোলজি দিয়ে উন্নয়ন হবে' এই কথাটাকে একটা বিশ্বাসের জায়গায় নিয়ে গেছেন, যেখানে তাঁরা পরিবেশটার কথা, সময়ের কথা, নানান স্বার্থের—নানান লোভের কথা এবং আরও হাজারো জটিলতার কথা ভাবেন না। ধরুন, কে ঠিক করবে 'টিউব রেল ভীষণ জরুরি', তার প্রযুক্তি আমাদের আনতে হবে। কে ঠিক করবে যে 'ট্রাম খুব বাজে', তার প্রযুক্তিকে বাতিল করতে হবে। আমাদের জল পরিষ্কার করার প্রযুক্তির থেকে ইনস্যাটের প্রযুক্তি বেশি প্রয়োজনীয়, এসব কে ঠিক করে? কি পদ্ধতিতে ঠিক করে? ধরুন বসানো হবে 'পম'। অর্থাৎ পাতাল রেলের নিজে নিজে টিকিট কাটার যন্ত্র। যার দাম কোটির অঙ্কে। যে টাকায় টিকিট কাটার যন্ত্রর বদলে বেশ কয়েকজন মানুষকে পরিশ্রম করানো যেত! গরীব দুনিয়ার 'সম্পদ' তো মানুষই। তবে এখানেও আসে একটা দেখার প্রশ্ন। কোন চোখে দেখব? মানুষকে 'বোঝা' হিসেবেও দেখতে পারেন। তাকে 'সম্পদ' হিসেবেও দেখতে পারেন। আর আপনি কোন্ ধরনের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবেন, সে প্রশ্নটাও এই পছন্দর সাথে জড়িত। অর্থাৎ কর্মীকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে প্রযুক্তি নয়তো তাকে সরাতে প্রযুক্তি। আবার যারা ক্রেতা, যারা ভোগ করে তাদের লাভের প্রশ্নটাও এর সাথে জড়িত।

## চা র

কি কি ধরনের প্রযুক্তি গরীব দুনিয়ার একটা প্রাচীন সমাজে ঠিক ঠিক খাপ খায় এটা একটা বিস্তৃত জটিল প্রশ্ন। ধরা যাক গাড়ির ক্ষেত্রে আমি উন্নতি বলতে বেশি জোরে ছোটাকে বুঝি। সেক্ষেত্রে আমি এমন প্রযুক্তি আনব, যা গাড়িকে আরও আরও বেশি জোরে ছোটাবে। কিন্তু তাতে হয়ত অন্য অনেক দিকে মারাত্মক সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে, এনার্জি খরচা করতে হবে অনেক বেশি, যার সাথে জ্বালানীর প্রশ্ন জড়িত, গাড়ি থেকে বেরোনো ধোঁওয়ায় স্বাস্থ্যহানির প্রশ্ন জড়িত। আরও কত কি। অথচ এই অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলোকে বিচার করে মনে হতেই পারে যে উঁচু মানের বাইসাইকেল-প্রযুক্তি আমাদের বেশি কাজ দিচ্ছে। ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাতে একটা ছোট মোটর জুড়ে নেওয়ার কথাও কেউ ভাবতেই পারেন। তবে যাই হোক 'দ্রুত গতি' এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু আমার কাছে আর উন্নতির একমাত্র প্রতীক রইল না। এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু বহু দিক নিয়ে চর্চা করে তবেই যে প্রযুক্তি

পছন্দ করা হয় এমনটা বোধহয় বাস্তবে ঘটে না। সুশান জর্জ যেমনটা বলেছেন যে গরিব পৃথিবীতে ধনী দেশগুলোর প্রযুক্তিকে নকল করে উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয়—এটাই সাধারণ তথ্য। ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। সুশান ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করেছেন—যেন একটাই মই আছে, উন্নতির মই। যার একদম ওপরের ধাপে রয়েছে পৃথিবীর বড়লোক অংশ। গরিব দুনিয়া ভাবছে যে এই মইটার ধাপ বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে যাব, ওদের মতন হব। কিন্তু মধ্যের ধাপগুলো তো ভাঙাচোরা রয়েছে। তো ইউরোপ-আমেরিকা যদি ধাপগুলো জুড়ে দেয় তবেই ওপরে ওঠা যাবে। অর্থাৎ তারা যদি প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে তাহলে কোনো দরিদ্র শহরও লস এঞ্জেলস হয়ে উঠবে, যেখানে মাথাপিছু এক দশমিক তিনটে করে গাড়ি আছে।

সমস্যাটা হল যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে লোকেরা একই ধাপ চড়ে চড়ে 'অনুন্নত' থেকে 'উন্নত' হয়েছে এই সাধারণ ধারণাটা নিয়েই গণ্ডগোল আছে। ইউরোপ—আমেরিকা যে আগে আফ্রিকার কোনো গরিব দেশের হুবহু নকল ছিল, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজকের অবস্থায় এসেছে এটাই বা কে বলেছে? প্রত্যেকটা অঞ্চলের নানান বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের বিশ্বাস বোধ, যুক্তির ধরণ, ইতিহাস, পরম্পরা সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রযুক্তি যদি চেহারা না পায় তবে তা কতটুকু সুবিধা নিয়ে আসবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকা খুবই স্বাভাবিক।

## পাঁ চ

অনেকেই এটা বলেন যে আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। এটা ঠিকই যে বোতাম টিপে শূন্য থেকে তো শুরু করা সম্ভব নয়। যেখানে সবাই আছে, যেভাবে জীবন চলছে সেখান থেকেই ঘটনাগুলোকে দেখতে হবে। আর এখানেই একটা বিচ্ছিন্নতার ও অসহায়তার অনুভূতি এসে যেতে পারে। কারণ করার কি আছে? ইউরোপ থেকে প্রযুক্তি আসে, দুর্জনেরা বলে "এত কিছু সূক্ষ্ম বিচার করছেন! দূর্, দূর্, এতো টেন্ডার, কন্ট্রাক্ট, কমিশনের উপর বাছাই।" চুপ করে থাকতে হয়, কেন না বড়লোক দুনিয়ার ব্যবসা যে প্রবল পরাক্রমশালী, তা কে না জানে? কে না জানে ঘুষ কতদূর অবধি ঢুকে পড়েছে? এইসব নিয়েই আজ বিদেশী প্রযুক্তি—সাহায্য-উন্নয়নের প্রশ্নটি যে কোন 'চিন্তা করেন' এমন মানুষকে এক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে।

*অদ্রোহ*, বইমেলা ১৯৯৩

২৭-২৮ মার্চ
১৯৯৩

## ফ্রেন্ডস' মিট-এর একটি প্রস্তাব

৩১।১।৯৩

১৯৯৩ সালের জুন মাসে কল্যানিতে বন্ধুরা মিলিত হয়েছিলো নানা বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য। সত্য ছিলো উদ্যোক্তাদের অন্যতম। প্রথমতঃ একটা চিঠি লিখেছিলো বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে, আর তারপর এই 'মিট' শেষ হলে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিখেছিল ইংরেজিতে — বাংলার বাইরের বন্ধুদের জন্য, যারা আসতে পারে নি ওই 'কল্যাণী মিট'-এ। দুটোই সত্য লিখেছিলো অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।

বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের কয়েকজনের মাথায় একটা আইডিয়া ঘুরছিল। একটা Meet Organise করতে হবে। যেখানে অনেক বন্ধুরা আসবে। কিছু বিষয় নিয়ে যতটা সম্ভব মন খুলে কথাবার্তা হবে। একটা কি দুটো রাত্তির সবাই একসাথে থাকবে। মনে হচ্ছিল বেশ একটা ভাল ব্যাপার হতে পারে। এর মধ্যে ছয়ই ডিসেম্বর ঘটে গেল। আমরা অনেকেই নড়ে চড়ে বসতে শুরু করেছি। চারপাশে তাকাতে গিয়ে অনুভব করছি আমরা কতটা চাপের মধ্যে আছি।

আসলে অনেকদিন ধরেই নানান সমস্যা আর প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে অল্পবিস্তর ক্লান্ত, বিরক্ত আমরা অনেকেই। যে চাকরি করে তারও মনে হয় যে চাপ বড় বেশী। আর যারা কাজ খুঁজছে তারা জানে যন্ত্রণা কত ভয়াবহ। ব্যক্তিগত জীবনের অসহায়তা আর Tension র মধ্যেই আবার সাধ্যমত প্রত্যেকেই কিছু করার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেই বুঝি এ অবস্থায় সাহায্য, সহযোগীতা, বন্ধুৎ ছাড়া মনের সজীবতা টিকিয়ে রাখা কত কঠিন কাজ।

তাই আসুন, ছোট কিছু কাজ আমরা খুঁজে বার করি। যা আমরা নিজেদের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে করব। চারপাশের উদ্যোগগুলোতে তো আমরা অংশগ্রহণ করিই, সেটাকে আর একটু গুছিয়ে করার চেষ্টায় বাধা কি ?

আমরা জানি একসাথে দুদিন বসে কথা বলে রাতারাতি কিছু তৈরী হবেনা। কিন্তু ফিরে আসার সময় যদি অন্তত এইটুকু মনে হয় যে, অন্তত আমাদের সাধ্যের মধ্যে কিছু করার চেষ্টা সম্ভব। যদি মনে হয় আমি একা নই অন্তত আমার একটা সুন্দর পরিবেশ আছে— তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হতে পারে, সেই আশা নিয়েই —

**সম্ভাব্য বিষয়**

১. ৬ই ডিসেম্বরের পরে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক, দাঙ্গা, সঙ্ঘ-পরিবারের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া আমাদের কাছে এক ভয়াবহ অবস্থা ডেকে আনছে। এমনকি একটা ছোট্ট বন্ধুদের জগতেও এর প্রভাব বিশাল ভাবে পড়ছে। প্রচুর খবর আসছে। চারপাশে নানান উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তা চালান খুব জরুরী।

FRIENDS' MEET 13-14 JUNE 1993 CALCUTTA

যাতে অবস্থা আরও খারাপ হলে আমরা কি করব, এখনই নানান প্রচেষ্টায় আমরা সবাই মিলে কি ভাবে সাহায্য করব— এ সব কিছুই আজকের বিষয়।

২. আমাদের বেকার - আধাবেকার বন্ধুদের সাথে একসাথে কোন সমবায় ভিত্তিক প্রজেক্ট সম্ভব কি না সেটা চাকরি করেন এমন বন্ধুদের ভাবতে হবে। কয়েকটি প্র্যাকটিক্যাল উদ্যোগ সামনে আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা যেতে পারে, সাধারণভাবে ভাল আয় করেন এমন বন্ধুদের সাথে তথাকথিত অল্পশিক্ষিত বন্ধুদের দূরত্ব, এরকম নানান স্তরের দূরত্ব কি করে কম করা যায়— এ সব কিছুই আজকের বিষয়।

□□

**Backgrounds** This part is based on a personal note by one of the initiators By '66-'67 the democratic awareness & solidarity of the people of West Bengal had become a beacon light in this subcontinent . Nobody could imagine how the 'vanguards' 'centralised leaderships' plunged this great popular unity into the era of hatred , in-fighting , murder - the 'red riot' -from ' 67-71. This broke the great solidarity to fragments and the'ultra-right' got the chance to make a come back,and beat the hell out of everybody from '71-'76 .In its aftermath in Bengal, since 70s - there has been a great depression where cynicism & paralysis rules the anti-establishment people till today .

But people have not been silent . All over the world, in Indian sub-continent also , the anti-authoritarian and humanist initiatives are creating new types of social movments , against development , in building peoples alternatives , dalit & tribal movments , women & peasants movments etc. A whole world of non-centralist social initiatives,movements, construction, organizations have come up .

Unfortunately even the news of these initiatives were not getting into West Bengal, deafened by our colonial & centralist traditions, its spirit broken since 70's. So since 80's many people were trying to cross-connect those non-

centralist /non-funded inititives in Bengal & outside . In our micro-neighbourhood in people`s science movment/alternate development/ other areas some feeble exchange & relations got set up in 80s . There were some modest linkages with organizations like CMSS,SMD and also with anti-communal & woman`s organizations .

Since 91 the linking also grew to a slight extent in the 'worker`s issues' area with the cooperation of our friends involved in support work for the worker, of sick & closed industries . So, when they organized a discussion on alternatives/struggles in labour movment we thought of inviting a few of our outside friends from various movment areas . These people, too, were interested in having long distance communication with people from different regions .

So they agreed to come & share their views , experiences & to discuss ways of improving the level of communication in a separate non group & non formal get-together besides participating in the abovementioned discussion on worker`s struggle and alternatives .

In Calcutta & the districts, a number of our friends were trying to develop cross regional communications for a considerable period of time. A few of them joined this process and some more were interested thus creating an environment for discussion on different aspects of the proposed meet.We felt that in such a small scale meet we need intimate & informal environ where people could speak out freely .......There will be less debate with party type social mind set. Regarding agenda, it was decided to keep the agenda brief and open. That is, as the meeting sits and proceeds, the will be developed changed according to the needs of participants. Also as friends from outside are puting in much more resources to come to Calcutta, primacy was given to thic suggestions. The content of the agenda was discussed informally in Delhi among the 'would be' participants. Also there were suggestions from friends of other areas. The agenda was of three sections. (A) Sharing life and work experiences. (B) Airing our feelings about anything we consider important to improve the common basis for communication & relation. (C) Practical & detailed exploration of how such communication can be better organized-between different cross-regional & cross-movement areas.Besides these points a few of our friends in Calcutta also thought to raise certain issues which were so called 'invisible questions' in any organized activity. How those who sit in the back never speaks their mind, the domination etc.There were also questions from some friends who felt that they need certain help/answers to overcome the diffculties they faced in their 'area specific` activities .

There were some confusion with the social & political views. When someone referred to terms like independent toilers initiatives or humanist

anti-autaritarian tendency in became vague in the meaning.It seems that we are still at a distance from having a clear & common basic language. So many were not clear as to the nature of the meet. and had different expectations. Also, to people comfortable with 'planned & goal oriented' meets such a free going informal meet jarred on. As the occasion utilised was that of a friendly groups annual public function. there was some confusion & misunderstanding as to whether this two day meet was in continuation of that function which it was not .

In the end we should mention that some of us sat with a few of the Calcutta friends to chalk out certain practical proposal for long distance commnunications and also to have an informal reception & socialsation cluster in Calcutta, who will carry on the work from their end. Here one idea was getting clearer. We all work in groups like PSM, support groups for workers, people controlled alternate development, women's movement etc. But our life & activities are not confined to them only. We also are concerned in an alternate way of living, relating & involving in a social liberation process, however nabulous presently. Again,we communicate at a group to group level.

That is more routine. Here,we can think of setting up an informal friendship links who have a special interest in long distance communication in general. This has been helping & will help such group to group communication in general too.

## যন্ত্রণা

এখন মোমঘষা নীলে আকাশ
আধো যন্ত্রণায়
শুনতে ইচ্ছে করে পাতার নির্জন শব্দ
পাতার নির্জন শব্দ

## দুই হাজার উননব্বুই

সারি সারি পেভমেন্ট্ ওই
শুয়ে আছে নিস্তব্ধ কবরমালার মতো—
রুগ্ন আকাশের গায়ে
লেপ্টে থাকে ধূর্ত চাঁদ
নারকীয় তাপে
ঝলসায় পথ ঘাট, ঘটে যায়
অন্ধত্ব বা চর্মরোগ—
ঝিলি হয়ে গেলে পর
শেষ আয়োডিন,
স্বাভাবিক লাগে শুধু টুং টাং
ধাতব আওয়াজ।
গড়িয়াহাটের মোড়ে কাল কার নাকি
খুলে গিয়ে শিরস্ত্রাণ
রক্ত হাড় মজ্জার ইত্যাদির নিতান্তই প্রদর্শনী।
টার্মিনালে টার্মিনালে শীতল স্তব্ধতা দারুণ
জমে থাকে এক বিন্দু জল
হাওয়া জুড়ে শুধু ভেসে যায়
গ্রীক অক্ষরের মতো কিছু বিষ
অহর্নিশ।

সুমুখে শান্তি পারাবার —
নিউক্লীয় যুদ্ধ শেষ হলে
বিছানায় আনন্দ অপার।

## কবিতা

আমি পড়ে যাচ্ছি
হাজার তলার
ওপর থেকে।
কানের মধ্যে
গনতানের ধাতব,
আর্তনাদ
সঙ্ঘের থেকে সমবেত স্তোত্র পাঠ।
যন্ত্রণা........ যন্ত্রণা........
যন্ত্রণা........।

## Revelation

Last night I found myself
bursting out at seams.
A dream of chimneys surrounding me.
Black cloud's rushing
Yelling, screaming crowds
I did hear
Choirs footsteps.
I did feel
Clutches of death
Death—full of filth, greed and numbness.

I woke up.
Drank a glassful of water.
(ofcourse from a costly filter)
May be I am seeing too much
horror movies these days.

Thank god,
my specialisation is dry cell .......
At that moment with a chill
I remembered the cat o' nine tails.
The magic whip moved
The cat metamorphosed into a wolf
I tried to cry
It sounded Grr - Grr - rr.

## A Moving Mural

At midnight
The window opens.
It's the sea-shore, sand-dunes,
The whistling sound.
The door opens.
It's the jackboots, barbed wires.
Black vans.
Now, at such unearthly hour
Through my door and window
Both death and life peeps through.
In the shadows
Thousand faces wait —
Wait for the coming morning.
Time moves.

## No Entry

At the crossing,
Running through the indifferent crowd
He shouted, 'Help me, I am doped'.
With a cruel laugh,
They brought straitjacket.
He did not struggle.
Now at the same place
I am standing quietly.
A pale moon hangs on
With slight indifference.
I am watching them.
Ice-cold zombies —
With mechanical regularity
They are bringing 'Road-block'
signs all around me.

## When You Issued the Rejection Slip

When you kicked me out
I, too came out through your left eye.
And found myself hanging precariously
                    from your nose.
Oh, that nose I once admired.
Then I got hold of your lips,
Oh, those moist and warm lips.
And I did a number of somersaults
                              in the air.
and landed gently on the floor.

Now, watching you, towering over me
                with a menacing gesture
I wonder how could you bring back
Yourself to a life like size.

## A Surrealistic Scenario

When you left me
I found traces of sad silence in your eyes.

So I, too went inside myself.
And closing the door behind me
I walked up the stairs,
made out of my own ribs
and reached the window near my heart
            which I once carved for myself
                                but never used.
Now Leaning out of that window
I watch the outside world
Tramcars, returning crowd from the football match,
a mass rally all bringing
a din, whiff of laughter, mixed noise.
                        But here silence, only silence
                                        Prevails.

# A concerto for Calcutta

I

For dreams are dreams
but reality stinks.
And half the city is
under a spell of prehistoric darkness.
And the other half is
Submerged under a layer of black glue.
Only a lonely stereophonic music player
converses with the howling wind
through the deserted streets
creating a weird melody.
The magic escalators and
ghost Tram–cars glide alongwith
shadowy midgets and sorcerers.
In the early morning
near the cathedral
I watch expressionless faces
as they dissolve
through a screen of white mist.
This reminds me of all the loud knocks
on the door at unearthly hours
And all the sound of heavy footsteps
through the darkness.

II

The city has no use of those
kite–flyers and coloured fish-pedlars.
For the street unchin
who builds up a fantasy world
in midst of this cacophony
the old city is dead.
Dead with all the Jasmines
and ice blocks.
Dead with all the gas-lamps
and bands playing raucous music.
In it's place stand
a merciless megalopolis.

A symmetric being
A zing thing
where eveb shrubs and bushes
fell ashamed to grow.

III

One day we will find
snow-capped mountains from our window.
And there will be pine–forests
in and around the business–district.
Enough rainbows to satisfy all.
And seashores at every street corner.
There will be unrestricted coupons
for dew-drops, moonlight and fireflies.
And we will be there
on our balcony.
And the evening river
will bring a fragrance.
Perhaps then the vibrations could be touched.
But that is a wishful dream
and reality stinks.

# বিশ্বকাপ ফুটবল

উন্মত্ত কোলাহল আপাতত শেষ। আর এই নীরবতার মধ্যেই নীচু গলায় কথা বলে ওঠে যুক্তি। হ্যাঁ, বিশ্বকাপ জ্বর এবারের মত নেমেছে। ভাবতে ইচ্ছে করে শীর্ণকায় সেই মানুষটির কথা। অফিস টাইমের তারকেশ্বর লোকালের দমবন্ধ করা ভীড়কে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল ক্রোধ আর হাহাকার মেশান তাঁর গলা। 'ওরা মারাদোনাকে খেলতে দিল না।' ইনি হলেন সেই অসংখ্য মানুষদের একজন গত এক মাস যাঁদের বিনিদ্র রাত কেটেছে টেলিভিশনের পর্দার সামনে। গোলের মধ্যে আছড়ে পড়া উত্তেজনায় যাঁরা গলা ফাটিয়েছেন। চীৎকার করে তর্ক করেছেন কে ভাল কে মন্দ এই নিয়ে কিম্বা সুযোগ পেলেই কিনে ফেলেছেন সুপার স্টার 'বাজ্জোর' পনিটেলের রহস্যর মতো চুটকিতে ভরপুর কোন পত্রিকার 'বিশ্বকাপ স্পেশাল', রঙিন পোস্টার। তাতে যদি মাসিক বাজেটে টান পড়ে তো পড়ুক না, দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি থেকে তো একটু মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? খেলাধূলা তো নির্দোষ আনন্দ?

তবু তো শেষরক্ষা হয়েছে। ব্রাজিল জিতেছে। স্বস্তির ঢেউ লেগেছে অফিস কাছারি, রোয়াক থেকে দূর গ্রামের ক্লাবঘর অবধি। টিভির হাত ধরে এ ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে গরীব দুনিয়া জুড়ে। আর খোদ ব্রাজিলে.....হাজার হাজার মানুষের জয়োল্লাসের মত্ততা সেখানে আকাশে বাতাসে। আর এরই মধ্যে কথাটা টুকুস করে বলে ফেলেছেন সেই দেশেরই এক সাংবাদিক 'ফুটবল ছাড়া ব্রাজিলবাসীদের আর কিইই বা আছে, বহুদিন ওরা প্রাণ খুলে হাসতে পারে নি'। হ্যাঁ, পাহাড়ের মত দুর্নীতি, আকাশ ছোঁয়া বাজারদর, আকণ্ঠ দেনা আর মুখ খুললেই শাসকের রক্তচক্ষু— কে ভুলিয়ে দিতে পারে এইসব যন্ত্রণা ও অপমান? কে ফিরিয়ে আনতে পারে সেই আহত ইগো? জাতির সম্মান?

তবে সব চিঁড়ে তো আর আবেগ দিয়ে ভেজে না। তাই বিশ্বকাপ নিয়ে দুনিয়াজোড়া জুয়া ও তার ফলস্বরূপ কোটি কোটি টাকা এদিক-ওদিক করতে খেলার গড়াপেটা করতে হয়। আর এর জন্য আঙুল নাড়াতে হয় মাফিয়া কর্তাদেরই। এমনিতেই অবশ্য পৃথিবীখ্যাত ক্লাবগুলো পরিচালনা করতে তাঁদেরই হাত লাগাতে হয়। তা না হতে ডাঁই ডাঁই কালো টাকাকে সাদা করার ঝক্কি সামলাবে কে? আর খেলোয়াড়? তাকে তো কেনা বেচা করা হয়, তাই তাবে হয়ে উঠতে হবে সবচেয়ে নিখুঁত যুদ্ধের ঘোড়া। বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এসব শব্দ তার নৈতিকতার অভিধানে থাকবে না। রোমান গ্লাডিয়েটারের মতো তাকে শুধু লড়ে যেতে হবে। পড়ে গেলেই অতল অন্ধকার..............।

না, টিভির পর্দায় নেপথ্যের কাহিনী ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না কিভাবে ফুটবল ক্লাব-পরিচালক দেশ-পরিচালক হয়ে যান ফুটবলের উন্মাদনা, ফুটবলের শ্লোগানকে সামনে রেখে।

ধরা পড়ে না মনের কোন বিকৃতিতে খেলা যুদ্ধ হয়ে ওঠে। হিংসা ছড়ায়, ক্রোধ ও ঘৃণা তৈরী করে। যার বলি হয় সাধারণ মানুষ অথবা নির্দোষ কোন খেলোয়াড়।

অথচ ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হয় কি প্রচণ্ড শক্তি আজকের সংবাদ মাধ্যমগুলোর যাদু-ছোঁয়ায়, যার প্রভাবে আধপেটা খাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা সেই মফস্বলবাসী ডেলি প্যাসেঞ্জার মাদক চোরাচালানের মত জঘন্য কাজের সাথে যুক্ত, ফুটবল তারকার যন্ত্রণা নিজের করে নেন।

অথচ একেবারে উল্টো অভিজ্ঞতায় এক বন্ধু বলছিলেন ইরাক যুদ্ধের কথা। মার্কিন বোমা শহর গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষ অসহায়, আক্রান্ত। আর চিপস খেতে খেতে টেলিভিশনে সেই দৃশ্য দেখছেন দর্শকরা, খেলা দেখার ভঙ্গিতে। টার্গেটে আঘাত হানতে পারলে উত্তেজিত হচ্ছেন যেন গোল হচ্ছে।

একে কি বলব? মানসিক প্রোগ্রামিং? সত্যিই কি ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাস্তবকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দিতে পারে? না কি গণমানসেই সুপ্ত আছে নানান বীজ, টেলিভিশনের মতো মাধ্যম তাকে শুধু জাগিয়ে তুলছে? প্রশ্ন, অস্বস্তি তো অনেক। আমরা শুধু বলব নীল আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের ওপর চামড়ার গোলকের পেছনে ধাবমান বালকরা যেন হারিয়ে না যায় টিভি স্ক্রীনের সামনে। বোতাম টিপে যেন ফুটবল তারা না খেলে।

*অপ্রকাশিত রচনা,* ১৯৯৪ (?)

# পর্যটন, পরিবেশ ও উন্নয়ন

## এ ক

গোয়া বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পাহাড়, সমুদ্র আর সবুজের স্বপ্ন, ভ্রমণ পিপাসু মন যে দিকে যেতে চায়। সত্যিই, প্রতিবেশী মহারাষ্ট্রের যে কোনও জেলার থেকে ছোট্ট এই গোয়ার আছে এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পর্তুগীজ ধাঁচের কিছু চমৎকার স্থাপত্যকলার নিদর্শন। এখানকার সমুদ্র সৈকত তো পৃথিবী বিখ্যাত। তাই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে আসেন। তবে শুধু 'সাইট-সিইং'ই নয় অনেকের কাছেই গোয়া হল ফূর্তি করার জায়গা। আর 'ফূর্তি' বলতে আজ যা যা বোঝায় গোয়াতে তার বন্দোবস্ত রয়েছে পুরোদমে। মদ সস্তা, পাওয়াও যায় অঢেল (প্রতি ৪০ জনে একটি লাইসেন্স-সহ বার। বেআইনী যে কত তার হিসেব কে রাখে!)। সমস্ত আমোদ প্রমোদের সুবিধে সহ হোটেল, সুইমিং পুল, সমুদ্রের ধারে নির্ঝঞ্ঝাটে সূর্য-স্নানের ব্যবস্থা, মহিলা সঙ্গী, আরও কত কি? তাই শুধু ভারত উপমহাদেশ নয়, ইউরোপ-আমেরিকার ফূর্তি করতে চাওয়া মানুষরাই বেশী করে ভিড় জমান এখানে। বিশেষত যেখানে 'ডিভ্যালুয়েশনের' দৌলতে সামান্য কটা ডলার ফেললেই রাজার মত সবকিছু উপভোগ করা যাবে। আর এসবই স্বাগতম। কারণ গোয়ায় টাকা আসছে। ডেভলপমেন্টের পথ তো এটাই।

হ্যাঁ টাকা তো আসছেই। ধরুন সমুদ্রের ধারে আনজুনা, ভ্যাগাটর বা মান্‌ড্রেমের কথা। এসব জায়গায় প্রায়ই তিন চার হাজার বিদেশী জড়ো হন। আর তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য সমুদ্র সৈকতে আয়োজন করা হয় 'বীচ পার্টি'র। শোনা যায় প্রতি খেপের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকদের সাথে নাকি হাজার দশেক টাকায় রফা হয়। ছোট জেনারেটর লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে অধিক শক্তিশালী স্পিকারে চড়া সুরের গান-বাজনা চারদিক কাঁপিয়ে দিতে পারে। মদ, ড্রাগ, শরীরী আনন্দ সব কিছুরই ঢালাও ব্যবস্থা থাকে। রাত এগারটায় শুরু—আর চলতেই থাকে, এমন কি পরের দিন সকাল এগারটা অবধি। এসব সময়ে কোনও কর্তৃপক্ষের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না। অবশ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য রয়েছে গুন্ডারা। ...

এটা ঠিক যে গোয়ার মানুষের সত্যিই ছিল এক উচ্ছল প্রাণবন্ত নাচ-গানের সংস্কৃতির রেওয়াজ। কিন্তু যা ছিল এক সমাজের নিজস্ব লোকসংস্কৃতি, তার মধ্যে আজ বাজার ঢুকে পড়ে তাকে চরমভাবে বিকৃত করছে। 'কার্নিভাল কালচার' তথা শুধুই আমোদ প্রমোদের ইমেজ সামনে রেখে তা গোয়া জুড়ে মধ্যবিত্তের ঘর ভাঙছে, সমাজের নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের জীবনের মর্যাদা নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করছে।

স্বস্তির বিষয় যে গোয়ার কিছু মানুষ আজ সোচ্চার হয়েছেন। একদিকে তাঁরা সংস্কৃতির

নামে এই হানাদারির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন। অন্যদিকে রুখে দাঁড়াচ্ছেন গোয়ার জল-জঙ্গল-পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে।

## দু ই

গোয়ার উপকূল অঞ্চলকে বলা হয় 'খাদ্যের ঝুড়ি' (ফুড বাস্কেট)। মাছ, নুন, চাল, নারকেল, ফল এবং সব্জী সবই আসে এখান থেকে। আর এই উপকূল অঞ্চল ধরেই আজ গড়ে উঠেছে একদিকে সিবা গেইগি, জুয়ারি অ্যাগ্রো বা উষা ইস্পাতের মত শিল্প অন্যদিকে জাপানিদের গ্রাম, মার্মাগোয়ার মুক্ত বন্দর ও গল্‌ফ কোর্স এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু সবচেয়ে বড় নির্মাণ বোধ হয় হোটেলের ক্ষেত্রেই ঘটছে। ৪০ টির বেশী লাক্সারী হোটেল আজ উন্নতি না অবনতি কিসের প্রতীক সে প্রশ্ন সামনে এসে গেছে। কারণ হোটেল ও তার সুইমিং পুলের জলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে গোয়ার গ্রাম আজ শুখা। যেখানে সেখানে কনস্ট্রাকশান করতে গিয়ে স্বাভাবিক জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যার খারাপ ফল পড়ছে গোয়ার স্পর্শকাতর প্রকৃতির ওপর। শুধু হোটেল নয়, আরামবোল-পালিএম মালভূমি অঞ্চলের পেরনেম তালুকে বয়স্ক জাপানিদের জন্য তৈরী হচ্ছে এক গ্রাম। ১০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে ৫১৯টি পরিবার। এখানকার জন্য জল নেওয়া হবে টিল্যারি সেচ প্রকল্প থেকে। গরীব মানুষ জল না পাক, ২০টি গ্রামের মালিক দেশপ্রভুদের তো লাভ হবে। কারণ তাদের জমিই তো জাপানিরা নিচ্ছে। এই কিছু লোকের তাড়াতাড়ি টাকা কামানো আজ গোয়ার ইকলজির ওপর চরম আঘাত হানছে। আর সরকারি মদত? ১৯৯১ সালের ব্র্যাকিস্ ওয়াটার ফিস্ ফার্মিং রেগুলেশন বিল অনুযায়ী ধান চাষের জন্য 'খাজান' জমির এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে আজ পরিকল্পনা চাওয়া হচ্ছে বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে। আর এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ খুবই। কারণ চিংড়ি মাছ বিদেশী মুদ্রা আনবে। কিন্তু এর জন্য বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা গোয়ার যে স্বাভাবিক বাঁধ ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে নদী, ধান জমি, আর নোনা এলাকা (সল্টপ্যান)—তার দাম কে দেবে?

গোয়ার মানুষ এ সব প্রশ্ন তুলছেন। ট্যুরিজম বলতে কি বোঝায়? কেমন ট্যুরিজম তাঁরা চান? গোয়াতে শিল্প বসাতে গেলে কি এখানকার বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে না? এসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে। গোয়ার মানুষের পরম্পরা-ভিত্তিক নিজস্ব সংস্কৃতি এবং পরিবেশকে বাঁচানোর দাবীতে আন্দোলন ক্রমশ সংহত হচ্ছে। গোয়া জাগৃতি ফৌজ, বাইলাঞ্চো সাদ্, বাইলাঞ্চো ভয়েসের মত নানান সংগঠন একত্র হয়ে ১৯৯১ সালে তৈরী করেছে 'সেভ গোয়া ক্যাম্পেইন'। পেরনেম তালুকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে তৈরী করেছেন 'পেরনেম কোস্টাল পিপলস ওয়েলফেয়ার অ্যাকশন কমিটি', যাতে তাঁরা লড়তে পারেন বিলাসবহুল পর্যটন, গল্‌ফ কোর্স, জাপানি গ্রাম এসবের ক্ষতিকারক প্রভাবের বিরুদ্ধে। গোয়ার এই আন্দোলন আজ দাবী করছে সমস্ত উপমহাদেশের মানুষের সমর্থন।

*সূত্র* *গোয়া আপডেট*, মাপুসা, গোয়া-৪০৩৫০৭

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

# ফিলিপাইন্‌সের পেপসি-বিরোধী আন্দোলন

চারপাশটা বদলাতে আগ্রহী সামাজিক-রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্টরা জানেন যে কোনো ব্যাপারেই আজকাল মানুষজন সহজে সাড়া দিতে চান না তা সে যতই নিষ্ঠুর শোষণ-বঞ্চনা চোখের সামনে চলুক না কেন।

এক বন্ধু বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। দীর্ঘদিন ধরে চলা নিপীড়ণের ঘটনা সরাসরি সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ প্রচার করে তিনি দেখেছেন কেউই নড়ে বসতে চান না। অথচ খেলার টিকিট নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ফুরিয়ে যাওয়ার মত ঘটনাতেও জনতাকে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখেছেন তিনি।

কোন্ ঘটনায় মানুষ প্রতিবাদ করে এবং কোথায়ই বা সে নিশ্চুপ এই নিয়ে অনেকেরই নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, তবে ১৯৯২ সালে শুরু হওয়া ফিলিপাইন্‌সের এক ঘটনা এ ব্যাপারে সত্যিই আমাদের নজর কাড়ার যোগ্য। ঘটনাটা এই রকম .....

১৯৯২ সালে পেপসি কোম্পানী (এক নামজাদা বহুজাতিক কোম্পানী যাদের পেপসি কোলা আমাদের এখানেও দোকান-বাজার ছেয়ে ফেলেছে) ফিলিপাইন্‌সের খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এক বিজ্ঞাপনের ঝড় বইয়ে দেয়। তাদের বক্তব্য ছিল ('আজই আপনি দশ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারেন।') কোনো একটি বিশেষ নাম্বারযুক্ত ছিপিসহ পেপসির বোতল তারা বাজারে ছেড়েছে। এই ছিপি যার হাতে পড়বে সে মালিক হবে দশ লক্ষ পেসোর (পেসো-ফিলিপাইনসের মুদ্রা), মার্কিনী মুদ্রার হিসেবে যা হল চল্লিশ হাজার ডলার। এই বিজ্ঞাপন ঢেউ-এর ফলে বহু পরিবার সকালে-বিকেলে পেপসি খেতে লাগল আর একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে জমাতে লাগল ছিপির পাহাড়। প্রতি রাতে, প্রায় প্রার্থনা করার মতো পরিবারগুলো টিভির সামনে অপেক্ষা করেছে সেই বিশেষ নাম্বারের আশায় যা তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে। ঠিক এমনিই এক রাতে টেলিভিশনের মাধ্যমে পেপসি ঘোষণা করল সেই বিশেষ নাম্বার—সংখ্যাটি ছিল 349। যার কাছে এই নাম্বার যুক্ত ছিপিটি আছে সেই ভাগ্যবানই মালিক হবে এই বিপুল অঙ্কের টাকার।

আপাতভাবে সবই ঠিক ছিল শুধু পেপসি যে গণ্ডগোলটা করে ফেলেছিল সেটা হল যে তারা একটি ভুল নাম্বার বাজারে ছেড়েছিল। লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর ভাষায় 'মার্কেটিং-এর দুনিয়ায় এমন এক ভুল পেপসি করেছে যা দুনিয়ায় সবচেয়ে জঘন্য ভুল হিসেবে পরিগণিত হবে।

একজন বিজয়ীর জন্য একটি ছিপিতে বিশেষ নাম্বার লাগানোর জায়গায় তারা

৮০০,০০০ বোতলের ছিপিতে ৩৪৯ সংখ্যাটি ছাপিয়েছে। ফলে খুব তাড়াতাড়িই বেশ কয়েক হাজার মানুষ পুরস্কার দাবী করতে শুরু করে, যার হিসেব ১০০ কোটি ডলারকেও ছাড়িয়ে গেছে। পেপসি এত টাকা দিতে অস্বীকার করেছে ...'

এর ফলাফল? পেপসিরই রেকর্ড অনুযায়ী পেপসির পানীয় বওয়া ট্রাকগুলির অন্তত ৩২ টিতে পাথর ছোঁড়া হয়েছে, আগুন লাগান হয়েছে বা উল্টে দেওয়া হয়েছে।

সশস্ত্র লোকেরা পেপসির কারখানা ও অফিসে আগুনে বোমা ছুঁড়েছে। সবচেয়ে বীভৎস এক ঘটনা ঘটে রাজধানী ম্যানিলার এক শহরতলি অঞ্চলে। ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ একটি দাঁড়িয়ে থাকা পেপসির ট্রাকে এক ধরণের একটি গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। গ্রেনেডটি ট্রাকে না ফেটে ছিটকে আসে এবং রাস্তায় ফাটে। এই বিস্ফোরণে একজন স্কুল শিক্ষক ও একটি পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে মারা যায়, আহত হয় আরও ছ'জন।

পেপসির কর্মকর্তারা প্রচুর খুনের হুমকি পায়। ফলে তারা সারাক্ষণ দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে শুরু করে। এমন কি তাদের অফিস যাওয়া বা বাইরে ঘুরতে যাওয়াও খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে পেপসির প্রত্যেকটি ট্রাকের মাথায় বন্দুকধারী রক্ষী বসান হয়। ওই বহুজাতিক কোম্পানীর প্রায় সমস্ত মার্কিন অফিসারদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে কর্তৃত্ব দেওয়া হয় এমন একজন লোককে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত বেইরুটে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

১৯৯৩-র সেপ্টেম্বর মাস অবধি হিসেব অনুযায়ী পেপসির কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে দেওয়ানী মামলা দায়ের হয়েছে ২২,০০০-এরও বেশী। আর ৫,২০০টি ফৌজদারী মামলায় লোকঠকানো ও জুয়াচুরির অভিযোগ আনা হয়েছে। লস এঞ্জেলেস টাইমস-এর রিপোর্টলেখক বব্ ড্রোগিনের ভাষায় 'এ দেশের সবদিকে চুরি-ঘুষ আর দারিদ্র্য, লোডশেডিং মানুষের নিত্যসঙ্গি—কিন্তু একমাত্র প্রতিবাদ যা ক্রুদ্ধ জনতাকে নিয়মিত রাস্তায় নামাচ্ছে তা হল পেপসির বিরুদ্ধে।'

পেপসির বিরুদ্ধে সংগঠিত উদ্যোগ, যেমন—কোয়ালিশন 349. হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনছিল। ড্রোগিনের বক্তব্য অনুযায়ী-রাজধানী ম্যানিলার এক চরম ভ্যাপসা গরম বিকেল। বিক্ষোভ-সমাবেশের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন চুয়ান্ন বছর বয়সী এক মহিলা, প্যাশিয়েনশিয়া সালেম। ড্রোগিনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন আগের বছর এই রকম এক বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালীন স্ট্রোক হয়ে তাঁর স্বামী মারা যান্ এবং তিনিও তৈরী আছেন এই একই রকম পরিণতির জন্য। প্যাশিয়েনশিয়ার ভাষায় 'আমি যদি মারাও যাই আমার ভূত ফিরে আসবে পেপসির সাথে লড়তে। কারণ এটা ওদের ভুল আমাদের নয়। ওরা পুরস্কারের পয়সা দিচ্ছে না। তাই আমরা লড়ছি।'

ফিলিপাইন্‌সের মানুষ এমন এক ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে আছেন যা প্রত্যেক দিন তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের শ্রমশক্তিকে লুঠ করছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে অধিকাংশ ভুক্তভোগী, আক্রান্ত মানুষই কিন্তু প্রতিমুহূর্তের এই নিপীড়ন-অত্যাচারের প্রতিবাদ করছেন না। অথচ পেপসি একটাই ভুল করেছে (কোন একজন মানুষের পয়সাওয়ালা হওয়াটা আটকে গেছে)। আর তার ফলে প্রতিবাদ সর্বত্র।

মানুষের প্রতিবাদ করা বা না করা কিসের ওপর নির্ভর করে? ধরুন খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতেই কোনো লটারির প্রাইজে দু নম্বরী হল কিছু ফাটকাবাজ, আমলাদের যোগসাজশে। প্রকৃত ক্রেতারা ঠকলো, কিছুই পেলো না। কি হতে পারে সেক্ষেত্রে? বিরাট ঝামেলা ও গণ্ডগোল তো হওয়ার কথাই। অথচ বাস্তবে 'সৎ লটারি'র টিকিটের ক্রেতারা যে সামগ্রিক ভাবে সব সময়ই ঠকেন এটা কিন্তু কাউকে একটুও বিচলিত করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেটা আমাদের চোখে খানিকটা কৌতুকবহ মনে হতে পারে। আমেরিকার এক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু কর্মী প্রচার চালাচ্ছিলেন ছোট্ট দেশ এল সালভাডোরের ওপর মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের নোংরা প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। প্রচুর খাটাখাটনির পরেও তাঁরা তেমন একটা সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হন। অথচ হঠাৎ করেই তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে ক্যাম্পাসে ছেলে ও মেয়েদের সাধারণ (কমন) বাথরুম আলাদা করে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষর আদেশকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করছেন এবং সে নিয়ে শুরু হয়ে গেল এক বিরাট আন্দোলন।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য—আমরা কি খুঁজব? এক জায়গায় মানুষ নিপীড়িত অবস্থার মধ্যেই মাথা গুঁজে থেকে যাচ্ছে, বিদ্রোহ করছে না। অন্য জায়গায় কখনও কখনও সে এমন বিষয় নিয়ে ফেটে পড়ছে যা আসলে তার জীবনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে না।

একটা মত হল যে, পেপসির অপরাধ এবং পুঁজি ও রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী নিপীড়নের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ তফাত আছে। পেপসি ভুল করেছে, তার জন্য তাকে চেপে ধরা যায়, ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। অর্থাৎ কি হতে পারে, একটা বিকল্প ছবি মানুষের মাথায় আছে। কিন্তু পুঁজি যেভাবে প্রতিদিন সবদিক থেকে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে মারে, ক্লান্ত করে দেয়, তার সুরাহা কি ভাবে হবে? এমনটা তো মনে হতেই পারে যে এ আমাদের জীবনেরই একটা অংশ, প্রায় নিয়তির মতো, যাকে এড়িয়ে যাবার কোনো রাস্তাই নেই! এ-যন্ত্রণা প্রাকৃতিক নিয়মের মত!

যদি আমরা মেনে নিই যে উপরে যেভাবে বলা হল তফাতটা প্রধানত সেখানেই হচ্ছে, তবে আমাদের উদ্যোগে, আমাদের প্রয়াসে এই দিকটাতেই জোর দিতে হবে যে টিভিতে প্রতিটি বিজ্ঞাপন, প্রতিটি চাকরির প্রতিশ্রুতি, প্রতিটি সরকারি বাণী, পেপসির পুরস্কারের ভাঁওতার থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। আমাদের বুঝতে হবে 'পাইয়ে দেওয়া'র এইসব খুড়োর কল কত মারাত্মক। কাজটা সহজ নয়। কারণ যতক্ষণ না প্রকৃত বিকল্পের এক স্বচ্ছ পরিস্কার ছবি আমরা তৈরি করতে পারছি, ততক্ষণ চিন্তায় চেতনায় কোন সত্যিকারের পরিবর্তন দূর অস্ত্।

তথ্যসূত্র : *জেড ম্যাগাজিন*, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৪

# প্রতিবাদের শিকার

২২ জানুয়ারি ১৯৯৫-তে খুন হয়েছিলেন পরিবেশ আন্দোলনের বন্ধু নীলেশ নায়েক :

যাদের কাছে 'ব্যবসা' শব্দের অর্থ হল অবাধ লুণ্ঠন ও পরিবেশের সামগ্রিক ধ্বংস, সেই বহুজাতিক পুঁজি ও তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছে পঁচিশ বছরের যুবক নীলেশ নায়েক।

তার 'অপরাধ' ছিল আমেরিকান এক বিশাল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থা ডু-পন্ট্ এবং তার এদেশী সহযোগী থাপারদের মালিকানাধীন গোয়ার বুকে তৈরি হতে যাওয়া বিতর্কিত নাইলন কারখানার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হওয়া।

এ বছর জানুয়ারী মাসের 22 তারিখ, এক শীতের বিকেলে, কোনো সাবধান বাণী ছাড়াই, সরকারি অফিসারদের উপস্থিতিতে, রাষ্ট্রীয় তকমাধারি পুলিশ সামনাসামনি বুকে গুলি করে মারে নীলেশকে। সেই সময় সে অংশগ্রহণ করছিল শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত এক পথ অবরোধে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণের প্রথম শিকার হন সামনের সারিতে থাকা নারী আন্দোলনকারীরা। মারাত্মকভাবে জখন হন তাঁদের কয়েকজনও।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা দায়ী করছি প্রকল্প মালিকদেরও। নিরপরাধ মানুষের রক্তের দাগ তাদের হাতেও লেগেছে। কারণ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কাছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে 'চরম কড়া ব্যবস্থা' নেবার জন্য তারা জোরাল দাবি জানিয়েছিল।

নীলেশের মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। শোক, বন্ধু-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আমরা গোয়ার জনস্বার্থ তথা পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সাথে একযোগে জোরালো দাবি তুলছি:

**গোয়ার জনজীবন তথা ইকোলজি ধ্বংসকারী নাইলন কারখানা প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হোক।**

*বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, এপ্রিল-জুন ১৯৯৫*

# হিংসার উৎস সন্ধানে : একটি চলচ্চিত্র সমালোচনা

**'পিতা পুত্র আউর ধরমযুদ্ধ'**, পরি. : আনন্দ্ পট্টবর্ধন (১৬ মিমি, রঙ্গিন, ১৯৯৪,১২০ মিনিট)

১৯৯৬ এর 'পটভূমি' শারদ সংকলনের এই লেখাটি সত্যব্রতর 'পটভূমিতে' শেষ লেখা। তার পরে ১৯৯৮ তে অবশ্য— 'পটভূমি' বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'পিতা, পুত্র-আউর ধরমযুদ্ধ' ভিডিওতে যখন অশোকনগরে 'পটভূমি'র অড্ডায় দেখানো হয়, তখন সত্যব্রত এখানে এসেছিল। চলচিত্রটির একটি ভূমিকা, প্রদর্শনের আগে দর্শকদের সামনে ও রেখেছিলো। 'হিংসার উৎস সন্ধানে ঃ একটি চলচিত্র সমালোচনা' (লেখাটির জন্ম হয়েছিল সেই রাতেই)। কেটে গিয়েছে আরও পাঁচ বছর। সত্যব্রত প্রয়াত। 'পটভূমি'ও বন্ধ। অন্য বন্ধুরা যে যার দ্বীপভূমিতে মগ্ন। এখন, ছবিটা এরকমই। এখন, সময়টাই এমন।

১

পর্দা জুড়ে অন্ধকার রাতের বুক চিরে জ্বলছে আগুন। তার শিখায় পুড়ে যাচ্ছে নিরপরাধ মানুষের জীবন ও জীবিকা। ছায়ার মত মানুষের নড়াচড়া। এরই মাঝে আমরা শুনতে পাই কিছু কন্ঠস্বর। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাস, বম্বে শহর। মুসলিম গণহত্যার সেই দুঃস্বপ্নের সময়ে এই দৃশ্যকে সামনে রেখে আনন্দ্ পট্টবর্ধন ও তাঁর বন্ধুরা কথোপকথন চালান হত্যা আর লুঠতরাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের সাথে। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি কেন তীব্র শত্রুতা? কেন হিংস্রতা ? এর পিছনে কাজ করে কোন মনস্তত্ব? অনুসন্ধানের এক নির্দিষ্ট পথ বেয়েই এগিয়েছে এ ছবি । দেখাতে চেয়েছে শুধুই টাকা পয়সা বা অন্য ধন-সম্পদ লুঠ নয়, সাম্প্রদায়িক হিংসার পেছনে রয়েছে পুরুষত্বর এক উদ্ধত যুদ্ধবাজ 'পুরুষালি' চেহারা। যাকে গড়ে তুলেছে সংগঠিত ধর্ম আর পিতৃতন্ত্র হাতে হাত মিলিয়ে। পাশাপাশি এ ছবি দেখাতে চেয়েছে কিভাবে নিজের ধর্মের অনুশাসনের চাবুকে আর অন্য ধর্মের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণায় দ্বিগুণ আক্রান্ত হচ্ছেন নারীরা।

২

বম্বের রাস্তায় ক্রুদ্ধ পুরুষকন্ঠ চিৎকার করে বলে 'প্রধানমন্ত্রী রাওকে শাড়ী পড়তে বলো।' প্রশ্নোত্তরে জানা যায় যে শাড়ী হলো পাপ, অক্ষমতার প্রতীক। এখান থেকেই ছবির প্রথম অংশটি আমাদের উপমহাদেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক সংঘর্ষের আবহাওয়ায় নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের দু'একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। বোধহয় তাই নির্মাতারা এ অংশের নাম রেখেছেন 'অগ্নিপরীক্ষা' (ট্রায়াল বাই ফায়ার , ৬০ মিনিট)। বম্বের রাজপথ থেকে এ ছবি পেছিয়ে যায় রাজস্থানের দেওরালায় , সময়ের মাপে ! চৌঠা সেপ্টেম্বর,

১৯৮৭. রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনা ঘটে। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের মুখে রক্ষণশীলরাও সংগঠিত প্রচার করতে থাকে। ক্যামেরার সামনে এসে পড়ে রাজপুতদের বর্ণভিত্তিক সংগঠনের এক নেতা, সতীর গৌরব গাথায় মুখরিত হয়ে ওঠে সে। এক দিকে আমরা দেখতে পাই রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারীকে দেবী করে তোলার ইমেজ তৈরীর চেষ্টা (রূপের ভাই বলে যে সে জীবিত অবস্থায় আমাদের বোন ছিল কিন্তু এখন সে মা।) অন্যদিকে সতী বিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের 'দুশ্চরিত্রা' বলে অভিহিত করা হয়। গোদাবরী—এক রাজপুত নারী বিশ্বাস করে ভগবানই তাঁর পবিত্র রশ্মি দিয়ে রূপকে পুড়িয়েছেন। এক সস্তা বাঁধানো ফটোই তার কাছে মস্ত বড় প্রমাণ। দুটো ছবি জুড়ে যে এই ফটো তৈরী হয়েছে সেই জালিয়াতিও তার বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে না। অন্য দিকে জয়পুরের এক মহিলা সতী-বিরোধী মিছিলে যোগ দেন, প্রশ্ন তোলেন যে পুরুষও কেন সতী হবে না? আর একটি স্তরে আমরা দেখতে পাই রাজপুত পুরুষদের সশস্ত্র মিছিল, সতীর জয় জয়কার, উগ্র শ্লোগান। সতীমাহাত্ম্য প্রচারের 'চুনরি মহোৎসব' বন্ধ করার সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে উগ্র ধর্মীয় রাজনীতি সংগঠিত হয়। এর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয় মুসলিম শাসকদের হাতে যৌন-লাঞ্ছনার আশঙ্কায় স্ব-ইচ্ছায় সতী হওয়ার লোকগাথাকে। প্রতীকি হয়ে ওঠে সতীস্থলে তলোয়ার হাতে যাওয়ার আহ্বান।

এক মিছিল থেকে ক্যামেরা চলে আসে আর এক ধর্মোন্মত্ত মিছিলে। ১৯৮৭ সালের আহমেদাবাদ, গুজরাট। রথযাত্রার মিছিল যাবে মুসলিম এলাকার মধ্য দিয়ে। দাঙ্গা বাধেই ফি বছর। ধর্মীয় নেতা শম্ভু মহারাজের মুখ থেকেই আমরা শুনি কি ভাবে পুলিশ মিলিটারিও হিন্দু হয়ে ওঠে, গুলি চালায় মুসলমানদের ওপর। যার ফল হয় এক সন্তানহারা মায়ের কান্না। মহারাজ অবলীলাক্রমে তৈরী করে যান মুসলমানদের এক ইমেজ, যে উগ্র স্বভাবের, আমিষ খায়, গাদা গাদা সন্তানের জন্ম দেয়। রাজনীতির মঞ্চেও নেমে পড়েন তিনি। জনসভায় ঘোষণা করেন জন্মনিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে হিন্দুদেরও আটটা করে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিতে হবে, বিধর্মীদের সাথে টক্কর দেবার জন্য। আর এই পুত্র সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা যে কত প্রবল তা দেখতে পাই আজকের আধুনিক কেরলে। জ্যোতিষ, কম্পিউটার আর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের যোগসাজশে পুত্র লাভের জন্য চেষ্টা করতে দেখি সমাজের শিক্ষিত, বিত্তশালী অংশের মানুষদের। লন্ডনে স্কুল অফ ইকনমিকসের এক প্রাক্তন ছাত্রকেও দেখা যায় এখানে। দেওরালার সেই রাজপুত মুখপাত্রর মত প্রায় একই ভাষায় কথা বলেন তিনি। হিন্দু নারী যে কত সুখী তা বলার সাথে সাথে তিনি এটাও জানিয়ে দেন যে হিন্দুদের নরম স্বভাবের জন্যই সংখ্যালঘুরা এত বাড় বেড়েছে।

৩

এ ছবির শুরুতেই ধারাবিবরণীর ঢং-এ আমাদের বলা হয়েছিল পুরুষত্ব-ধর্ম এবং হিংসার এক গভীর সম্পর্কের কথা। বলা হয়েছিল অধিকাংশ ধর্মেই একথা সত্যি। এখানেই পরিচালক চলে আসেন সংখ্যালঘুদের জগতে। মহরমের দিন মুসলিম কিশোর যুবক নিজেকে অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্যে দিয়ে তার পুরুষত্বের পরিচয় তৈরী হয়। বীর হয়ে ওঠে সে।

৪

উভয় ধর্মের পুরুষরা যখন ধর্মের মাপের যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে তখন নারীর জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে 'অগ্নি পরীক্ষা।' কিন্তু আত্মসমর্পণ করে আগুনে প্রবেশ করার বদলে আগুন নেভাবার লড়াইও করছেন কিছু নারী। এর এক উদাহরণ বম্বের সংগঠন 'আওয়াজ এ নিশান'। যার প্রধান সংগঠিকা শাহ্ নওয়াজ লড়েছেন ইসলামিক বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের সংকীর্ণ, নারী বিরোধী চরিত্রর বিরুদ্ধে। ছোট ছোট দৃশ্যে আমরা দেখে ফেলি কি ভাবে মুসলিম মহিলারা প্রথম 'নারী' হিসাবে নিজেদের সমস্যা নিয়ে একে অন্যের সাথে আলাপ করছেন, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। একসাথে বসে নারী আন্দোলনের গান করছেন অমুসলিম মহিলাদের সাথে। ছবির এই অংশ শেষ হয় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিলে তাঁদের অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে।

৫

বৃটিশ শাসকরা অপবাদ দিত ভারতীয় পুরুষরা দুর্বল, ভীরু আর মেয়েলি স্বভাবের। যোদ্ধার জাত আখ্যা দিয়ে তারা আলাদা করে নিয়েছিল শিখ, রাজপুত আর গোর্খাদের। হয়ত বা তারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু জাতীয়তাবাদ রাণা প্রতাপ বা শিবাজির মত চরিত্রকে মডেলবীর হিসেবে তুলে ধরে। ছবির দ্বিতীয় অংশের (হিরো ফার্মাসী, ৬০ মিনিট) বিষয় মূলত 'বীরত্ব'এই ধারণার নির্মাণ। ধরা যাক শিবাজির কথা। তিনি যে একজন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে মুসলিম ব্যক্তিও ছিলেন, এসব ইতিহাস বাদ দিয়ে শিবাজির উপাখ্যানকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছে তা হিন্দু পুরুষত্বেরই প্রতীক। আজকের মারাঠী হিন্দু যুবকের চোখে তিনি'হিন্দু' নারীর রক্ষক, 'হিন্দু' মহারাজা। তাঁর সময়ই 'হিন্দু'মাথা উঁচু করে বেঁচেছিল। বালথ্যাক্রে সেই শিবাজীর পতাকাকেই তুলে ধরে মুসলিম বিরোধী ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। আগুন ঝরানো উগ্র কথাবার্তা বলে উন্মাদনায় ভাসিয়ে দেন মারাঠী হিন্দু জনমানসকে। পাশাপাশি 'স্যাটানিক ভার্সেস' বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয় মুসলমান যুবক। রুশ্‌দিকে হত্যা করা তার পবিত্র কর্তব্য। সেও নেমেছে ধর্মযুদ্ধে।

শিবসেনা বন্ধ্ ডাকে। একক হিন্দু যুবক সাহসী হয়ে ওঠে দলবদ্ধ ভাবে গাড়ি আটকানোর মধ্য দিয়ে। ছুরি মারা হয় এক শিখকে। শিব-জয়ন্তীর (শিবাজীর জন্মদিন) নামে একদিকে মস্ত সমারোহ। ধর্মযুদ্ধের জন্য অস্ত্রধারণের কথাবার্তা (তরোয়াল নয়, আমাদের চাই এ.কে৫৬)। অন্যদিকে ফিল্মষ্টার মন্দাকিনীর মডেল, অর্ধনগ্ন নারী পুতুল। একদিকে শরীর চর্চা, দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শনী। অন্যদিকে যৌন তৃষ্ণা মেটাতে অ্যাডাল্ট সিনেমা, ছবির পর্দায় ধর্ষণ, হিংস্রতা। এই দ্বিচারিতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মন তৈরী করে যুবক। স্খলিত কণ্ঠস্বরে জানায় যে সুযোগ পেলেই রূপোলী পর্দার কল্পনাকে বাস্তবে নামিয়ে আনবে সে। নয়ত নিজের শরীর থেকে সুখ নিংড়ে নেবার রাস্তা তো রয়েছেই।

৬

শিশুমনও বাদ নেই। ভিডিও-তে তারা দেখছে রক্ত হিম করা হিংস্রতার প্রদর্শনী, 'ডব্লিউ ডব্লিউ এফ' আয়োজিত কুস্তির লড়াই। ছোট বয়স থেকেই মনে গেঁথে যাচ্ছে যে ছেলেরাই

হলো ছেলে আর মেয়েরা মেয়ে। বিদেশীকুস্তিগীর 'মাচো' বম্বে এসেছে, মুখোশে ঢাকা চোখ, বিশাল দেহ, অদ্ভুত পোষাক, বাচ্চারা অভিভূত। বাচ্চারা 'মাচো'র জয়ধ্বনি করে। কারণ 'মাচো' শক্তিশালী, কখনও হারেনা, যুদ্ধ করে যায়। বাচ্চারা শিবসেনারও জয়ধ্বনি করে। মাচো আর শিবসেনা এক হয়ে যায়।

শিশুমনের এই বিশেষ মানসিকতাই কৈশোর ও যৌবনে ( এমন কি অনেক বেশী বয়স অবধি) মুখোমুখি হয়। যৌনতাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নানান অতিকথার। ফুটপাথের ওষুধ বিক্রেতার মুখ থেকে আমরা শুনি যৌন ক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান। আমাদের যাবতীয় দুর্বলতার জন্য (এমন কি অলিম্পিকে মেডেল না পাওয়াও) দায়ী করা হয় যৌন অক্ষমতাকে। বীর্যবান হওয়ার, নারীর যৌনতাকে দখলে রাখার আহ্বানের সাথে এক হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উগ্র ধর্মবাদী ডাক।

ভোটের রাজনীতির জন্য উগরে দেওয়া হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার জিতিয়ে দেয় ধর্মীয় দলের প্রার্থীকে। আর তাদের বিজয় মিছিলে পোড়ান বাজির আগুন বদলে যায় রায়টের আগুনে। বম্বে, ১৯৯৩, ভিটি ষ্টেশন। শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ভীত সংখ্যালঘু নারী শিশু পুরুষ। রিলিফ ক্যাম্প, কান্নারত বাচ্চা কোলে মায়েরা। প্রশ্ন করে 'কোথায় যাব, আমরা?' হয়ত বা এরই প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘু পুরুষত্বে আঘাত লাগে। প্রতিশোধ, বম্ববাষ্ট, এক শ্রমিকের পুত্র-কন্যা বোমার আঘাতে মৃত। তার করুণ জিজ্ঞাসা এই হানাহানির কারণ নিয়ে। তার স্ত্রীর কান্না এক হয়ে ওঠে খুন হয়ে যাওয়া মুসলিম সোশ্যাল ওয়ার্কারের স্ত্রীর (সীমা) কান্নায়।

তবু নারীর সাথে নারী জোট বাঁধে। সীমাকে সাহস দেয় শৈল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হানাহানির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে নারী- পুরুষের যৌথ মিছিল। দাঙ্গায় জ্বলে যাওয়া হিন্দুর বাড়ী সারাতে হাত লাগায় মুসলমান কারিগর। প্রশ্ন করা হয়, ৫০,০০০ বছরের মানবসভ্যতায় যুদ্ধর ইতিহাস মাত্র ৫,০০০ বছরের। যাওয়া কি যায় না সেই অন্য সময়ে?

৭

দুটিঅংশে বিভক্ত বলে এ ছবি কিন্তু শুধুই দু দিক থেকে শুরু হয়ে এক বিন্দুতে মিলিত হওয়ার নিটোল, সরলরৈখিক ছবি নয়। আধুনিকতা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র প্রত্যেকটি বিষয়ই কিভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনার সাথে যুক্ত হয় তাও এসেছে এ ছবিতে। ছবির বক্তব্যের মাঝে বেজে ওঠে বাজার চলতি হিন্দী গানের টুকরো। রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনার মাঝে ঢুকে পড়ে টিভি সিরিয়াল রামায়ণের সীতা, দীপিকা চিকালিয়ার অগ্নি-পরীক্ষার দৃশ্য। দেখান হয় কিভাবে হিন্দুর রক্ষাকর্তা হিসেবে শিবাজির চরিত্রকে গঠন করতে ব্যবহৃত হচ্ছে সিনেমার গল্প।

এখানে রক্ষণশীল সমাজের আধিপত্য তৈরী হয় আধুনিক মোড়কে। তাই শিবাজি থেকে র‍্যাম্বো, সোয়ার্জনিগার, ভ্যান ডার্ম। হিন্দী ছবির বড় বড় কাট আউটে বলশালী, হিংস্র মুখের নায়কদের হাতে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। পাশাপাশি শম্ভু মহারাজের মুখ দিয়ে বলানো হয় কিভাবে রথযাত্রা মিছিলের হাতি পুলিশের ভ্যান উল্টে দিলে পর পুলিশ-মিলিটারিও 'ভগবানের ইচ্ছে' মেনে নেয়। আধুনিক রাষ্ট্র ঢুকে পড়ে ধর্মের ছাতায়।

এখানে বিজ্ঞানও বাদ নেই। তাই সুসজ্জিত আধুনিকা আমাদের জানায় যে মন্ত্রপাঠ হলো

বিজ্ঞান, এক ধরণের সাউন্ড ভাইব্রেশান, এই প্রসঙ্গে আলট্রাসাউন্ডের কথা তোলা হয়। আর পুত্র কামনার তীব্রতায় আধুনিকতা বশ্যতা স্বীকার করে মন্ত্র নির্ভর যজ্ঞের আধিপত্যের কাছে।

৮

ছবির একদম গোড়ার দিকে কালো পর্দায় আমরা দেখতে পাই অতি প্রাচীন এক গর্ভবতী স্ত্রী-মূর্তি। এই মূর্তিকে সামনে রেখে ধারাবিবরণী আমাদের পৌঁছে দেয় সেই যুগের কথায়, যখন জন্মদাত্রী হিসেবে বিশেষ পরিচয়ে নারীদের ঘিরে আবর্তিত হতো সমাজ। (এখনও কিছু আদিবাসী সমাজে এর রেশ দেখা যায়)। কিন্তু পরবর্তিকালে জন্মদানে ও যুদ্ধে পুরুষের ভূমিকা সমাজকে পুরুষশাসিত করলো। মধ্যযুগের ইউরোপে তো সংগঠিত ধর্ম আর পিতৃতন্ত্র হাতে হাত মিলিয়ে নারীদের পুড়িয়েই মেরেছে। সতীপ্রথা কিন্তু আরও জটিল। কলঙ্ক লেপন করে মেরে ফেলা নয়। বরঞ্চ মৃত্যুর মাধ্যমে আরও গৌরব বৃদ্ধি, উপকথা গড়ে ওঠে দেবীত্বকে ঘিরে। যথেষ্ট মুনশিয়ানার সাথে পরিচালক বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন। পিতৃতন্ত্রের ভিতরের বিষয়কে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন গোটা ছবি জুড়েই। শহিদ আর সীমাকে যখন হিন্দু জনতা ধরে তখন কিন্তু তারা শহিদকেই হত্যা করে আর সীমার জন্য থাকে নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা। এক ধর্মসম্প্রদায়ের পুরুষত্বের শৌর্য অন্য সম্প্রদায়ের পুরুষকে হত্যা করায়, এবং অন্য সম্প্রদায়ের নারীর যৌনতাকে দখল করায়। এই হল ধর্মযুদ্ধ।

১০

বর্তমান দুনিয়ায় রাজনীতির চেহারা অনেকটাই বদলে গেছে। সাম্য ও মুক্তির বিশ্বজনীন আবেদন আজ অনেকটাই দুর্বল। আর সেই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদাভেদ ভিত্তিক নানান মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয় কাঠামো। সব জায়গাতেই যে কোন বিপর্যয়ের জন্যই আঙুল দেখিয়ে দায়ী করা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। বড় দেশের মধ্যে আলাদা আলাদা আত্ম-পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে যে যার নিজের দেশ বানাতে চাইছে। বড় রাষ্ট্রও নামিয়ে আনছে সন্ত্রাস। প্রত্যেকেই তৈরী 'অন্যদের' নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে অথবা 'ধর্মযুদ্ধের' বেদীতে আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়ে শহীদের মর্যাদা খুঁজে নিতে। আর অস্ত্র প্রযুক্তির মারণ ক্ষমতার ক্রমশ বৃদ্ধি এই হানাহানিকে করে তুলছে আরও কুৎসিত।

এই সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই 'পিতা পুত্র আউর ধর্মযুদ্ধ' ছবির কাজ চলেছে আমাদের উপ-মহাদেশের কিছু বিশেষ জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসার চেহারাকে ঘিরে। নির্মাণের সাত সাতটা বছর ধরে এ ছবির চোখে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ধর্ম, হিংসা আর 'পুরুষত্বের' পরিচয়ের এক নিবিড় সম্পর্ক। এ ছবি প্রশ্ন তুলেছে হিংসার পেছনে যে মন রয়েছে তার গঠন নিয়ে। কি ভাবে গড়ে ওঠে 'আমরা' আর 'ওরা' এই ভাগাভাগি? শৌর্য-বীর্য দিয়ে ঘেরা পুরুষত্বর ভিতরে কি রয়েছে এক নিরাপত্তাহীনতার বোধ, যা আগ্রাসন বাড়ায়? এখানেই এর গুরুত্ব।

*পটভূমি*, ১৯৯৬

# জার্মানিতে নীচের তলার বিপ্লব

২০০০ সালের অসুস্থতার পর থেকে সত্য আর ভালো করে লিখতে পারতো না। কিন্তু জার্মানির বন্ধু রেনহার্ডের দেওয়া লোউ মারিন-এর লেখা 'জার্মানিতে তলার বিপ্লব' প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে ওঁর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় প্রায় মাস দুয়েকের চেষ্টায় (একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পারতো না) অনুবাদ শেষ হলো। এই অনুবাদের মুখবন্ধ হিসেবে 'অনুবাদকের কথা' শিরোনামে সত্য নিজের কিছু কথা বলেছে। দু-একটি পত্রিকায় এই অনুবাদটি পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে প্রকাশিত না হওয়ায় সত্যর খুব আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল পুরো লেখাটা আলাদা ভাবে ছাপিয়ে বন্ধুদের মধ্যে Private Circulation করার। ছাপার কাজ চলছিল। এর মধ্যেই সত্য চলে গেল। অনেক অপূর্ণ ইচ্ছার মতই এই লেখাটার মুদ্রিত সংস্করণ সত্য দেখে যেতে পারেনি।

**জার্মানিতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের উপরে অহিংস ডাইরেক্ট অ্যাকশন অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলির প্রভাব (১৯৭২-২০০০)**

এবছর রাষ্ট্রপতি শ্রোয়েডারের লাল সবুজ [১] জার্মানি সরকার একটা আইন বানিয়েছে। এই আইন বলছে, জার্মানীর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বত্রিশ বছর পর্যন্তই চালু থাকবে। এবং আর কোন নতুন কেন্দ্র বানানো হবে না। এই আইন থেকে প্রত্যাশা করা যায়, দু-হাজার কুড়ি সালে জার্মানিতে শেষ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

গোটা ব্যাপারটা জার্মানি সরকারের একটি চমক দেবার প্রয়াস মাত্র। যাতে পারমানবিক শক্তি বিরোধী আন্দোলনকে সন্তুষ্ট করা যায়। এই আন্দোলন ১৯৭৪ সালে শুরু হয় এবং ২৫ বছরের বেশি সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, এর সাফল্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বড় বড় কোম্পানির যারা আধুনিকতম প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে এমন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৯৮৭ সালের পর থেকে একটাও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারেনি, এবং ১৯৯৮ সাল থেকে মারাত্মক বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ চলাচল সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই বর্জ্য পদার্থ লোকালয়ের উপর দিয়ে পুনর্ব্যবহার করার জন্য কারখানায় পাঠাতে হয়, মূলত ফ্রান্সে। নয়তো এর স্থান হয়

---

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পশ্চিম জার্মানিতে দুটি প্রধান দলের একটি হল সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দল। মার্ক্সীয় পথে যাত্রা শুরু করে আজ এই দলের সাথে রক্ষণশীল এবং পুঁজিবাদী অন্য প্রধান দল ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির তফাৎ সামান্যই। পরম্পরাগত কারণে এদের বামপন্থী মনে করা হয় যাদের পতাকার রং লাল। এই মুহূর্তে এরা জার্মানি সরকার পরিচালনা করছে অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবেশবাদী গ্রীন পার্টির সাথে কোয়ালিশন করে। গ্রীন পার্টির পতাকার রং সবুজ।

পারমানবিক আস্তাকুড়েই [২]। এই পারমাণবিক যাতায়াত চালু করার জন্য সরকার বিশেষ করে '২০০০ সালে বন্ধ' আইনটি প্রোপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার করছে। তবে এ সব সত্ত্বেও আন্দোলনের শক্তি জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাধ্য করেছে অন্তত সরকারিভাবে নিউক্লিয়ার শক্তির সামাজিক ব্যবহার বাতিল করতে। মনে রাখতে হবে, জার্মানিতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ৩২ শতাংশ আসে নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে।

## হিংসা বিরোধী, ডাইরেক্ট অ্যাকশন গোষ্ঠীগুলির জন্ম ও নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সত্তরের গোড়ায় ছাত্র-বিদ্রোহের শেষ লগ্নে হিংসা বিরোধী অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলি একটি পত্রিকা প্রকাশ করল। তার নাম "গ্রাসরুটস্ রেভোলিউশন।" উদ্দেশ্য এক হিংসা বিরোধী সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা। এই গোষ্ঠীগুলির প্রথমটি গড়ে ওঠে ১৯৬৮ সালে। যদিও থিউজের মিচেলশেফের মত ব্যক্তিরা অনেক বছর আগেই এই পরম্পরা দেখে গেছেন।

ছাত্র আন্দোলন তার শেষ ধাপে অনেক জটিল সমস্যায় পড়েছিল। সরাসরি রাস্তায় নেমে কাজ করার তাৎক্ষণিক প্রেরণা তারা পেয়েছিলো, এবং তা পেয়েছিলো সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যগুলোতে, মার্টিন লুথার কিং এবং কালো মানুষদের নাগরিক অধিকার আন্দোলন থেকে। এটা ছিল প্রয়োগের দি ক। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকে পড়ে বিকল্প সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যেমন— বসে পড়া (Sit-in). শিক্ষিত হওয়া (Teach-in). ভিতরে ঢোকা (Go-in) এরকম আরো কত কি। [৩]

কিন্তু তত্ত্ব ছিলো দেশে দেশে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে আর্ন্তজাতিক ঐক্য গড়ে তোলা, যেমন ভিয়েৎনাম, আলজেরিয়া ইত্যাদি। এই তত্ত্ব আর প্রয়োগের বিপরীতমুখী চরিত্র "কি করতে হবে" তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলে দিল। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে এর দুই ধরনের উত্তর ছিলো।

একদিকে ছিলো প্রয়োগকে ঠিকমত কেটে ছেঁটে তত্ত্বের অনুসরণ করা। তার মানে ইউরোপের

---

২. পারমাণবিক পদার্থ বহু বছর ধরে বিষাক্ত মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে। নিউক্লিয়াব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি আর অন্য বহু কিছুই স্থায়ীভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবহার শেষ হলেই এরকম অনেক কিছুই ফেলা হয় একটি আলাদা জায়গায়, ঐ জায়গাটি একশ ভাগ সুরক্ষিত করতে হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে, কেননা, বহুদুর অবধি—গাছ থেকে মানুষ অবধি এর জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এখানে একটা কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, তেজস্ক্রিয়তা অপ্রতিরোধ্য ফলে ঐ স্থানের আশেপাশে বিকৃত শিশু থেকে মারাত্মক ক্যান্সার দেখা যায়।

৩. ষাটের দশকে বিশ্বজুড়ে উত্তাল গণ আন্দোলনের মধ্যে সৃজনশীল নানান আন্দোলনের রূপ বেরিয়ে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ ছাত্ররা আবিষ্কার করছিল, শিক্ষা জগতের বড়কর্তারা তার কি শিখবে একতরফাভাবে ঠিক করে দেয়। অধ্যাপককে মান্য করতে হয়, সেটাই হল বাধ্যতার ট্রেনিং। এর সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজে পেল নতুন ধরণের আন্দোলনের রূপ। সবাই মিলে ঠিক করবে, তারা কি শিখবে। অধ্যাপককে নামিয়ে আনা হল ছাত্রদের সমান উচ্চতায়। যুগ যুগ ধরে মেনে নেওয়া বাধ্যতার মুখোমুখি হল জীবন্ত সব প্রশ্ন। একে বলা হয় 'টিচ ইন'।

তথাকথিত নগরভিত্তিক [৪] রাষ্ট্রগুলিতে সশস্ত্র গোষ্ঠী গড়ে তোলা। জার্মানিতে ১৯৭২ সালে গড়ে উঠেছিল "রেড-আর্মি" গোষ্ঠী। নব্বই দশকের শেষ অব্দি তারা সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে গেল। যদিও সত্তরের শেষের দিকের পরাজয় তাদের প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছিলো। এরকম আরো অনেক গোষ্ঠী ছিলো, তবে তাদের শক্তি ও প্রভাব ছিলো অনেকাংশে সীমিত। যেমন "রেড-সেলস্ বা মুভমেন্ট অফ সেকেন্ড জুন।"

এই জটিল সমস্যার আর একটা উত্তর ছিলো। সেটা হলো যা প্রয়োগ করছি তাই দিয়ে তত্ত্ব গড়ে তোলা। আসলে ছাত্র আন্দালনের কাজকর্মের এক বিরাট অংশ ছিলো হিংসা বিরোধী সরাসরি অ্যাকশনের পক্ষে। তাই ১৯৭২ সালে একটা পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিলো যা বুঝিয়ে দেবে হিংসা বিরোধী অ্যানার্কিস্ট আন্দোলনের ব্যাপারস্যাপার।

ওই সময় থেকে "গ্রাস-রুটস্ রোভোলিউশন" পত্রিকা চেষ্টা করেছে হিংসা বিরোধী অথচ জঙ্গী কাজকর্মের ইতিহাস ও তত্ত্ব ছড়িয়ে দিতে এবং জোর দিয়েছে সরাসরি অ্যাকশনের উপর। হিংসা বিরোধী অ্যানারকিজমের শিকড় নতুন করে আবিষ্কার করতে হলো, কেননা নাৎসীরা [৫] এই ধরনের যত পরম্পরা ছিলো তাকে দমন করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দশকগুলো এইপথে যেটুক এগিয়ে ছিলো তা নাৎসীরা খতম করে দিয়েছিলো। সুতরাং এই পরম্পরার আবিষ্কারের লক্ষ্যে অন্য দেশের দিকে তাকাতে হয়েছিলো। এই পত্রিকা কিছু কিছু ঐতিহাসিক আন্দোলনকে পুনঃআবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলো। শিখতে চেয়েছিলো আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন থেকে এবং ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে নিউক্লিয়ার শক্তি ও অস্ত্র বিরোধী আন্দোলন থেকে। ইংল্যান্ডের এই আন্দোলনের সঙ্গে অ্যানার্কিজ মতবাদের যোগ ছিলো নিবিড়। তবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পত্রিকা শিখতে চেয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে হিংসা বিরোধী গণ আন্দোলনের কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর কথা বিশেষ করে এসে যায়।

এরই কিছু সময় পরে উঠে এলো হল্যান্ডের অ্যানার্কিস্ট পরম্পরার নাম করা যেতে পারে বার্ট ডে. লিট, বম্লারা উইটম্যান্ বা ওনরিয়েটে রোনান্ড-হস্ট। জার্মান ভাষাভিত্তিক এলাকাতেও অ্যানার্কিস্ট পরম্পরা ছিলো, যেমন— গুস্টাভ্ ল্যান্ডডাইর, রুডলক্ রকার বা পিয়েরে র্যাসুৎস। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জার্মানিতে অ্যানার্কো সিন্ডিকালিস্ট [৬] একটি ট্রেড ইউনিয়ন

---

৪. মধ্যযুগে জার্মানি, ইটালী অনেক শহর গড়ে ওঠে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীর কালে নতুন গড়ে ওঠা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কেন্দ্র হিসেবে এরা কাজ করেছে। তাই সমাজতাত্ত্বিকরা ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এই সব রাষ্ট্রকে "মেট্রোপলিটন স্টেট" বলে অভিহিত করেন।

৫. হিটলারের (১৯৩২-৪৫) মতাদর্শে অনুপ্রাণিত, জার্মানিতে ন্যাশানল স্যোশালিস্ট পার্টির সদস্য। এদের জীবন বিরোধী মারাত্মক আদর্শের একটি হল এককেটা গোটা জাতিকে (তার শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সমেত) নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কেননা, নাৎসীরা মনে করত ঐ জাতিগুলি "অ-বিশুদ্ধ।" পঞ্চাশ লাখ ইহুদি হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে দগ্‌দগে ঘা-এর মতো স্মৃতি হয়ে আছে।

৬. মুক্তিকামী বিপ্লবী চিন্তা চেতনা ও কাজের একটি ধারা সিন্ডিকালিজম্ গড়ে উঠেছিল ইউরোপে, বড় বড় শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে। একে বলা হত শ্রমিকদের সিন্ডিকেট। সিন্ডিকালিস্টরা মনে

ছিল, যার সদস্য সংখ্যা ছিলো দেড়লক্ষ, ওই ইউনিয়নের শক্তিশালী কর্মী বাহিনীও ছিল যাদের হাতিয়ার ছিলো হিংসা বিরোধিতা। আর ছিলো গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়ার পরম্পরা, নাম করতেই হয় লিও টলস্টয়ের।

অবশ্য এই সমস্ত প্রসঙ্গ কোন মডেলের আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি, স্বাভাবিক ভাবেই এইসব আন্দোলন বা ব্যক্তিত্বরা সবাই রক্তমাংসের মানুষ তাদের যে ভুলচুক হয়, তা সমেত-ই উঠে এসেছিলো। তাদেরও "অন্য-দিক" ছিলো— 'ক্ষমতার', 'দমনের' — "অন্যদের" উপরে। কিন্তু চর্চা হয়েছিলো ইতিহাস ধরে বা গণ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ধরে যা থেকে শেখা যায়। হ্যাঁ এই সময় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। শিখেছি হাতে কলমে নানান দেশ থেকে, কেননা এক আর্ন্তজাতিক সংগঠন বা মহাসংঘ আমরা দেখেছি। এমনকি উনিশশো একুশ সাল থেকে হিংসা বিরোধী বিপ্লবীদের এক শক্তিশালী বাহিনী আমাদের সামনে ছিলো। পত্রিকার প্রথম বছরগুলিতে ওয়ার রেজিস্টার ইন্টারন্যাশনালের [৭] আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং তাদের সাথে কাছাকাছি কাজকর্মের ফলে পশ্চিম জার্মানিতে হিংসা বিরোধী অ্যানার্কিস্টরা লাভবান হয়।

১৯৭৪ সালে জার্মানিতে ছাত্র আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে আসা কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলো চেষ্টা করেছিলো শহরের শিল্প শ্রমিকদের বিপ্লবী ধারায় সংগঠিত করতে, যাতে করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছুঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টায় শ্রমিকরা নিশ্চিতভাবে উদাসীন ছিলো।

এই সময় রাষ্ট্র নতুন "শক্তিনীতি" ঘোষণা করল। কারণ ছিলো ১৯৭৩-এর তথাকথিত তেল সঙ্কট (আয়েল ক্রাইসিস)। এইভাবেই এল নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার। সরকার ঘোষণা করল আমাদের জার্মানির বুকে দুশোরও বেশি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা উচিত। যদিও শাসক শ্রেণী প্রতিশ্রুতি দিল নতুন ধরনের এই শক্তি উৎপাদন করা হবে, একশো ভাগ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে এক দ্বিচারিতা ছিল। উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তদের থাকার জায়গা শহরকে বাদ দিয়ে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে বেছে নেওয়া হল। হঠাৎ করে ওই এলাকাগুলির কৃষক এবং গ্রামের মানুষ প্রতিবাদে উঠে দাঁড়াল। ১৯৭৪ - ৭৫ সালে তখনকার পশ্চিম জার্মানির দক্ষিণ পশ্চিমে মুক্তিকামী গোষ্ঠীগুলো কৃষকদের সাথে একত্রে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত একটা এলাকা দখল করে নিল। উইহল গ্রাম

---

করত শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ও বিকাশ শ্রমিক শ্রেণী নিজেই করবে। শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধি নয়, জীবনের সব দিকে বিপ্লবী পরিবর্তন চাইত এরা। ধ্যান ধারণার নানান ব্যাপারে অ্যানার্কিজ চিন্তা সিন্ডিকালিজম্ গ্রহণ করেছিল। এই থেকে অ্যানার্কো-সিন্ডিকালিজম্ কথাটি এসেছে। ফ্রান্সে ও স্পেনের বিপ্লবী ইতিহাসে এদের উল্লেখ আছে।

৭. একসময়ে এই সংগঠনের (স্থাপিত—১৯২১ সাল) সদস্য ছিলেন গান্ধিজী, এবং বার্ট্রান্ড রাসেলের মত ব্যক্তিরা। সেই সময়ে মানুষের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এই সংগঠন এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ছিল। কিন্তু ২০০০ সালে স্বল্প পরিচয়ের সুবাদে অনুবাদকদের মনে হল এই সংগঠন বহুলাংশে তার ধার হারিয়েছে। ফান্ড নির্ভর আরেকটি এন.জি.ও. ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

দখল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিল। এটা জার্মানিতে ইকোলজি আন্দোলনেরও [৮] শুরু।

হ্যাঁ এটা ছিল এক ইকোলজিরও আন্দোলন। কারণ যদি আমরা আধুনিক প্রযুক্তির একধরনের শক্তিকে বতিল করে দিই তবে তা শুধুমাত্র 'শক্তির' প্রশ্নই থাকে না। এটা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র সমাজের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। হয়, প্রকৃতি ও অন্য দেশকে শোষণ করে ও নষ্ট করে আমাদের হয়ে উঠতে হবে শিল্পনির্ভর পুঁজিবাদী। নয়তো, আমাদের হতে হবে সমাজতান্ত্রিক ইকোলজিবাদী। আমাদের চোখে থাকবে এক নতুন সমাজের বিকেন্দ্রীভূত রূপ। উৎপাদনের উপায় ও জীবন চাহিদা আমরা কাটছাট করবো প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে। নতুন আন্দোলন শুধুমাত্র পুঁজি বাদী শিল্পনির্ভর উৎপাদনকে ভবিষ্যতের জন্য বাতিল করে দিচ্ছে না তা বাতিল করছে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের শিল্প নির্ভর উৎপাদনকেও, যেমন ছিল পূর্ব ইউরোপে, রাশিয়াতে ..........। আক্ষরিক অর্থেই একটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে সমাজের নিজের জিনিস করে তোলা যায় না। নিউক্লিয়ার বিদ্যাৎকেন্দ্র মারাত্মক বিপজ্জনক, তা সে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের হোক বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, চের্নোবিল তা প্রমাণ করেছে। আমাদের অনুসন্ধান ছিল সম্পূর্ণ এক নতুন সমাজের জন্য, বিকেন্দ্রীভূত ইকোলজিভিত্তিক, এবং তার রসদ খুঁজে নেবে প্রকৃতির থেকে অর্থাৎ সূর্য, জল বা বাতাস থেকে। যে সমাজ নিজেরই চারপাশের এলাকা থেকে উৎপাদন করবে, কোন তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশের শোষণ নয়।

**আন্দোলন বড় হয়ে উঠল**

নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত স্থানগুলি দখল করল এরকম সচেতন মানুষের সংখ্যা সময় সময় লাখের অঙ্কও ছাড়িয়ে গেল। পশ্চিম জার্মানি পুলিশ ও বিশেষ বাহিনী আন্দোলনকারীদের নিষ্ঠুরভাবে পেটানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্র হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড় শত্রু। অ্যানার্কিস্ট মতবাদের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া আন্দোলনের মধ্যে এটা হল সাধারণ ভিত্তিভূমি। আন্দোলন কখনোই সামগ্রিকভাবে অ্যানার্কিস্টও ছিল না আবার পুরোপুরি অহিংসও ছিল না। কিন্তু হিংসা-বিরোধী অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলো থেকে অনেক গণ উদ্যোগ শুরু হয়েছিলো। তা সে নির্মাণ স্থান দখল করাই হোক বা '৮০ সালের ওয়েন্ডল্যান্ড এলাকায় মুক্ত সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করাই হোক। ওই এলাকায় অংশগ্রহণকারীরা এক মাসের বেশি সময় এক ধরনের সমানতাভিত্তিক সমাজ

---

৮. সত্তরের দশকের শুরু থেকে পরিবেশ দূষণের নানান দিক দেশে দেশে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই নিয়ে নানান ধরনের আন্দোলন জন্ম নিচ্ছিল। যে কথাটা এই আন্দোলনের দুনিয়ার মধ্যে নতুন এক মাত্রা যোগ করছিল, সেটি হল "ইকোলজি"। প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতের সব কিছুই নানান সুতোয় বোনা এক জাল মাত্র। আমরা যদি এক জায়গাকে ধ্বংস করি তাহলে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জালের সব জায়গাকে মারাত্মক আঘাত করা হবে। খণ্ডিত কিছু মানুষের সুবিধার জন্য প্রযুক্তিগত তথাকথিত উন্নতি এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক শুদ্ধ এই ইকোলজিকে ক্রমাগত আঘাত করছে। ইকোলজির ভারসাম্য আজ এক পল্কা সুতোর উপর দাঁড়িয়েছে। যদি আমরা আমাদের অগ্রাধিকার না বদলাই তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক অন্ধকার ভবিষ্যত।

জীবন বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলো। এরপর পুলিশ তাদের তাড়িয়ে দিল। একই ঘটনা চোখে পড়ে ওয়াকারস্‌ডফ্ কারখানার বর্জ্য থেকে নিউক্লিয়ার জ্বালানি তৈরি করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সময়, অথবা নব্বই দশকে সমস্ত জার্মানি জুড়ে নিউক্লিয়ার বর্জ্য পরিবহণ বন্ধ করে দেবার যে প্রয়াস চলছিল সেই সময়ে।

সত্তরের শেষ অবধি টিকে থাকা কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও পার্টিগুলো শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল, যাতে তারা ইকোলজি আন্দোলনকে ব্যবহার করতে পারে। কেননা তাঁরা যেখানে খুঁজছিলো সেখানে মানুষ ছিল না। জনগন ছিলো আন্দোলনের মধ্যে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আগ্রহ কখনো কখনো পরিষ্কারভাবে ব্যবহার-বাদী দেখাচ্ছিল। কৃষকদের তারা দেখছিলো এক কারখানা নির্ভর দেশের সমস্ত জনগণের মাত্র দশ শতাংশ হিসাবে এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসাবে। কিন্তু কৃষকরা সমর্থন পাচ্ছিল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশের কাছ থেকে, সাহায্য পাচ্ছিল হিপি [৯] যুব আন্দোলন এবং অজস্র নাগরিক উদ্যোগ থেকে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় আশি ও নব্বই দশকের আন্দোলনের উপর অ্যানার্কিস্ট প্রভাব বেশ ভালই ছিল। অথচ কমিউনিস্ট গোষ্ঠী ও দলগুলো আশির গোড়ার দিক থেকে টুকরো টুকরো হয়ে প্রাণ বিলীন হয়ে গেল। তাদের নেতারা অনেকেই ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিল। এবং গ্রীন পার্টির মধ্য দিয়ে সমাজের উপর তলার হোমরা-চোমরা হয়ে উঠল। এদের কেউ কেউ হয়ে উঠল সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যেমন, জার্মানির পরিবেশ মন্ত্রী ট্রিটিন্— প্রাক্তন মাওবাদী। বিদেশ মন্ত্রী ফিশার— একজন প্রাক্তন মার্ক্সবাদী। অথবা গ্রীন পার্টি-প্রধান বুটি অফার একজন প্রাক্তন মাওবাদী। যখন ১৯৮০ সালে গ্রীন পার্টি তৈরি হল তখন উঠে যাওয়া কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোর নেতারা ওই পার্টিতে যোগ দিল। কিন্তু অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলো সরাসরি কাজকর্মের উপর জোর দিল। তারা বলল, 'দল গড়তে চাই না' নাকচ করল পার্লামেন্টভিত্তিক রাজনীতিকে।

## হিংসা বিরোধিতার নতুন মাত্রা অ্যানার্কিস্ট পথ থেকে সবুজের পথে

সত্তরের দশকে শেষের দিকে ইকোলজিবাদী এবং বিকল্প বিকাশের জন্য আন্দোলন অনেকগুলি যৌথ উদ্যোগ শুরু করেছিল। এদের বেশিরভাগ ছিল ক্ষুদ্র স্তরে কুটির শিল্প এবং প্রাকৃতিক জৈব কৃষিকাজ। হিংসা বিরোধী অ্যানার্কিস্ট মতবাদের বিপ্লবী ধারণার মধ্যে দুটো ধারণা ছিল। সে দুটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল গঠনমূলক প্রোগ্রাম অর্থাৎ বিপ্লবীরা যৌথ ও যথাসম্ভব

---

৯. ষাটের দশকে যখন দুনিয়া জুড়ে আন্দোলনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে বিকল্প সংস্কৃতি ভিত্তিক। যুদ্ধ বিরোধী হিপি আন্দোলন বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। বিশেষত, আমেরিকা ও ইউরোপে। দুঃখের কথা এই হিপি আন্দোলনেব 'হিপি' বলতে, যে ছবি আমাদের দেশে এসে ছিল তাতে হিপি আন্দোলনের আসল বিষয়টি ঢাকা পড়ে গেছিল। লোকের ধারণা এই ছিল যে হিপি মানে, বড় বড় চুল অপরিস্কার বস্ত্র, এলোমেলো জীবন । হিপি আন্দোলনের গঠন মূলক দিকগুলি যেমন ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে বিকল্প জীবনযাপনের সচেতন প্রয়াস, সৃজনশীল সংস্কৃতি হাতিয়ার করে (যেমন- ফ্লাওয়ার পাওয়ার) মুক্ত সমাজ বানানোর চেষ্টা— এসবই অনেক চর্চার জন্ম দিতে পারে।

মুক্ত জীবনযাপনের চেষ্টা করবে। এই কাজটা হবে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে। তাদের স্বপ্ন ও কল্পনাভিত্তিক চিন্তা তারা প্রয়োগ করবে ততটুকুই যতটুকু সমাজ তাদের ছাড় দেবে। অন্য আরেকটা অংশ হল, এক কথায় বলতে গেলে অহিংস, জঙ্গি প্রতিরোধ — যার লক্ষ্য হবে হিংসা বিরোধী বিপ্লব। পার্লামেন্ট সর্বস্ব শোধনবাদী এবং সংস্কারপন্থী রাজনীতি বাতিল করতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে অনেক লোক আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসে জার্মানিতে গ্রীন পার্টি তৈরি করল। গ্রাসরুট রেভোলিউশন পত্রিকা ও অন্য অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলো 'দল' গড়ে তোলার বিরোধিতা করল। কারণ কাজ ছিল একটাই আক্রান্ত জনগণকে সরাসরি সংগঠিত করা। অথচ প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির বাঁকা পথ বেছে নেওয়া হল, যা কোনদিন বিপ্লবের লক্ষ্যে পোঁছতে পারবে না।

যেহেতু 'হিংসাবিরোধী সরাসরি অ্যাকশন' আন্দোলনের এক জনপ্রিয় শক্তিশালী দিক সেইজন্য গ্রীন পার্টি এই ইস্যুটিকে তাদের মূল স্তম্ভগুলির একটি করে নিল। কিন্তু অ্যানার্কিস্ট পরম্পরার মধ্যে "হিংসা বিরোধিতা" লড়াইয়ের এক উপায় ছিল। এটা ব্যবহার করা হত এক নতুন প্রতিরোধ বা সামাজিক অর্থনৈতিক লড়াই এর অর্থে। এই সংগ্রামের সামাজিক লক্ষ্য ছিল এক অ্যানার্কিস্ট সমাজ। যেহেতু স্বপ্ন দেখা হত হিংসা বিরোধিতার, তা অর্জন করতে সংগ্রাম হবে উচিত অর্থে হিংসা বিরোধী। একে বলা হত উপায় আর লক্ষ্যের আন্তঃসম্পর্ক। কিন্তু এখন গ্রীনপার্টি অন্য জিনিস করল। তারা শুধু হিংসা বিরোধিতা বারবার বিচ্ছিন্নভাবে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে হিংসা বিরোধিতা এখনে অনুপস্থিত। সুতরাং কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রীন রাজনীতি জনগণের সামনে চিহ্নিত হয়ে উঠলো শুধুমাত্র পার্লামেন্ট আলোচনার কচকচির মধ্যে। প্রাসঙ্গিক হল— পার্লামেন্ট যে একটি হিংসার জায়গা হিংসা বিরোধী অ্যানার্কিস্টরা এই সমালোচনা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করেছিল। পার্লামেন্টেই পুলিশ মিলিটারির জন্য টাকা পয়সার সংস্থান করা হয়, পাস করিয়ে নেওয়া হয় হিংস্র অর্থনীতি ও রাজনীতির অনেক কিছুই। গ্রীন পার্টির সত্তা হিংসা বিরোধিতার সম্পূর্ণ এক অন্য ধারণার পথে চলে গেল। হিংসা বিরোধিতা আর নতুন সমাজ গড়ার বিপ্লবী উপায় থাকলো না, তা হয়ে উঠলো আজকের পুঁজিবাদী কাঠামোর এক সেবাদাস। এই নীতির সবচেয়ে মারাত্মক রূপ বেরিয়ে এল ১৯৯৯ সালে। গ্রীন পার্টির সরকার যুগোস্লাভিয়ার উপর ন্যাটো [১০] কর্তৃক বোমাবর্ষণে অংশ নিল।

কিন্তু জার্মানি অ্যানার্কিস্টরা এবং *গ্রাসরুট রেভোলিউশন* পত্রিকা সহজে গ্রীন পার্টিকে

---

১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৎকালীন বিশ্বতে দুটি মহাজোটের সৃষ্টি হয়। একটা ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর জোট, তাকে বলা হত "ওয়ার চুক্তি"। এই জোটের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য এবং বিশ্বে নিজের একাধিপত্য কায়েম করতে আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি সামরিক জোট তৈরী করে। একে বলা হত 'নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগানাইজেশন' সংক্ষেপে ন্যাটো। মজার কথা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা 'ওয়ারশ্ চুক্তি' ভেঙে পড়ার পরও ন্যাটো তার শর্তাদি চালিয়ে যাচ্ছে।

ছেড়ে দেয়নি। তারা সরাসরি অ্যাকশনের নতুন নতুন রূপ খুঁজে বার করল। বিশেষ করে চের্নোবিলের পরে। তখন গঠনমূলক যৌথ কাজকর্ম একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ল। সেটা ছিল ১৯৮৬ ও তারপর। যখন চের্নোবিলের মেঘ সবকিছু তেজস্ক্রিয় দূষণে ঢেকে দিল, তখন প্রশ্ন উঠল — যৌথ উৎপাদন-ভিত্তিক জৈব কৃষিতে কি লাভ? তখন ১৯৮৬-র গ্রীষ্মের শুরু। চের্নোবিলের মেঘ ইউরোপের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সময়টা এমন ছিল, জর্জ অরওয়েলের উপন্যাসে তার তুলণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার টেলিভিশন ও রেডিওতে বারবার ঘোষণা করছিল যেন কেউ বাড়ির বাইরে না যায়। কেননা বৃষ্টির সাথে তেজস্ক্রিয় কণিকা ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে শিশুরা যেন বাইরে না যায়। ভিজে ঘাসের উপর বসতে মানা। এমন আরো কত কি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেল। আক্ষরিক অর্থে মানুষের চলাফেরা আটকা রইল। চের্নোবিলের পরে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে জনপ্রিয়তা তা এই সবকিছু মিলেই সম্ভব হয়েছিল। এই সময় এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে গঠনমূলক উদ্যোগগুলো তাদের সীমারেখাতে পৌঁছেছে। প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। যেহেতু সামাজিক ক্রোধ বেশি ছিল এবং ইকোলজি আন্দোলনের মধ্যে সহিংস অ্যাকশন গোষ্ঠীগুলি (তথাকথিত অটোনোমাস গোষ্ঠীগুলি) ছিল তাই হাওয়া গরম হয়ে উঠল। অটোনোমাস গোষ্ঠীগুলি হিংসা নির্ভর প্রতিরোধের বক্তব্য ছড়াচ্ছিল। এবং এইসময় আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছিল। হিংসা বিরোধীরা এই অবস্থাকে আত্মহত্যার সামিল মনে করছিল। তাদের চিন্তায় উঠে আসছিল 'Red Army Faction'-এর পরাজিত সংগ্রাম। কিছু কিছু হিংসা বিরোধী অ্যাকশন গোষ্ঠী বিকল্প হিসাবে শুরু করল অন্তর্ঘাতমূলক আন্দোলনের কাজ। গোটা নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটা তারা খুঁজে বের করল। এটা ছিল সরবরাহ ব্যবস্থার বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে যাবার স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলো বড় বড় কোম্পানির সম্পত্তি ছিল, যারা নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবসাও প্রচার করতো। তাই সংঘবদ্ধ হয়ে কর্মীরা কয়েকটা করাৎ নিয়ে রাত্রি বেলা বের হতো যাতে স্তম্ভগুলো কেটে ফেলা যায়। নিউক্লিয়ার কোম্পানিগুলোর বেশ টাকা পয়সার ক্ষতি হচ্ছিল। হিংসা বিরোধী কর্মীদের চোখে এই কাজ মোটেই হিংস্র বলে মনে হচ্ছিল না। কেননা নিষ্প্রাণ স্তম্ভগুলো তো আঘাত অনুভব করতে পারে না, এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে শুরু সেই যুগের, যখন নিউক্লিয়ার শক্তি ভেঙে পড়তে চলেছে। এ এক বিপ্লবী সূচক ছিল মাত্র। কয়েকবছর পরে এই রকম কাজকর্মের ফলে অন্তত একটি অ্যাটমিক পুনঃউৎপাদন (নিউক্লিয়ার বর্জ্য থেকে জ্বালানি পুনঃউৎপাদন) কারখানা তৈরি হবার আগেই বাতিল করা গেছিল। স্থানটা হল ওয়াকারস্‌ডর্ফ, দক্ষিণ জার্মানি।

## শান্তি আন্দোলন থেকে শুরু করে পূর্ব জার্মান সরকারের পতন অবধি

আশির দশকে পশ্চিম জার্মানির বুকে এক বিরাট শান্তি আন্দোলন হয়েছিল। এবং বহু ক্ষেত্রে শান্তি আন্দোলনের কর্মীদের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে একসাথে গণ কাজকর্ম করতে হয়েছিল। শান্তি আন্দোলনের গোড়া থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা একসাথে চালাতে হবে। হাতে হাত মিলিয়ে অস্ত্র ও

বিদ্যুৎ বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠল সমার্থক। তাকে বলা হত ECO-PAX (ইকো-শান্তি)।

১৯৮৯ সালে আরেকটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। পূর্ব জার্মানি এবং চেকোস্লাভিকিয়ার সমরবাদী রাষ্ট্রীয় কমিউনিজম ভেঙে পড়ল। কিন্তু গণ আন্দোলন ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আন্দোলন দেখিয়ে দিল, কি করে একটাও গুলি না ছুড়েও একটা সমরবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা উল্টে দেওয়া যায়। ভবিষ্যত নির্ণায়ক বিক্ষোভটি হয়েছিল লিপ্‌জিক শহরে। তারিখ ছিল ৭ অক্টোবর, ১৯৮৯। পূর্ব জার্মানির সৈন্যদলের কাছে আদেশ ছিল ভিড়ের ওপরে গুলি চালাবার। কয়েক মাস আগেই চীনা রাষ্ট্রযন্ত্র তিয়েন-আন্-মেনে এই কাণ্ড করেছিল। কিন্তু লিপ্‌জিক উপস্থিত সেনা অফিসারেরা এই আদেশ মানেনি। সুতরাং গোটা ব্যবস্থাটার এই ভাবে মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠল। আনুষ্ঠানিকভাবে এ হল এক অহিংস বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লবের অন্তর্বস্তু এটাতে অনুপস্থিত ছিল। প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিতে ইকোলজিবাদী, 'গভর্মেন্টের আওতার বাইরের' সমাজতান্ত্রিক এবং শান্তিবাদী গোষ্ঠীগুলো খুব ছোট এবং খুবই সংখ্যালঘু ছিল। যদিও তারা পশ্চিম জার্মানির গোষ্ঠীগুলির সমর্থন পেত। যখন মানুষ দেখল, রাস্তায় নামলে ভয় পাবার কিছু নেই তখন হাজারে হাজারে তারা বেরিয়ে পড়ল। দুঃখের বিষয়, তাদের চোখের সামনে ছিল ভূয়ো স্বপ্ন। যেন আমেরিকার মত এক রাষ্ট্র নতুন করে গড়লে তাদের প্রত্যেকেই মালিক হয়ে উঠবে গাড়ি, বাড়ি, রঙিন টেলিভিশন--- আসল ভোগবাদী উপকরণের। পুনর্মিলনের কয়েক মাসের মধ্যেই এক নতুন জাতীয়তাবাদ জার্মানির পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ল।

### নতুন জাতিদম্ভ থেকে নতুন প্রতিরোধ লড়াই চলছে

দুই জার্মানি এক হয়ে গেল। উঠে এল এক নতুন দেশপ্রেম।

এই ঘটনায় জার্মানির সামাজিক আন্দোলনগুলি মারাত্মক ধাক্কা খেল, আন্দোলন যে পিছু হটে গেল তার দুটি মাত্রা ছিল। একীকরণের পর জার্মানির সরকারি নীতি হল নিজেকে আবার এক বিশ্বশক্তি হিসাবে দেখা। তাই গোটা নব্বই এর দশক ধরে সরকার চেষ্টা করল জঙ্গী সমরবাহিনী গঠন করতে, যা জার্মানিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থ নিশ্চিত করবে। আমেরিকা নির্ভর বহুজাতিক সামরিক জোট ন্যাটো এই কাজ তখনও পর্যন্ত করে আসছিল। জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিকাশের এই অধ্যায় শেষ হল ১৯৯৯ সালে। সেই সময় যুগোশ্লাভিয়াতে বোমা বর্ষণে জার্মান মিলিটারি পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। জার্মানিতে সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের কাছে এই ঘটনা এক নিদারুণ আঘাত। উল্লেখযোগ্য যে বিংশ শতাব্দীতে জার্মানি যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে দুবার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। নতুন ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ মনে করিয়েছিল পুরোনো নাৎসী যুগের কথা। যদিও আমাদের সময় কাজটা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ছদ্মবেশ ধরেছিল।

আন্দোলনের উপর দ্বিতীয় আঘাত হল ক্রমবর্ধমান দেশপ্রেম ও জাতিদম্ভ। এই মনোভাবকেই তাতিয়ে তুললো রাজনৈতিক দলগুলো, যখন তারা ১৯৯৩ সালে অন্য দেশে রাজনৈতিক পীড়ন থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের "আশ্রয়ের অধিকার" আইন বাতিল করেছিল। ১৯৯১ থেকে ৯৫ এই সময় গোটা জার্মানি জুড়েই শরণার্থীদের শিবিরগুলো আক্রান্ত হচ্ছিল। এই

সময় প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলি যারা তখন অবধি বেঁচে ছিল তারা সক্রিয়ভাবে আশ্রয় প্রার্থীদের সমর্থনে এগিয়ে এল। জার্মানিতে সচেতন মানুষদের আরো একটি কাজ হল—যে নতুন তরুণ নাৎসী গোষ্ঠীগুলি ছড়িয়ে পড়ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এই সময় অনেক গ্রাসরুট গোষ্ঠীগুলো জরুরি ভিত্তিতে এক টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলল। প্রত্যেক শহরে বিভিন্ন ধারার মুক্তিকামী অনেক গোষ্ঠী ছিল। তাদের নিয়ে একটি টেলিফোনের তালিকা তৈরি করা হল, এবং পাকাপাকিভাবে একটি টেলিফোন পরিসেবা গড়ে তোলা হল। যখন কোন কোন সময় এই টেলিফোনের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু প্রগতিশীল লোক জড়ো করা সম্ভব হতো। এইখানে আমি বিশদে একটি উদাহরণ দিতে চাই, যে ঘটনা নাৎসীদের বিরুদ্ধে হিংসা বিরোধী অ্যাকশন হিসাবে ঘটেছিল।

একজন নাৎসী মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল একটি ইহুদি পরিবারকে। তারা একই বাড়িতে থাকতো। নাৎসীটি টেলিফোন, ফ্যাক্স মেশিন এবং অন্যান্য জিনিসের উপর এক বাণিজ্য পত্রিকা নিয়ে ব্যবসা করত। এই পত্রিকার মালিক ছিল স্থানীয় নাৎসী দলের প্রধান। সে কাছেই থাকা এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে একসাথে পার্টির হয়ে কাজ করত। নাৎসীরা ইহুদি পরিবারটিকে শাসালো যে তাদের ফ্ল্যাটেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে। তখন এই জরুরি টেলিফোন ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশ কটি গোষ্ঠীকে সাথে সাথে খবর দেওয়া হল। যখন বিপদ মারাত্মক ছিল ওই পরিবারের ফ্ল্যাটে ছয় সপ্তাহ ধরে বন্ধুরা প্রহরায় রাত কাটিয়েছিল। ইহুদি পরিবারটিকে সুরক্ষিত রাখতে সবসময় দুজন লোক রাতে জেগে থাকতো। এই সময় অন্যরা ওই নাৎসীদের বিষয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল। একদিন দিনের আলোয় কুড়ি জন কর্মী নাৎসীটির পত্রিকা অফিসে গেল এবং মালিককে সোজাসুজি বলল, ওই পরিবারটিকে স্বাধীনভাবে এবং শান্তিতে থাকতে দিতে। তারা যে ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিচ্ছে না তা বোঝাতে কর্মীরা পত্রিকা মেশিনে একটি বাদামী রঙের তরল ঢেলে দিল। ছাপাখানার যন্ত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেল। পরের দিন এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ছাপাখানার মালিকের বন্ধু। তার আশেপাশের বাড়িতে একটি লিফলেট ছড়িয়ে দেওয়া হল। তাতে বলা হল, তাদের ওই প্রতিবেশী হচ্ছে একজন নাৎসী, যার উপর নজর রাখতে হবে এবং তারা এও বলল যে, তারা এই খবর চায় যে কারা তার বাড়িতে আসে যায়। এই ব্যাপারে সাক্ষীও দরকার আছে। এই অ্যাক্শনের কিছু দিন পরে ওই নাৎসীর পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল এবং ইহুদি পরিবারটির এর পরে কোনো শাসানি ছাড়াই দিন কাটাতে লাগল।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, ৯০-এর দশকে জার্মান জনগণের মধ্যে জাতিদম্ভ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আগেকার সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে যে প্রগতিবাদী গোষ্ঠীগুলি ছিল ক্রমেই তারা কর্মী হারাচ্ছে। অথচ নাৎসী গোষ্ঠীগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছে। নব্বইয়ের শুরুতে আশ্রয় প্রার্থীদের উপরে বিরাট সংখ্যায় যে আক্রমণগুলো হচ্ছিল তা অল্পমাত্রায় কমেছে। কিন্তু জাতি দম্ভের মাত্রা জার্মানিতে এখনো খুব উঁচুতে, আর বিদেশীদের উপর হামলাও লাগাতার হচ্ছে।

নব্বই এর দশকে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনও জার্মানির বুকে কমে এসেছে। আগের যুগের সেই বিশাল গণ আন্দোলনও আর নেই। কিন্তু কিছু মানুষ সরাসরি কাজকর্ম চলিয়ে যাচ্ছেন। আবার খুঁজে বার করতে হচ্ছে। পারমাণবিক শিল্পের সবচেয়ে দুর্বল অংশটি কি? নির্ণায়ক দিক হল নিউক্লিয়ার বর্জ্য পদার্থের পরিবহণ। এই নিউক্লিয়ার আবর্জনা

ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। তাই তাকে অন্য জায়গায় লরি বা ট্রেনে করে নিয়ে যেতে হয়। নব্বই এর দশকে খুব ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি ওই পরিবহণকে আটকে দিতে সমর্থ হয়েছিল, কখনো রাস্তায় বা কখনো ট্রেন লাইনে এবং ১৯৯৭ সালে এক বিরাট হিংসাবিরোধী সরাসরি গণ-অ্যাকশন হয়েছিল। মানুষ নিউক্লিয়ার বর্জ্য পরিবহণ রুখে দিয়েছিল। এটা হয়েছিল 'ওয়েন্ডল্যান্ড' অঞ্চলে একটি নিউক্লিয়ার আস্তাকুড়ে।

এরকম একটি প্রতিবাদে নয় হাজার মানুষ অংশ নেয়। ১৯৯৮ সাল থেকে নিউক্লিয়ার পদার্থ পরিবহণ স্তব্ধ হয়ে আছে।

একদিন গ্রীন পার্টি তৈরি হয়েছিল এই আওয়াজ নিয়ে "এমনই সবরকম নিউক্লিয়ার উৎপাদন বন্ধ করতে হবে।" আর আজ গ্রীন পার্টির হাত রয়েছে নতুন আইন বানাতে। আমরা দেখতে চাই এই আইন আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করতে পারবে কিনা। আমরা এটাও আশা করি সরকার নিউক্লিয়ার পরিবহণকে যখন ফাঁকফোকর দিয়ে শুরু করবে তার সামনে দাঁড়াবে এক বিরাট গণ আন্দোলন। আর তখনও চলবে নীচের তলার বিপ্লব।

## অনুবাদকের কথা

১৯৯৯ সালের শেষ দিকে আমাদের বন্ধুদের সাথে আলাপ হয়েছিল এক জার্মানি যুবকের, এই কলকাতায়। শীত সন্ধ্যার প্রাথমিক এক আলাপে সে নিজের রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছিল এই রকম—হিংসা বিরোধী (non-violent) সরাসরি অ্যাকশন-ভিত্তিক (Direct Action) অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীর কর্মী হিসাবে। হ্যাঁ, অ্যানার্কিস্ট! কলকাতার জার্মান ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালিকা ওই যুবকের পরিচয় দিয়েছিলেন এইভাবে, 'ইনি হলেন আমাদের শতাব্দীর শেষ অ্যানার্কিস্ট'। আসলে 'অ্যানার্কিস্ট' শব্দটি আমাদের মনের মধ্যে যে পরিচিতি বয়ে আনে, তা হল— অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমানবিক হিংসা। কারণে অকারণে বোমা ছোঁড়া তাদের একমাত্র কাজ। আধুনিক ইতিহাসে একটি শব্দ এত বেশি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যার তুলনা বেশি নেই। আসলে যুগ যুগ ধরে মানুষ স্বপ্ন দেখেছে কর্তৃত্ব ছাড়া মুক্ত সমাজ— যার ভিত্তি হল সাম্য। কোন একটি সঠিক মতাদর্শ নয়, অনেক রংবেরঙের কল্পনা ও কাজ এসে মিলেছে অ্যানার্কিজমের মহা মেলাতে। মুক্ত সমাজ তৈরির জন্য অ্যানার্কিস্টরা পৃথিবীর কোণে কোণে ঘাম ঝরিয়েছে। সবরকমের রাষ্ট্র নিষ্ঠুরভাবে তাদের উপরে নিপীড়ন চালিয়েছে, হত্যা করেছে। আর সংবাদ মাধ্যম তাদের এঁকেছে রক্ত পিপাসু দানব হিসাবে। তবুও অ্যানার্কিজিমের পতাকা ষাটের দশক থেকে ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি এশিয়ার জাপানে মুক্তির যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়।

না, এখানে আমরা অ্যানার্কিজমের ভাল মন্দ ইতিহাস ঘাটতে বসিনি। একজন সাদামাটা অ্যানার্কিস্ট কর্মীর চেহারা যে আর পাঁচটা লোকের মতোই, সেটুকু বলতে চাইছি। আমাদের বন্ধুদের জন্য সাম্প্রতিক জার্মান আন্দোলনের এক টুকরো ইতিবৃত্ত মারিন পাঠিয়েছে।

মারিনের লেখাটি পড়তে পড়তে মনে হতে পারে যে অ্যানার্কিস্ট গোষ্ঠীগুলি কোন ভুল করতে পারে না। এটাও মনে হতে পারে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি বড়ই কৌশলবাদী ও সুবিধাবাদী। গ্রীন পার্টির সবটাই ক্রমাগত অধঃপতিত হয়ে যাচ্ছে ............।

আসলে স্বপ্নের আন্দোলন বাস্তবে হয় না। মুক্তিকামী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তৈরি হয় এক হতাশা-সন্দেহ এক চাপা টেনশন। কর্মীরা নিজের আদর্শ স্বপ্নকে একমাত্র সঠিক বলে আঁকড়ে ধরে। এই চশমা দিয়ে দেখলে অন্য গোষ্ঠী বা দলের ভেতরে আদর্শবাদ বনাম সুবিধাবাদ এই রকম অনেকগুলো দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে না। আমরা জানি যে গ্রীন পার্টি এমনকি কমিউনিস্ট গোষ্ঠীতে অনেক নারী পুরুষ ক্ষমতার রাস্তায় যেতে চায়নি। তাদের হৃদয় "মুক্ত সমাজ" গড়ার লক্ষ্যে আকুল হতো মারিনের মতনই। গ্রীন পার্টির মধ্যে বাস্তববাদী (Realos) বনাম মৌলিক পরিবর্তনবাদী (Fundist) বিবাদ তো এক বিরাট চেহারা নিয়েছিল। কেউ কেউ মন্ত্রী হল বটে — আবার অনেক কর্মীই মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখি আত্মহত্যায়।

লেখাটি পড়তে পড়তে এটাও মনে হতে পারে মারিন দুটো বিশেষণের উপরে একটু জোর দিয়েছে। একটি হল, "হিংসা বিরোধিতা" হয় পুঁজিবাদী সংস্কৃতি গল্প, উপন্যাস সংবাদপত্রে যে কুৎসিত চেহারা আঁকা হয় তার থেকে নিজেদের ভিন্নতার সরল সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য।

মারিন বলেছিল, ওদের বন্ধুদের মধ্যে 'অহিংসা' এক বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। মিলিটারির সাথে মিলিটারি উপায়ে হত্যা নির্ভর লড়াই যে একটা অন্ধগলি মাত্র সে কথা ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। ও বলছিলো গান্ধীর কথা। ওরা গান্ধীকে অ্যানার্কিস্ট মনে করে। এখানে আমাদের একটু অস্বস্তিতে পড়তে হয়। ব্রিটিশ শক্তির সাথে ক্ষমতা নিয়ে দড়ি টানাটানি, কংগ্রেস পার্টির শোষণ-নির্ভর লোভী রাজনীতির খোলায় আমরা যে প্রধান পুরুষ হিসাবে তাঁর নাম বার বার উঠে আসতে দেখি। তিনি যে দরিদ্র জনগণের মাথার উপর দাঁড়ানো নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রের "পিতা"! কিন্তু '৪৭ সালে যখন নেতারা সরকারি পদে আসীন হবেন বলে লোভের স্বপ্নে মসগুল, তখন তিনি কোথায়? সে এক "অন্য" গান্ধীর কথা, গা বাঁচানো নয়, মানুষে মানুষে অন্ধ হানাহানির রণক্ষেত্রে ছুটে গেছেন তিনি। অনুভব করেছেন অমানবিক হিংসার তাপ। এ এক অন্য গান্ধী— স্বশাসিত গ্রামই তার স্বপ্নেমুক্ত পাকিস্তান-ভারতের ভবিষ্যতের ছবি। মানুষের আয়ত্তাধীন সরল টেকনোলজি মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবে। ভোগবাদ বিরোধী যে জীবন দর্শন তিনি নিজের জীবনের প্রয়োগ করেছেন এবং সমাজ বদলানোর হাতিয়ার হিসাবে যে কাজগুলিকে তিনি আদর্শ হিসাবে প্রচার করেছেন তার অনেক কিছুই আমাদের কাছে আবছায়ায় ঢাকা রয়েছে। হয়তো সর্বদায়ী। গান্ধীবাদী লোহিয়াবাদী—সমাজতন্ত্রী কর্মীদের চোখে তা অনেক স্পষ্ট। এ বিষয়ে অনেক চর্চার জন্ম দিতে পারে। মারিনের তোলা গান্ধীর কথাতে এ প্রসঙ্গ এড়ানো গেল না। মারিনের তোলা অনেক প্রশ্নই আমাদের বন্ধুদের কাছে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েছিল।

একদম ব্যক্তিগত স্তরে টাকা নির্ভর হয়ে সামাজিক কাজকর্ম তাদের আদর্শের সাথে একদম খাপ খায় না। আজকের টাকা নির্ভর NGO র যুগে বন্ধুদের এক সমাজের উপর নির্ভর করে অনেক দূর অবধি চলা যায়। এই সুর ধ্বনিত হচ্ছিল শ্রমিক মারিনের বলা কথার মধ্যে। এক ফোটো-শপে পেট ভরাতে দিনমজুরি করতে হয় তাকে।

ছোট ছোট উষ্ণ মুহূর্তগুলো বন্ধুদের স্মৃতি হিসাবে উপহার দিয়ে ফিরে গেছে। তার তোলা প্রশ্নগুলো এই উন্মত্ত আঁধারে আমাদের ভাবায়। দেশ হলে রাষ্ট্র হয়, রাষ্ট্র হলে বর্ডার হয়, "ওরা" আর "আমরা" হই। "ওদের" হাত থেকে বাঁচার জন্য সৈন্য লাগে তাদের হাতে অস্ত্র, অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ চলতে থাকে। এই আপাতঃ অসহায়তার বাইরে কি আমরা বেরোতে পারবো?



# সত্যকে মনে রেখে

উত্তান □ শর্মিলা □ দেবাশিষ

উত্তরপাড়া □ অরুণ চক্রবর্তী □ সুভাষ গাঙ্গুলি □ রবীন চক্রবর্তী

Reinhard □ সুমিত □ সন্দীপ □ শিবু

রবীন মজুমদার □ চৈত্রালী

এই প্রকাশনার কাজ হলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়—শুধুমাত্র বন্ধুদের ইচ্ছে ও তাগিদের ওপর নির্ভর করে। সময়াভাবে সকলের লেখা সংগ্রহ করা গেল না। তাই এই 'স্মৃতিচারণ' অংশটিতে রয়ে গেল অসম্পূর্ণতা এবং কিছু ভুল

সত্যর জন্ম ৭ জানুয়ারি ১৯৫৭। ছেলে বেলা থেকেই ও খুব টনসিলে কষ্ট পেতো। চোদ্দ বছর বয়সে ওর টনসিল অপারেশন হয়। ছোট বড় নানান সমস্যায় ও ছোটবেলা থেকেই ভুগতো। অর্শ এবং ফিশারের জন্য ওর অস্ত্রোপচার হয় ৩২ বছর বয়সে। সল্টলেকের রাস্তায় হঠাৎই বাসের নীচে পড়ে গেছিল সত্য ১৯৯৬-এর জুন মাসের কোন একদিন। বাসড্রাইভার কোনক্রমে ব্রেক কষায় সত্য সেদিন বেঁচে যায়। এর বেশ কিছুদিন পর সত্যর বুকের বাঁদিকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়ে যায়। সল্টলেকেই আনন্দলোক হাসপাতালে ওকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। কিছুদিন চিকিৎসা করার পর ও ছাড়া পায়। ওই বছরেই অক্টোবর মাসে সত্যর জীবনের সব থেকে খারাপ সময়ের পর্ব শুরু হয়ে গেলো। অসম্ভব ব্যথা বুকে, ঘাড়ে ও কাঁধে শুরু হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে সত্য পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে যেতে লাগল। শ্বাসকষ্ট—সিঁড়িতে উঠতে গেলে কষ্ট, এসব তো আগেই চলছিল এবং অবশেষে যা হলো— অত্যন্ত রোগা হয়ে গেলো সত্য। কিছুদিন একটু সমস্যাগুলো থিতিয়ে আসছিল কিন্তু আবার ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ সত্যর আবার প্রচণ্ড কাশি আর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। দুদিন ভুগে মানিকতলা ESI হাসপাতালে সত্যকে ভর্তি করা হলো। তখন আমরা কেন অনেক ডাক্তারও বুঝতে পারছিলেন না যে কোথায় আসলে সত্যর অসুখ এবং কী এর চিকিৎসা। প্রায় মাসখানেক কেটে গেলো রোগ নির্ধারণের সমস্যায়। অবশেষে সত্যর MRI করা হলো। MRI এবং Two Dimensional Echo এবং Dopler রোগী সত্য। আর ডাক্তারি স্টাডি করে ধরা পড়ল সত্যর আসল রোগ। মারফান সিনড্রোমের রোগী সত্য।

মারফান হচ্ছে জন্মগত একটি অসুখ যেটা জন্মের প্রায় চারদশক পরে ধরা পড়ে। এবং হৃদয়ে মহাধমনীর ভালভ্‌গত সমস্যা যখন হয়, জন্মের চল্লিশ বছর পরে তখনই সন্দেহ হয় রোগীর মারফানসের হতে পারে। এই রোগীরা সাধারণত লম্বা হয়, হাত ও পায়ের আঙুলগুলো লম্বাটে হয় যা সত্যর ছিলো। এদের মায়োপিয়া বা দৃষ্টিগত সমস্যা হয় যা সত্যরও ছিলো। আসলে, সংযোজক কলা বা দেহে Connective Tissue র Disorder থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। বলে নেওয়া দরকার যে মারফানস সিনড্রোমের রোগীদের যখন যা হবে তখন সেইভাবে তাকে Management করতে হবে। যাই হোক, সত্যর এওর্টিক ভালভ্‌ (aortic valve) এবং প্রক্সিমাল এওর্টা (Proximal) —এদুটোই অস্ত্রোপচার করে (artificial prosthetic valve) বসানো হলো। এটা একটা মেজর অপারেশন। মারফানসের (marfans syndrome) রোগীর ক্ষেত্রে এই অপারেশন আবার কেউ করতেও চায় না। অন্যভাবে বললে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলে হয়তো দু-একজন কার্ডিওথেরাসিক সার্জেন আছেন যারা এই অপারেশন করেন। সত্যর সব বন্ধুরা ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে খোঁজ নিতে শুরু করলো।

**পরের খবর : কলকাতাতেই B.M.Birla Heart Research হাসপাতালে ডা শ্রীরূপ**

চ্যাটার্জী এই অপারেশন করেন। শ্রীরূপ চ্যাটার্জীর খবরটা আমরা আমাদের পুনার বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। অপারেশন হয়েছিল ১৯৯৭ সালে ১২ মার্চ। যাই হোক, ধীরে ধীরে সত্য সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু যেহেতু artificial valve ছিল তাই ওকে এমন কিছু ওষুধ সারাদিন খেয়ে যেতে হবে যাতে ওর রক্তের ঘনত্ব একটু পাতলা থাকে। Anticoagulant Drug ওকে খেতে হতো। ফলে, ছোটখাট অন্য যে কোন অসুখে যেমন ধরা যাক পেট খারাপ, সর্দি বা জ্বরে ডাক্তারি পরামর্শে ওষুধ খেতে হতো। অবশ্যই সেই ধরণের ওষুধ যা ওর anticoagulant drug এর effect কে নষ্ট করবে না বা ক্ষতি করবে না— এটা সবসময় মাথায় রাখতে হতো। তর পরও রক্তের ঘনত্ব সব সময় monitor করতে হতো P.T. (Prothrombin time : এক ধরণের রক্ত পরীক্ষা) দেখে। এতে মনের ওপর এক দুশ্চিন্তা নেমে আসে এবং ক্রমেই তা chronic দাঁড়িয়ে যায়। এই সমস্ত ব্যাপারটা খেয়াল রাখা এবং তার সাথে সাবধানে থাকা যেমন কোথাও যেন চোট-আঘাত না পাওয়া, দাঁত থেকে যেন রক্ত না পড়ে, ইত্যাদি — যা একটু ভাবলেই ভয়াবহ মনে হয়। একজন সাধারণ মানুষ তার এই জীবনকে কি সুস্থ জীবন বলতে পারে? তবুও ডাক্তারি মতে অপারেশনে সত্য সুস্থ হলো। এবং উপরে উল্লিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা, সাবধানে চলা আর গাদাগাদা ওষুধ খাওয়াও চলতে লাগল। এখানে একটা কথা বলে রাখা জরুরি যে ১৯৯৬ সালে সত্য অসুস্থ হবার পর নানান দিকের নানান সময়ের নানান ধরণের বন্ধুরা এবং একসময়ের অনেকের হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরাও একত্রিত হলো সে Co-ordination-টা এখনো পর্যন্ত continued। কম্পিউটার Internet-এর মাধ্যমে এবং বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে marfan's syndrom এর রোগীদের যে নিজস্ব Co-ordination রয়েছে এই পৃথিবীতেই বিভিন্ন দেশে—সেটা সম্বন্ধে আমাদের একটা সম্যক ধারণা হলো, যা সত্যকে উৎসাহিত করেছিল। বেশকিছু উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের Marfan's Syndrom এর রোগীদের সাথেও সত্যর ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়। তার মধ্যে বহরমপুরের একজন ভদ্রলোক ছিলেন যিনি এখনও বেঁচে আছেন অসুখ নিয়ে এবং বেঁচে আছেন নিজেকে যুক্ত রেখে একজন সামাজিক আন্দোলনের সারাক্ষণের কর্মী হিসাবে। এই সমস্ত তথ্য সত্যকে বেশ কিছুটা উৎসাহ ও আশার আলো যুগিয়েছে—যে সত্য মনে করছিল জীবনের সবকিছু ফুরিয়ে এসেছে — সেই সত্যকেই এই অসহ্য অন্ধকার যেন কিছুটা আশার ঝিলিক যুগিয়েছে। হঠাৎই ২০০০ সালে এপ্রিল মাসে সত্যর জ্বর এল। জ্বর প্রায় ৭ দিন চলতে লাগল। আবার হাসপাতালে ভর্তি হলো। C.T.Scan হলো। সত্যর কথা জড়িয়ে গেলো। মস্তিস্কে parital Lobe এ (সেরিব্রাল) ইনফাকশন হয়েছে ইনফেকটিভ এনডোকার্ডাইটিসের ফলে, আবার ডাক্তার শ্রীরূপ চ্যাটার্জীর টিম বললেন, হ্যাফনিয়া ব্যাকটেরিয়া Artificial Valve-এ বাসা বেঁধে আছে। জ্বর না কমলে অপারেশন করে (Redo) biological valve বসাতে হবে। এদিকে জ্বর কমছে না— অবশেষে আমরা সবাই মিলে আমাদেরই বন্ধু মেডিসিনের ডাক্তার অলকেন্দু ঘোষ এবং স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডা. সীতেশ দাশগুপ্তকে নিয়ে এলাম। ওরা দেখে বললেন মনে হচ্ছে, জ্বর কমে যাবে এবং আর অপারেশনের দরকার নেই। তাই হলো। কয়েকসপ্তাহ পরে সত্য আবার বাড়ি ফিরে এলো। সত্য তারপরের থেকেই চাইছিল যে একটা এমন পথ হোক ওর চিকিৎসার যাতে ঘোরাঘুরি না করে নানান রকম ডাক্তারি

মতের জটিলতায় বিহ্বল না হয়ে, একটা স্বাভাবিক ধারায় ও চলতে পারে। তাই ও চাইল একবার ভেলোরে গিয়ে Check up করাতে। আমরা কয়েকজন সত্যকে নিয়ে এবছরেই ১৭ ই ফেব্রুয়ারি ভেলোরে রওনা হলাম। দু সপ্তাহ ধরে ভেলোরে জেনারেল মেডিসিন বিভাগ, কার্ডিওলজি বিভাগ, নিউরোলজি বিভাগ, ই.এন.টি. বিভাগ (এর মধ্যে সত্যর আবার টিনিটাস নামে কানে একটা রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই রোগীরা একটু জোরে আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। এই ধরণের অনেক রোগী আত্মহত্যাও করে যন্ত্রণার জন্য— এমন history ও পাওয়া যায়), ডেন্টাল বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, ফিসিক্যাল মেডিসিন বিভাগ সত্যকে নিয়ে নানান পরীক্ষা করে রায় দিল যে চিকিৎসা যা চলেছে বা চলছে তা ঠিক। সত্য ভাল থাকল বলার থেকে বলা ভাল — ভাল থাকতে বাধ্য হলো কিছুদিন। অসুস্থ সত্যর জীবন আমাদের অনেক কিছু জানিয়েছে। সত্যই বলতো। এই পৃথিবীটা নানান রকমের। তারমধ্যে সবচেয়ে তারতম্য হচ্ছে একটা সুস্থ মানুষের পৃথিবী আর একটা অসুস্থ মানুষের পৃথিবী। এই সুস্থ অসুস্থতার বিভাজনেই মানুষের আশা, আকাঙক্ষা, ইচ্ছা অনিচ্ছা বা দেখা— সবটাই কিভাবে যেন বদলে যায়। এটা আমরা বুঝতে পারতাম যে যখন সত্য একটু বেশি অসুস্থ তখন ও প্রচণ্ডভাবে বিমর্ষ থাকতো। আবার সেই সত্যই যেই একটু ভাল থাকতো তখনই ও নানান গল্প, নতুন নতুন খাবারের গল্প, বেড়াতে যাবার গল্প , গান, সিনেমা— বর্ণময় এক আধার ছিল যেন ওর চোখেমুখে, এমনকি একইদিনে এই সাদাকালোর পার্থক্য আমরা টের পেয়েছিলাম। শিকড়প্রেমী মানুষজনও অবাক হয়ে যাবেন এই বৈচিত্র্যতা দেখে।

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। ৬ জুলাই, ২০০১। অসম্ভব বুকে যন্ত্রণা করছিল রাত্তিরে। সকালবেলায় ডা. শ্রীরূপ চ্যাটার্জীর টিমের একজন ডাক্তার সুশান মুখার্জীকে ফোন করা হলো। সুশান বললেন নার্সিং হোমে নিয়ে আসতে। নিয়ে যাওয়া হলো। সাথে সাথে ই.সি.জি., এক্সরে করা হলো। এক্সরেতে বলছে যে, বাঁদিকের ফুসফুসে একটা Shadow। Echo করা হলো। জ্বর তো ছিল না— তাহলে এটা কি নিমুনাইটিস? তাও ক্রনিক? তাহলে আবার কি হার্টের কিছু হলো? ডাক্তার বললেন MRI করতে। MRI হলো। Report পেতে দুদিন লাগবে। এদিকে Antibiotic injection চলছে। সত্য ৮ জুলাই বিকেলে ভাল থাকল— গান শুনছিল দুপুরে কানে Earphone লাগিয়ে। ৯ জুলাই সকাল দশটা— সত্যকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করল। Stable আছে। ঠিক আছে। আমরা কেন, ডাক্তারই বা কেন, মারা যাবার ১ মিনিট আগেও সত্য নিজেও বোঝেনি যে ও দুপুর দুটোর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না যে এ কী হলো!

**উত্তান**

□□

কয়েকদিন হলো সত্যদা আর ফোন করছে না—আমিও ওকে আর বলছি না, চিন্তা কোরো

□□

কয়েকদিন হলো সত্যদা আর ফোন করছে না—আমিও ওকে আর বলছি না, চিন্তা কোরো না, রেস্ট নাও, গান শোনো, ভালো লাগবে। ও আমাকে আর বলছে না—শিবু তোর সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আছে—দেখি এই শনি রবিবার তোদের ওদিকে যেতে পারি। গেলে 'ভিশাল' থেকে একটা কটন ট্রাউজার্স আর শার্ট কিনবো। তুই পছন্দ করে দিবি।

সত্যদা আর কোনও দিন আমাকে এসব বলবে না। সবাই যখন বলছে, তার মানে, সত্যদা মরে গেছে আর আমি বেঁচে আছি। সত্যিই কি অবিশ্বাস্য এই সত্য কথাটি!

আমার সদ্য কৈশোর পেরোনো বয়সে সত্যদা তার গমগমে গলায় যে স্বপ্নের কথা বলতে এসেছিল আমাদের ইডেন হোস্টেলে—শেষ দেখা হওয়ার দিনেও বলছিল—আমাকে, বিশুকে, তন্ময় আর সর্বানীকে। বলছিল পাঁচমারি পাহাড়ের সবুজ ঘাসে ফড়িং আর ফুলে ঢাকা মাঠে নীল আকাশের নীচে ওর সেই শুয়ে থাকার গল্প। বলছিলো হিপিদের সীমান্ত পেরিয়ে যাবার গল্প, বলছিল জেকব তিমারম্যানের যুদ্ধ ছেড়ে দেবার গল্পটি। কত শুনেছি, শিখেছি—কলেজ স্ট্রিটের ফাঁকা রাস্তায় হাটতে হাটতে, ওর বেলগাছিয়ার বাড়িতে। রাতের পর রাত কেটেছে বিটোফেন, মোজার্ট, ভাগনার শুনে—ওর মুখে কাঁটাতারহীন, কর্তৃত্বহীন, সমাজের জন্য দেশ-বিদেশের মানুষের লড়াইয়ের গল্প শুনে। সত্যদা ফিরে গেছে সেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে। নীল আকাশের নীচে শুয়ে আছে। আমার জন্যও নিশ্চয় ওর পাশে একটু জায়গা রাখবে। আমি তো ওর "ভাই" ছিলাম।

**শিবু**

□□

সত্যদা চলে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে, হার্টের মেজর অপারেশনটির পর থেকেই, শারীরিক অবস্থার ওঠানামা চলছিল। তবু তার মধ্যেই একটু একটু করে ফিরে এসেছিল ওর কণ্ঠ, ওর হাসি। ফিরে এসেছিল দুচোখের দীপ্তি, মাঝে মধ্যে রোগজনিত ক্লান্তি ধরা দিলেও। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম পুরনো মেজাজের সত্যদাকে।

অনেক ছবি ভিড় করে আসছে। বিজ্ঞানকর্মী সত্যদা। সুমন থেকে বিঠোফেন, সুনীল থেকে কামু-কাফকা— সর্বত্র স্বচ্ছন্দচারী সত্যদা। সত্যদা মানে যে মানুষটি বিরিয়ানি, বেগুনভর্তা বা অন্য বিশেষ বিশেষ ডিশের প্রতি আগ্রহী। সত্যদা মানে নানা মজার কথা, এদিকে গূঢ় তর্কের প্রবল হাওয়া। সব মিলিয়ে একটা চমৎকার কোলাজ। একজন পূর্ণ, জ্যান্ত মানুষ।

এখন ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে। অদ্ভুতই বলব। আমাদের মধ্যে সত্যদাই জীবনকে সবচেয়ে গভীরভাবে, নানা দিক থেকে চেটেপুটে স্বাদ নিতে চাইত সবসময়ে। অথচ জীবন সব থেকে ফাঁকি দিয়ে গেল তাকেই। এত তীব্র ছিল সত্যদার এই জীবনের স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছে যে, মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়ত। একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। মেডিক্যাল

কলেজের চামেরী হোস্টেলে এক সন্ধেবেলা। হঠাৎ ঝড়ের মতো সত্যদার প্রবেশ। চল, তোকে দুমিনিটের মধ্যে রেডি হতে হবে ....... খাওয়াব (আইটেমটা মনে আসছে না)। ঘরে তুমুল তাসের আড্ডা চলছে। এবার সত্যদার দ্বিতীয় ওয়ার্নিং। জামাকাপড় বদলাচ্ছি। সময় একটু বেশি লাগল? হঠাৎ সিঁড়িতে ধুপধাপ আওয়াজ। সত্যদা রাগ করে চলে যাচ্ছে। পরের দিনই আবার স্বমেজাজে, স্বমহিমায়। দরাজ হো হো হাসি, গান, আর—"দাদা, তোর কিন্তু পায়ের নীচে মাটি নেই"—ইত্যাদি নানা মজার মন্তব্য (রেট্রোস্পেকটিভভাবে বুঝেছি, সত্যদা কিছুটা মজা করে সাইকোথেরাপি মতো করত সম্ভবত)।

অনেক জায়গায় খেতে গেছি। মাঝে মাঝে অনাথদেব লেনে রাত কাটিয়েছি। পিজি হোস্টেলেও সত্যদা থেকে গেছে এক একদিন। প্রবল তর্ক চলত, বিশেষত শিবুর সাথে। সমালোচনা করত। কিন্তু কখনও কারও নামে কোনও গালাগালি দিতে শুনিনি। আমাদের কারও ব্যক্তিগত সংকটে, যখন অনেকে মুখ ফিরিয়েছে—সত্যদা কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। আগের মতোই কাছে টেনে নিয়েছে। শান্তভাবে ছড়িয়ে গেছে ওর হৃদয়ের উষ্ণতা। আমার নিজেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

সত্যদা রয়ে গেল তার লেখায়, নানা স্মৃতির অনুষঙ্গে। আফশোষ হয়, যদি আরও একটু সময় দিতে পারতাম। অনেক কিছু দেওয়ার ছিল সত্যদার। আর সেসবের ডালা নিয়ে ও আসবে না। শূন্য হয়ে গেল ঘর।

**দেবাশিস (দাদা)**

□□

বটতলার গঙ্গার ঘাট, শেতলা মন্দির, কচেশ কিচেন কিংবা কাকা'স কাফে এর কোথাও আর সত্যদাকে পাওয়া যাবে না, বুকে হাত ঘষতে ঘষতে, মুখে স্মিত হাসি রেখে প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলা চলে আসত এইসব ঠেকে। আমাদের কিছু দিতে। সত্যদার কাছ থেকে আমরা কতটুকু নিতে পেরেছি তা জানি না, তবে মানুষে মানুষে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং মানবিক গুণগুলোকে সজীব রাখার বহু প্রেরণা আমরা ওর কাছে পেয়েছি। পেয়েছি সামনের দুনিয়ার কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার পরামর্শ, বাস্তবটাকে চেনা বা বোঝার চেষ্টা। আমাদের সকলের প্রাত্যহিক জীবনে সত্যদা এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে, তার অভাব অপূরণীয়। সকালবেলা অফিস থেকে ফোন করে সন্ধ্যেবেলার 'প্রোগ্রাম ফিক্স' করা, কিংবা নিছকই খোঁজখবর নেওয়া—সন্ধেবেলায় আড্ডায় এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে বলা বা যাবার সময় একটু এগিয়ে দিতে। নানান কারণে মন মেজাজ হারিয়ে বসে থাকলে পিঠে হাতটা আর পড়বে না। সত্যদা সবসময় আমাদের ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে আমাদের জ্বালা, যন্ত্রণাকে বোঝার আর নানান কাজে উৎসাহ দেওয়ার। আমরা সকলে মিলে চোখে জল নিয়ে সত্যদাকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছি। নিষ্ঠুর সময় হয়তো আমাদের এই তাজা সুখস্মৃতিকে ধূসর, মলিন করে দেবে। তোমরা কি কেউ পার না সত্যদা হতে?

**উত্তরপাড়ার বন্ধুরা**

**নয়ই জুলাই : সত্যর কাছে স্বীকারোক্তি**

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে,
মেঘলা আকাশের ফাঁকে দেখলুম
একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে ;
ভুবনডাঙার মাঠ পেরিয়ে,
খানিক আগে আকাশে চলে গেছে সত্য,
তারপর কোন ফাঁকে এই নক্ষত্র হয়ে গেছে।
আমার দিকে তাকিয়ে নির্নিমেষ,
দরাজ গলায় হাসছে ;
স্পষ্ট শুনলুম বলছে,
"কাকু! আপনি অবসর নিলেন কাজ থেকে,
আমি নিলুম জীবন থেকে,
আপনাদের জন্য রেখে গেলুম
অসংখ্য টানাপোড়েন, ঝুটঝঞ্ঝাট।
আমায় দেখুন-নির্বিকার সন্ন্যাসীর মতন,
ভাঙা পেয়ালার মতন পার্থিব জীবন ছুঁড়ে ফেলে
অমল মুক্তির আলোয় নক্ষত্রে থাকি দীপ্যমান :
কী বলুন? কে জিতল?"
ক্ষীণ কণ্ঠে, অর্ধস্ফুট স্বরে,
বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলুম
"হ্যাঁ সত্য! হেরে গেছি আমি
নিয়ে যাও শ্রদ্ধা, সেলাম।"

**অরুণ চক্রবর্তী**

□□

দুপুর পৌনে একটা নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফোনটা তোলার আগেও কি বুঝতে পেরেছিলাম—এত বড় একটা দুঃসংবাদ পাব। দাদা ফোনে বলল, 'সত্যদা আর নেই—সবাইকে খবরটা জানা'। প্রথমে আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। 'আর নেই' কথাব অর্থ হল সত্যদার সঙ্গে আর কোন কথা হবে না—আর দেখা হবে না।

বরানগর থেকে গামা সেনটাউরির দুরত্ব কম নয়। সারা রাস্তা ভেবেছি দাদা বলেছে 'মনে হয় আর নেই' তাহলেও গিয়ে যদি দেখি কষ্ট চেপে হেসে বলছে- --গত দুদিন এলি না কেন?

দরাজ গলার সত্যদার দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখ প্রথমে আমার মনে ভয়ের উদ্রেকই করেছিল। কিন্তু সত্যদার নিজস্ব স্টাইলেই আর পাঁচজনের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব করেছিল ঠিক

তেমনই আমার সঙ্গেও হয়েছিল।

আমাদের বাড়িতে তখন সত্যদা প্রথম আসতে শুরু করেছে। সেবছর বিশ্বকর্মা পূজার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা সত্যদা ঘুড়ি ওড়াতে এল। তারপর প্রতিবছরই বড় ধরণের অসুস্থ হওয়ার আগে অবধি বিশ্বকর্মা পুজো এলেই সত্যদা-নিলয়-সুদেব-রাজীবের ঘুড়ি লাটাই কেনা সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার ব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত।

শুধু ঘুড়ি ওড়ানো নয়—দোলের সময় রং খেলা, কালিপূজার সময় বাজি পোড়ানো সবেতেই সত্যদার ছিল সমান আগ্রহ। আবার নিজে একা নয়—উত্তরপাড়া, বরানগর, ডানকুনি, বালিগঞ্জ সব জায়গায় সম-অসম বয়সী সব বন্ধুদেরই চাই তার এই আনন্দে। ক্রিকেটেও উৎসাহ কম ছিল না। শুনেছি ও খুব ভালো ক্রিকেট খেলতো।

আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক হলো চাঁদিপুর যাবো। সঙ্গীরা ছিল বিভিন্ন বয়সী। যোগাযোগ খোঁজখবর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে সত্যদাই ছিল মূল ব্যক্তি।

পরিচিতি প্রত্যেকের খুঁটিনাটি ভালোলাগা মন্দলাগার প্রতি নজর ছিল সত্যদার। কোথায় কি খাবার ভালো তাও ছিল ওর নখদর্পণে। ফিল্মের প্রতি আগ্রহও ছিল চূড়ান্ত। কোনো নতুন ফিল্ম এলেই তার রিভিউ ও ভালোভাবে পড়ে নিত।

অদ্ভুত লাগতো যখন কোনো পুরনো ছবির গান শুনেই ও বলে দিতো সেই ছবির নায়ক-নায়িকা-পরিচালক মায় সুরকার-গীতিকারের নাম পর্যন্ত।

আমার খুব রাগ হতো যখন আমাকে বকতো। বকার মধ্যে সাংঘাতিক ধার ছিল। আবার পরমুর্হূতেই বলতো—তোর একটা ধোসা পাওনা হল। আমি বাড়িতে একা আছি, দুবার দিনে ফোন করা চাই।

সত্যদার সঙ্গে সারাদিন কাটালেও বুঝতে পারতাম না কি করে সময় কেটে গেল। সমাজ বিপ্লবের গল্প, আন্দোলনের গল্প, বন্ধুদের গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প থেকে শুরু করে পুরনো হিন্দী ছবির গান, ওয়েস্টার্ন মিউজিক, কি না ছিল ওর গল্পের ঝুড়িতে।

কোথায় না ছিল ওর বন্ধু। কোথাও যাবো শুনলেই বলতো ওখানে গিয়ে এর সঙ্গে যোগাযোগ করবি। আমি তখন ভাবতাম এত বন্ধু একজনের হয় কি করে? ও সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতো। অসুস্থতার জন্য কিছুটা মনমরা হয়ে পড়লেও একটু সুস্থ বোধ করলেই বেড়াতে যাবার কথাও ওর মুখেই শোনা যেত।

শুনেছি আশির দশকে বিজ্ঞান আন্দোলনে সায়েন্টিফিক ওয়াকার্স ফোরামের (SWF) পক্ষ থেকে প্রধানত নিউক্লিয়ার বিরোধিতায় বক্তৃতা দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেত। 'বিজ্ঞান জাঠা' উপলক্ষ্যে ওড়িশায় পদযাত্রা, সেমিনারেও অংশগ্রহণ করে সত্যদা। এই সময় ওর ওড়িশার অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়—যাঁদের সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল। কেরালার কে. এস. এস. পি-তে ও যায় নিউক্লিয়ার বিরোধিতায় সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য। '৮৪-তে ভূপালে গ্যাস-দুর্ঘটনার প্রতিবাদে সত্যদা সমেত বেশ কয়েকজন বন্ধু ভূপালে গিয়ে সার্ভে করে। এরপরে কলকাতায় মিছিল, পোস্টার প্রদর্শনী, ফিল্ম-এই সবেতেই সত্যদার যোগ ছিল। '৮৬-তে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র আয়োজিত সাতদিনের বিজ্ঞান যাত্রায় বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরে সত্যদার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সবেতেই সত্যদার যোগ ছিল। '৮৬-তে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র আয়োজিত সাতদিনের বিজ্ঞান যাত্রায় বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রাম-শহরে সত্যদার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শুনেছি সত্যদা এই সময়ে ভালো বক্তৃতা দিত—তবে পরে তাকে আর এই ভূমিকায় দেখা যায় নি। গান লেখা—গান গাওয়াতে ছিল ও সুদক্ষ।

'৯১-এ স্ট্যান্ডার্ড ও'পেক ফার্মাসিউটিক্যালস কারাখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনে সত্যদাও যুক্ত হয়ে পড়ে। জলাভূমি বাঁচাও আন্দোলনে সত্যদার ভূমিকা ছিল খুব সক্রিয়। আন্দোলনের জন্য লিফ্‌লেট লেখা, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের আন্দোলনে সামিল করা—সব কিছুতেই তার জুড়ি মেলা ভার।

'৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পরপরই সত্যদা—দাদা (নিলয়) চলে গেল মহারাষ্ট্রে। তারপর থেকেই সত্যদার মাথায় ঘুরতে শুরু করল, ফ্রেন্ডস্ মিট করার কথা। শেষপর্যন্ত ফ্রেন্ডস মিটও হলো কল্যাণীতে। যার ভূমিক', অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—সে হলো সত্যদা। ফ্রেন্ডস্ মিট-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় মৌলবাদের বিরোধিতা এবং বেকার বন্ধুদের স্বাবলম্বী করার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা—তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরি হল স্ব-উদ্যোগ, যেখানে বন্ধুদের মিলিত প্রচেষ্টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বরানগর জুটমিল বন্ধ। তার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে জুটমিল শ্রমিকরা। সেখানেও উপস্থিত সত্যদা। আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে, মতামত দানে পিছপা নন সত্যদা। রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে হার্ট ক্যাম্প সর্বত্রই ছিল ওর অবাধ গতি। প্রাণশক্তিতে ভরপুর সত্যদা সব আন্দোলনেই থাকতো পাঁচজনের একজন হয়ে। যে কোনো বিষয়ে বন্ধুদের মতামত ছিল ওর কাছে খুব দামী। এতো অল্প কথায় বলা সম্পূর্ণ হয় না—বাকি থাকে অনেক কথা।

**চৈতালী**

□□

ঠিক কবে পরিচয় মনে নেই। তবে কিভাবে হয়েছিল আবছা মতো মনে পড়ে। সম্ভবত বিজ্ঞান আন্দোলনের কোন কার্যক্রম উপলক্ষ্যে। প্রায় বছর কুড়ি আগে। সত্য তখন পিপলস সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত। সাথে পার্থ দেবনাথ, অমিত চৌধুরী। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধু হয়ে ওঠে এরা। যদিও সবাই আমার থেকে বছর দশেকের ছোট।

সত্য বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারতো। আড্ডায় ওই থাকতো মূল বক্তা। আমরা শ্রোতা। টের পেলাম সত্য প্রচুর পই পড়ে। নানান ধরণের বই। গল্প, রাজনৈতিক ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, কবিতা, ইত্যাদি। আমি পড়ুয়া নই। পড়ুয়াদের সম্ভ্রমের চোখে দেখি। সত্যকেও দেখতাম। ওর কাছে অনেক কিছু জানতে চাইতাম। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। ও সুন্দর গুছিয়ে বলতো। আড্ডা মারতে মারতেই কথা হত। বিজ্ঞান কলেজে আমার ঘরে। কিংবা বাড়ি ফেরার পথে। শেয়ালদা স্টেশনে চায়ের দোকানে। আড্ডার মাঝখানে প্রায়শই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠতো। কারণ অফিস যেতে হবে। নাইট ডিউটি। জিজ্ঞাসা করতাম—

'তো খাওয়া জুটবে কোথায়'? বলতো আজ মোগলাই খাব বা মুরগি। কোন একটা দোকানেরও নাম করতো। জানি না সত্যি সত্যিই খেতো কিনা। নাকি ডিউটিতে যাওয়ার দুঃখ ভুলতে এমন করে বলতো। তবে সত্য খাদ্য রসিক ছিল একথা সবাই জানে।

গান ভালবাসতো সত্য। নানা ধরণের গান ও বাজনা। যার মধ্যে ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকালও ছিল। কলকাতায় কোন প্রোগ্রাম হলেই ছুটতো সত্য। একদিন সন্ধ্যের আগে কলেজে এসে হাজির। বললো— 'চলো। ভালো একটা প্রোগ্রাম আছে। ওয়েস্টার্ন। —ক্যাথিড্রাল চার্চে। 'পারবো না, কাজ আছে', বলায় বেজায় চটেছিল। বলেছিল — জানো না কি হারাচ্ছো।' ওই সঙ্গীতের রসগ্রহণে অপারগ ছিলাম তখন। পরে খানিক আভাস পেয়েছি। আরেকজনের হাত ধরে। তখন ভেবেছি সত্য ঠিকই বলেছিল। সেই সঙ্গীত সন্ধ্যার আনন্দটা মিস করেছি।

সত্যকে শুরুতে পি. এস. এ.র একজন বলেই জানতাম। নিজেও সেই পরিচয়টাতে জোর দিত। সেই পরিচয়েই *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*র সাথে যোগাযোগ। পরে এক সময় ও *বি ও বি*-রও একজন হয়ে ওঠে। যদিও '*বি ও বি*' তথা 'বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা'র সদস্য পদ সত্য কখনও নিয়েছে বলে জানি না। সেজন্য ওর '*বি ও বি*' প্রকাশনায় একজন মুখ্য উদ্যোগী হয়ে ওঠায় বাধা হয়নি কখনও। বন্ধুত্বের দাবি দিয়ে সংগঠনের সীমানা বোধকে নস্যাৎ করে দিয়েছে সত্য।

সত্যর বন্ধুত্বের পরিধি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। ওর বন্ধু-ভাগ্য ঈর্ষণীয়। একমাত্র যোগীন ছাড়া এমন কাউকে আমাদের চারপাশে দেখি না যার বন্ধু সংখ্যা এমন বিপুল। এই বন্ধুরা ছড়িয়ে আছে, শুধু কলকাতায় নয়—দেশের নানা প্রান্তে। মাঝে মধ্যেই ছুটে যেত এখানে ওখানে। কোন মিটিং মিছিল প্রোগ্রামের খবর পেলেই হল। — ছুটে যেত সত্য। অমার মনে হত বন্ধুত্বের তাগিদেই ওর এই ছুটে ছুটে যাওয়া।

বছর কুড়ি সময় ধরে সত্যকে দেখেছি। প্রথম বছরআটেক খানিকটা কাছ থেকে। ভাবনা চিন্তা ধ্যানধারণার দিক থেকে খুবই আধুনিক ছিল সত্য। এ ব্যাপারে সৎ মনে হতো ওকে। বিশেষ করে ধ্যানধারণার ও জীবনযাপনে খুব না অমিল ঘটে সে-ব্যাপারে সজাগ থাকতো সত্য; সেজন্যই বিশেষ করে অ্যাড্‌মায়ার করি সত্যকে।

**রবীন চক্রবর্তী**

□□

লোকে বলে বন্ধুত্ব যা হবার তা হয় ছোট বয়সেই, বড় বয়সে হয় কোনো সম্পর্ক, বন্ধুত্ব নয়। কিন্তু সত্যর সঙ্গে যখন মোলাকাত হয়, সেই উনিশশো তিরাশিতে, তখনই সত্য পূর্ণ যুবক, আর আমি ওর চেয়ে আট-দশ বছরের বড়। তবুও আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। *বি ও বি* আমাদের কাছে এনে ফেলেছিলো, 'বিজ্ঞান পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিলো প্রীতি ও আস্থা , তবুও কিছু বাকি ছিলো। উনিশশো উননব্বই-তে অঘটন-ঘটন-পাটিয়সী বাস্তবতা আমাদের দুজনকে দিন দশেকের জন্য সুভাষদের ছোট ফ্ল্যাটে 'একা' হবার সুয়োগ করে দিল। আমরা একে অপরকে চিনলাম আরও গভীর ভাবে।

সেবার সত্য নানারকম শারীরিক অসুবিধা বোধ করায় ওর ডাক্তার-বন্ধুরা প্রায় জোর করেই ওকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিল। চেক-আপ চিকিৎসা করে একটু সুস্থ হলে ও গিয়ে উঠেছিল সুভাষ-ভারতীর ফাঁকা ফ্ল্যাটে। সেরকমই বন্দোবস্ত ছিল । সুভাষ-ভারতীরা দিন-দশেকের জন্য বাইরে গিয়েছিল। সত্য তখনও পুরো ফিট ছিল না, আমাকেও ওর সঙ্গে থেকে যাবার জন্য বলতে লাগল। সুভাষের সঙ্গে কোন কথা হয়নি, আমি ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম এবং আমাদের কেজো সম্পর্ক উত্তীর্ণ হল বন্ধুত্বে, পরিণত আর অসম বয়সের বাধা পেরিয়ে।

বড়োসড়ো চেহারার আড়ালে সত্য শারীরিক ভাবে খানিকটা দুবলাই ছিলো।

সেটা কিছুটা জানতাম। কিন্তু মনের দিক থেকে যে ও কত দুঃখী ছিল, স্নেহ-কাঙাল ছিল, কতটা কোমল আর বন্ধু বৎসল ছিলো, সেটা আমার সম্পূর্ণ অজানাই ছিলো। একসঙ্গে থাকতে গিয়ে দেখলাম, নীতি-আদর্শের ব্যাপারে সে ছিলো বীতিমতো কঠোর এবং প্রায় রাগী. সে আসলে একটা বালক। তাব উপর নিজেকে নিজে দেখভাল করা, খাবারদাবার তৈরি, ঘরদোর একটু গোছগাছ রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে দেখলাম সত্য আমার চেয়েও আনাড়ি। দু একদিনের মধ্যেই আমি তার অভিভাবক বনে গেলাম। সেটা নিশ্চিন্তে এবং সাগ্রহে মেনে নিতে আমাদের মধ্যেকার শেষ আড়ালটুকুও সরে গেল। আমরা দুজনই দুজনের সান্নিধ্যে উপকৃত হলাম।

রান্না বান্না নিজেরাই করতাম। বাইরের খাবারে ভয় ছিল। সেদ্ধ ভাত, ডিম দুধ পাঁউরুট ইত্যাদি ছিলো ভরসা। একটু আধটু রাঁধতে পারি ঠিকই। কিন্তু একে তো অনেক হ্যাপা, গল্প টল্প করার সময়ও কমে যায়, তা ছাড়া একটু সংকোচও হচ্ছিল আমার। নিজের রান্না নিজে খেয়ে নিজের পিঠ চাপড়ানো আর চোখ মটকে বলা — বাঃ খাশা রেঁধেছিস তো! এক কথা, আর কাউকে রেঁধে খাওয়ানো যে আর এক কথা। আরও ভাবনার কথা, সত্যর তো তখন যাখুশি খাওয়ার অবস্থা ছিলো না। কিন্তু খাদ্যরসিক সত্য উশখুশ করতে শুরু করল, নানা সুখাদ্যের গল্প করতে লাগলো। চুপি চুপি বলে নিই সবাই বোধহয় জানে না। সত্য কিন্তু পেট রোগাই ছিল, প্রকৃত খাওয়ার তুলনায় খাওয়ার গল্প অনেক বেশিই করতো ও। যাহোক, ভরসা করে একদিন ডাল, একদিন পোনা মাছের ঝোল বানিয়ে ফেললাম। খেয়ে সত্যর সে কি লাফালাফি, আমার রান্না পাঁচতারা হোটেলের শেফকেও হার মানাতে পারে এমনি যেন বলতে চায়! আমারও সাহস বেড়ে গেল। পরদিন বাজারে ছোট পাবদা নজরে পড়তে কিনে ফেললাম। কাঁটাওলা মাছ সত্যর না-পসন্দ্। পাবদা দেখে ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। কিন্তু ভরসাও তেমন করতে পারলো না, অমার রান্নার ওপর। আমিও কি ছাই জানি মাছ অনুযায়ী রকম রকম রাঁধতে ? সব রান্নার ফর্মূলা আমার প্রায় একটাই। কিন্তু খেতে বসে সত্য উত্তেজিত হয়ে উঠলো— পাবদা মাছের এমন ঝোল ও নাকি জীবনে খায় নি! পরে বহুবার আমাকে স্মরণ করিয়েছে সেই তুচ্ছ ঘটনা— ও আপনার সেই পাবদা মাছ— মনে আছে? আর, কী আশ্চর্য, বছর দুই আগে পিজিতে থাকার সময় দেখতে গেছি ওকে, ওর কথাটা স্পষ্ট নয়, তাও দুচার কথার পরই ও বলল, পাবদা মাছ! পরের দিন দুপুরের খাবারটা আমিই নিয়ে যাবো, বললাম, অমিতাকে। পাবদা মাছের হাল্কা ঝোল আর একমুঠো গলা ভাত! কিন্তু এটা তো ছিল নেহাৎই পথ্য— সেই

পরিবেশ আর পরিস্থিতি তো আর ছিলো না। হাসপাতালের খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরা অবস্থা, অথচ খাবার সেই প্রবল আগ্রহ, তাও ছিলো না।

বয়সে ছোট হলে কি হবে, সত্য বহু বিষয়েই আমার শিক্ষক ছিলো। অনেক কিছুই জেনেছি ওর কাছে। দেশ বিদেশের আন্দোলন। নারী আন্দোলন, বিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যা, গানের জগতের সাম্প্রতিকতম হালচাল—শোনা যেত ওর কাছে। ওর হাত ধরে এসেছিল এক ঝাঁক তরুণ— নতুন টাটকা বাতাস, এখনও সেই বাতাসেই ঘ্রাণ নিই, শ্বাস নিই।

উত্তরপাড়া-হিন্দমোটরে ওদের বাড়িতে যাওয়া হলো না, একটা আফশোষ রয়ে গেল। ফোনে যখনই কথা হতো, ও বলতো চলে আসুন। কিন্তু যাওয়া হয় নি। প্রতিবারই মনে হয়েছে সত্যর কাছে গেলে হাতে এক-আধটা বেলা, নিদেনপক্ষে কয়েকটা ঘণ্টা নিয়ে যেতে হবে।

প্রথা, নিয়ম, অভ্যাসের দাসত্ব করতে চায়নি সত্য। সেদিক থেকে ও ছিল সার্থকনামা। পরে জন্মেছি বলে পরে যেতে হবে— এ নিয়মেরও ও কোন তোয়াক্কা করলো না।

**রবীন মজুমদার**

□□

তুই আমাকে চিনিয়েছিলি
মানুষ কত
শিখিয়েছিলি জীবনটা নয়
ব্যক্তিগত।
তোকে ঘিরে বন্ধু ছিল নানান ধরণ
তোর জীবনে তারাই ছিল সবচেয়ে আপন।

তোর দু চোখের স্বপ্নে ছিল দিন বদল
স্বপ্নে ছিল তুলবি গড়ে রঙ মহল।

সবার সাথে পথে হাটা তুই শেখালি
একলা তবে আজকে কেন হারিয়ে গেলি।

তোর ঘরে তোর বন্ধুরা আজ সবাই জড়ো
শূন্য তবু লাগছে এ ঘর, শূন্য বড়।

**শর্মিলা**

□□

সত্যর সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। কম সময়ের মধ্যেই দুজনে অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম। সবচেয়ে বেশি দেখা হত সুভাষদার (সুভাষ গাঙ্গুলির) বাড়িতে। যখন দেখা হত আমাকে ছাড়তে চাইত না—বলত "কি হল এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? পাশেই তো তোমার বাড়ি?

—এখন পৌনে দশটা বাজে—বলে ওকে গম্ভীর মুখে ঘড়িটা দেখালাম।

—তাতে কি? তোমার বউ কি চটে যাবে?—তুমি দেখছি খুবই পত্নীনিষ্ঠ।

কথাটা বলামাত্র তার মুখ জুড়ে ফিচেল হাসি। হাস্য-রস-বোধ সত্যের সহজাত ছিল। তবে জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে—বিশেষত রাজনীতি, সাহিত্য ও সমসাময়িক সমাজ প্রবাহের নানা দিক নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা ও ভাব বিনিময় চলত। বহুক্ষেত্রে দুটি একই কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ-তরঙ্গের মত আমাদেরও চিন্তাভাবনার অদ্ভুত সাযুজ্য আমার কাছে বেশ তাৎপর্যবহ। কেননা এ সবকিছুই ওর কবোষ্ণ সান্নিধ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আমার কাছে ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। খুবই বন্ধুবৎসল সত্য প্রায়শ বন্ধুদের নিয়ে একটা পছন্দমত জায়গা বেছে আড্ডার পরিকল্পনা করত এবং তা করেও ছাড়ত। এমনই একবার ও করেছিল ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে কলেজ স্ট্রিট চত্বরের ফেবারিট কেবিনে। অনেক বন্ধুবান্ধব ওখানে যেত শনিবার বিকেলে। আমিও গেছি। আড্ডার ছলে আমরা সত্যেরই মত সকলে পারস্পরিক উষ্ণতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতাম। সকলের মাঝখানে কিম্বা একা একা সত্য যখন কথা বলত বহু রাজনৈতিক তথ্য ওর কণ্ঠস্থ ছিল এবং তথ্য-সর্বস্বতা নয়, তথ্যের বিশ্লেষণেই ওর আগ্রহ আর মেধার সক্রিয়তা আমাকে মুগ্ধ করত। উত্তরপাড়ায় ওর বাড়ি থেকে একটু দূরে শ্মশানঘাট। ওখানে বসে অনেক বন্ধুদের সঙ্গে গাল-গল্প করত। আমারও সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জীবনের অদ্ভুত পরিহাসে ঐ শ্মশানেই অজস্র বন্ধু-বান্ধব ও সমব্যথীদের অরব ও সরব অশ্রুপাতের মধ্যে শেষকৃত্য হল।

বন্ধুবৎসল, আড্ডাপ্রিয় সত্যের অকালপ্রয়াণ আমাদের কাছে একটা হঠাৎ ধাক্কা। শূন্যতাবোধের তীব্র ভার নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে করতে শুধু ভাবি বন্ধুদের জমায়েত আড্ডা ও হাসি-ঠাট্টার সরব কথাবার্তার মধ্যে সত্যের অরব উপস্থিতি থাকুক—উদ্ভাসিত হোক আড্ডা কথা আর ভাব বিনিময়।

**সুমিত**

□□

সত্য চলে গেলো । সত্য, আমার ও ভারতীর কাছে 'বাড়ি-র লোকের' মতো ছিলেন , যেমন ছিল আরও অনেকের কাছে । খাদ্য রসিক সত্যর রসনা-র ওপর ভারতীর টিকাটিপ্পনীকে কোনরকম পাত্তা না দিয়ে ভারতীর কাছ থেকে তার আগমন উপলক্ষে প্রায়ই 'স্পেশাল' খাবার আদায় করে ছাড়ত। ভারতীর রান্নার হাত ভালো। কাজে কাজেই তার তৈরি খাবারের প্রতি সত্যর বিশেষ মনোযোগ। সুকুমার রায়ের "চলচিত্তচঞ্চরী" নাটকের নানা অংশ মাঝে

মাঝে সত্য স্মৃতি থেকে নিপুণভাবে আবৃত্তি করে শোনাতে ভালোবাসত। একাই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করত। দু-একটা কানে ভাসছে। যেমন সত্যবাহনের উক্তি : "দেখলাম মহানন্দে আলোভোলাবাবাজী তার পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াছেন"। অথবা আর এক জায়গায় ভবদুলাল বলছেন "দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপরের দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না....... আর কে যেন ফিসফিস করে বলছে- 'শেক দি বটল, শেক দি বটল'।" হাসতে হাসতে খাট থেকে গড়িয়ে পড়তাম। ভরাট গলায় সত্য হা হা করে হাসত। আর হাসবেনা। প্রচুর ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। আর করবে না। আমাদের বাড়িতে নিজের দু-একটা জামা-পাজামা সব সময়ের জন্য রেখে যেত। যাতে রাত্রে থেকে গেলে বাইরের পোশাক বদলে নিতে পারে। সেগুলো থেকে গেছে। কিন্তু সত্য আর আসবেও না, আর সে সব পরবেও না।

সত্য আমার চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা ছোট ছিল। যত বেশিদিন কেউ বাঁচে তত তার চেয়ে ছোটদের চলে যাবার ঝুঁকি বাড়ে। তেমন কেউ চলে গেলে তাতে বড় কষ্ট। মেনে নিতে না পারার কষ্ট। কিন্তু মেনে তো নিতেই হয়। আমার পরে যারা এসেছে, তারা যেন আমার আগে চলে না যায় এমন আবদার কে শুনছে। দুনিয়াটা কিছু মামারবাড়ি নয়। তবুও কষ্ট পেতে ভালো লাগে না।

সত্যর সাথে আমার পরিচয় সম্ভবত বিরাশী সালের শেষে বা তিরাশী সালের শুরুতে। কিভাবে প্রথম আলাপ সে আর মনে নেই। প্রায় কোন সময় যেতে না যেতেই সদ্য পরিচিত সত্য যেন অনেক কালের চেনা সত্য-তে বদলে গেলো। কি করে তা বলতে পারব না। 'গুঁণ'? তা 'গুঁণ' তো অনেক ছিলই! অকপট ও উষ্ণ হৃদয়, তীক্ষ্ণ মনন, পরিশীলিত রুচি ও রসবোধ, গভীর সংবেদনশীলতা, এক বহুমুখী জাগ্রত জিজ্ঞাসা (তার পুস্তক সংগ্রহের বিষয় বৈচিত্র্যে সেটা খানিকটা ধরা আছে) সূক্ষ্ম কৌতুকবোধ, বাঁধাবুলির বাইরে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার প্রবণতা, কথা ও লেখা দু-ক্ষেত্রেই একেবারে যথাযথ শব্দচয়ন ও আটোসাঁটো বাঁধুনী এমন আরো কত। 'দোষ'? তাও ছিল! যেমন ঘনিষ্ঠ জনেদের কাউকে কাউকে এমন আঁকড়ে কাছে টেনে রাখার চেষ্টা, যাতে কেউ কেউ বেশ ক্ষেপে যেত। যথেষ্ঠ কারণ ছাড়াই ঘনিষ্ঠ জনেদের কারও কারও ওপর খাপ্পা হয়ে গিয়ে তাদের সম্পর্কে অন্যদের কাছে রোষ ক্ষোভ ইত্যাদি প্রকাশ করা। আমাদের বন্ধু রবীন(চক্রবর্তী) একবার মজা করে বলেছিল,সত্য কখন *বি-ও-বি*-র হিসেব চাইবে এই ভয়ে নাকি আমাদের প্রদীপ(দত্ত) কিছুদিন ধরে সব সময়েই হিসেবের খাতা বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াত—এমনই সব। আমাদের আর সবারই মতো 'গুঁণে' আর 'দোঁষে' মেশানো এই সত্যই আমার মনে বড় বেশি করে উপস্থিত। গত প্রায় দু-দশকের কাছাকাছি সময় জুড়ে যাদের সঙ্গ আমার কাছে একান্ত কাম্য ছিল , সত্য তাদের একজন।

সত্য তার প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে বহুজনের সাথে মিলে বেঁচে ছিল। তারাও তাদের ভালোবাসা ও প্রতি-র অর্ঘ্য তাকে ঢেলে দিয়েছে। সাতানব্বই সালে হার্টের অপারেশনের আগে চিকিৎসা সংক্রান্ত এক তীব্র অনিশ্চয়তার সময় মানিকতলা ই.এস.আই হাসপাতালের ক্যান্টিনে(সত্য তখন এই হাসপাতালে ভর্তি ছিল) এক মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রায় এক পথসভা বসত। বিড়লা

হাসপাতালে অপারেশনের সময় উদ্বেগে আকুল তার বন্ধুদের দেখে,কিম্বা ৯ জুলাই মাঝরাতে তার শব অনুগমনকারীদের সংখ্যা দেখে বাইরের যে কারও মনে হতেই পারত তারা ক্ষমতাবান কোন স্থানীয় 'জননেতার' অনুগামী বা অল্পবিস্তর 'নামী' কোনো ব্যক্তির গুণমুগ্ধ মানুষ। কিন্তু আমরা জানি ক্ষমতাবান হওয়া তো দূরের কথা, ব্যক্তিগত ক্ষমতার ধারণাটার প্রতি বিরূপতার দিক থেকে, সত্য ছিল একধরনের প্রায় 'উগ্রপন্থী'। আর প্রচলিত অর্থে 'নামী' লোক সত্য ছিল না। হিরোঁ তো নয়ই, ধারণা ও ব্যক্তিগত আচরণের দিক থেকে সত্যকে বোধহয় একধরনের 'অ্যান্টি হিরোঁই' বলা যায়।

শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ও ভেতরে কত রকমের সামাজিক উদ্যোগে যে সত্য সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু কোনো বাঁধাবাঁধি গোষ্ঠী বা যৌথের মধ্যে তা সে সংগঠনই হোক বা পরিবারই হোক, সত্য ঠিক মানিয়ে নিতে পারেনি। তাতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সমস্যা ও বেদনার কারণই ঘটেছে। সে সব সাথে করেই তাকে পথ চলতে হয়েছে।

সত্তরের দশকের শেষে ও আশির দশকের গোড়া থেকেই দেশ ও বিদেশের ছত্রভঙ্গ নানা 'বাম' শিবির থেকে ছিটকে পড়ে যারা এদিক-ওদিক পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল— সত্যকে আমার তাদেরই একজন বলে মনে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্য তার মত করে সেই হাতড়ানোর চেষ্টার মধ্যেই ছিল বলে আমার ধারণা। নানা সময়ে তার ভাবনা-চিন্তার গতিবিধির একটা অসম্পূর্ণ ছবি হয়তো এই সংকলনে পাওয়া যাবে।

সাতানব্বই সালে হটি অপারেশনের পর থেকে শারীরিক সংকটের তীব্রতায় তার আগেকার জীবনধারা অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত দেড়-দুমাস ধরে সত্য যেন আবার তার স্ব-সত্তায় আস্তে আস্তে ফিরে আসছিল। চলাফেরা বাড়ছিল। বহু বিষয়ে আবার আগের মতই তীব্র আগ্রহ নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চিন্তা বিনিময় শুরু করেছিল। লেখাপত্তরও শুরু হয়েছিল। আমরা সত্যর বন্ধুরা সবাই খুশি হয়ে উঠেছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ সে চলে গেল। তার ওপর রাগ হচ্ছে। কিন্তু সত্য তো আর তা জানতে পারবে না।

**সুভাষ গাঙ্গুলি**

□□

সত্যর সঙ্গে আলাপ আশির প্রথমে। ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি সময় লাগেনি। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বই এর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিতি ঘটে সত্যের মাধ্যমেই। বিশেষ করে সেই সময়ে পাইকপাড়ার অনাথ দেব লেনের প্রায়ান্ধকার পরিবেশে দোতালার সত্যর ঘরটা ছিল অনেকের মত আমাদের কাছেও অত্যন্ত আকষর্ণীয়। গড়িয়াহাট, কলেজস্ট্রিট ও ডালহৌসির টেলিফোন ভবনের উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে সংগ্রহ করা দেশী ও বিদেশী অজস্র বই এর সম্ভার থেকে পরবর্তীকালে আমার ও আমার মত অনেকের সংগ্রহের ও বই পড়ার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু অদ্ভুতভাবেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সত্যর ক্রীড়ানুরাগ সম্বন্ধে কিছুই তখনও জানতেপারিনি। ১৯৯৮ সালে ক্রিকেট আম্পায়ারিং পরীক্ষায় পাশ করে যেদিন প্রথম টালাপার্ক ময়দানে আম্পায়ারিং করে বিকেল বেলায় ক্লান্ত হয়ে অনাথ দেব লেনের বাড়িতে ওকে নিজের প্রথম মাঠের অভিজ্ঞতা বলতে গেলাম তখনই ওর ক্রিকেট প্রীতির কথা প্রথম জানতে পারি—একই সঙ্গে ওকে নস্টালজিয়াতে আক্রান্ত হতেও দেখি। লাজুক ছিল, কিন্তু কথার পিঠে কথায় অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ল। স্কুল জীবনে পাইকপাড়া অঞ্চলের ক্যাম্বিস বল ক্রিকেটে সত্য ছিল সত্যিকারের পাড়ার হিরো। বোলারের অভাব সব সময়ই থাকতো। বোলার হিসাবে আন্তঃপাড়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মোটামুটি বড় চেহারার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ও সাফল্যের সঙ্গে করে গেছে। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে ক্রিকেট শিবিরের নেট-এ ওকে দেখা গেলেও লাজুক স্বভাব, রাজনৈতিক বা মাথার মাইগ্রেন—যে কারণেই হোক ও ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। কিন্তু ওর ক্রিকেট অনুরাগের ঝলকটা মাঝে মাঝেই প্রবলভাবে বেরিয়ে আসতো, এমনকি ইকোলজির মত সত্যর অত্যন্ত প্রিয় বিষয়ের তর্কাতর্কির মধ্যেও।

**সন্দীপ**

□□

I am so sad to hear from you about Satya`s death. I cannot say how sorry I feel for him and for all of you.

Now we all unite in remembrance of Satya and think of him. I will never forget him, his very very difficult circumtances of life, his despair ; but still his sensitivity ; his awareness and ; his interest on Camus and his open-mindedness of streams and currents he did not know before, especially of anarchist variety . I am not able to write more now as I am too sad. I just made some enquiries on the Marfans` Syndrome in Germany and sent Satya`s history of illness to some doctors. I can stop this now ....... I also purchased a new text on Camus I found for Satya ......

We will never forget Satya . I am sure and his legacy will keep us together wherever we are ......

**Reinhard**
**Germany**